

শ্রী নরেন্দ্র মোহন দত্ত · শ্রী তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রাথমিক জীব-বিদ্যা

ক্যালকাটা বুক হাউস



Written strictly in accordance with the Syllabus of Higher Secondary Schools with diversified course of the Board of Secondary Education, West Bengal.

প্রাথমিক জীব-বিদ্যা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

[A Text Book of Biology—For Class X]

REVISED & ENLARGED

শ্রীনরেন্দ্র মোহন দত্ত, এম্. এস্-সি.

উদ্ভিদ্-বিত্তার অধ্যাপক, সিটি কলেজ, কলিকাতা ও

কলিকাতা উল্টাডাঙ্গা ইউনাইটেড হাই-স্কুলের

জীব-বিত্তার আংশিক শিক্ষক

ও

শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়, এম্. এস্-সি.

প্রাণি-বিত্তার অধ্যাপক, সিটি কলেজ, কলিকাতা

ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
ডিসেম্বর—১৯৬৮

মূল্য—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
মুদ্রণ ভারতী প্রাইভেট লিমিটেড
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

"প্রাথমিক জীব-বিদ্যা"র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি এবং ছাত্র-বিক্ষোভজনিত নানা কারণে আমাদের এই পুস্তক প্রকাশে বিশেষ বিলম্ব হইল। এই বিষয়ে আমাদের ত্রুটিও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিয়া নিতেছি। এ ছাড়াও, বই বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্বে বাঁধাই করার কারখানায় আগুন লাগার জন্য এই বইয়ের কয়েকটি ফর্মা পুড়িয়া যায়। তাই, আবার নতুন করিয়া ছাপা হইয়া বাহির হইতে আরো বিলম্ব হইল। আশা করি, এই সব অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য বই বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায় সহৃদয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নিকট মার্জনা পাইব।

পুস্তকটিতে সাধারণ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা ও বিশেষ চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলি সহজেই মনে রাখিতে পারে, তাই সেই বিষয়গুলি পর পর সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখনকার এই "নিত্যনিঠুর দ্বন্দ্ব"-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে "সহাবস্থান" ও "অভিযোজন" দুইটি বড় কথা। এই প্রসঙ্গে "প্রাণি-জগতে সহাবস্থান" শীর্ষক একটি বহুবর্ণ-চিত্র ও অপর একখানি রঙিন চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। আশা করি, ছাত্র-ছাত্রীরা ইহাতে উপকৃত হইবে।

উদ্ভিদ্-বিদ্যার অনুশীলনী প্রশ্নগুলি উদ্ভিদ্-বিদ্যার অংশের শেষে এবং প্রাণি-বিদ্যার অনুশীলনী প্রশ্নগুলি প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সংযোজিত করা হইয়াছে।

পরিশেষে, সহৃদয় শিক্ষক মহোদয় ও শিক্ষিকা মহোদয়াবৃন্দ যদি ভুল-ত্রুটি সম্বন্ধে অথবা নূতন কিছু সন্নিবেশিত করার জন্য জানান তো' উপকৃত বোধ করিব।

সিটি কলেজ
এপ্রিল, ১৯৬৪ }

ইতি—
গ্রন্থকারদ্বয়

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণে প্রাণি-বিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার উভয় অংশই অংশত পুনর্লিখিত হইল। প্রাণি-বিদ্যার শ্রেণীবিভাগ অংশ ও পতঙ্গের জীবনী-সংক্রান্ত অংশ বাস্তবিকপক্ষে পুনর্লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণি-বিদ্যার বহু অংশে সহৃদয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ পুস্তকটির উন্নতিকল্পে যে সকল প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন, তাহা যতদূর সম্ভব গ্রহণ করিয়া ত্রুটী-বিচ্যুতি সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছি।

আশা করি বর্তমান সংস্করণ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রিয় ছাত্রসমাজের সমাদর লাভ করিবে। এই প্রসংগে যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, বইটির উন্নতির জন্য প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ইতি—

গ্রন্থকারদ্বয়

সূচীপত্র

উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের দেহাংশ ...	1
২।	মূল	5
৩।	কাণ্ড	23
৪।	পাতা	48
	অনুশীলনী	85

প্রাণি-বিদ্যা

১।	প্রাণি-জগতের শ্রেণীবিন্যাস	89
২।	অমেরুদণ্ডী প্রাণী	142
	[ক] কেঁচো	142
	[খ] আরশোলা	157
	[গ] প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্ত	162
	[ঘ] রেশম-মথের জীবন-বৃত্তান্ত ...	164
	[ঙ] মৌমাছির জীবন-বৃত্তান্ত	167
	[চ] মশকের জীবন-বৃত্তান্ত	171
৩।	হাঙর গিরগিটির বহিরাকৃতির বিবরণ ...	180
	[ক] হাঙর	180
	[খ] গিরগিটি	184
৪।	কোষ হইতে কলার রূপান্তর ও অঙ্গগঠন ...	189
	কোষ	189
	কলা	193
	অঙ্গ	203

প্রাণী জগতে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যে

সহাবস্থান।

খাদ্য ও আশ্রয়ের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ দেওয়া-নেওয়ার জীবন।

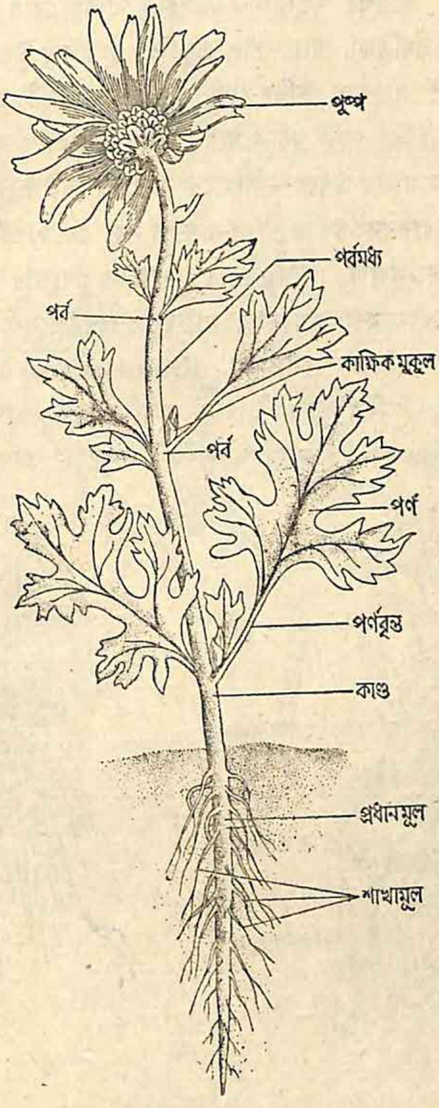


1. স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপ; 2. পক্ষী ও সরীসৃপ; 3. সন্ধীপদী ও একনালী-দেহী প্রাণী;
4. মৎস্য ও ছিদ্রাল প্রাণী; 5. অতিকায় কুমীর ও ক্ষুদ্র পক্ষী;
6. হিংস্র বিশালকায় গণ্ডার ও পক্ষী।

একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের দেহাংশ

[Parts of a typical flowering plant]

পৃথিবীতে যে অসংখ্য উদ্ভিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের বহিরাকৃতি



চিত্র—১, একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের দেহাংশ

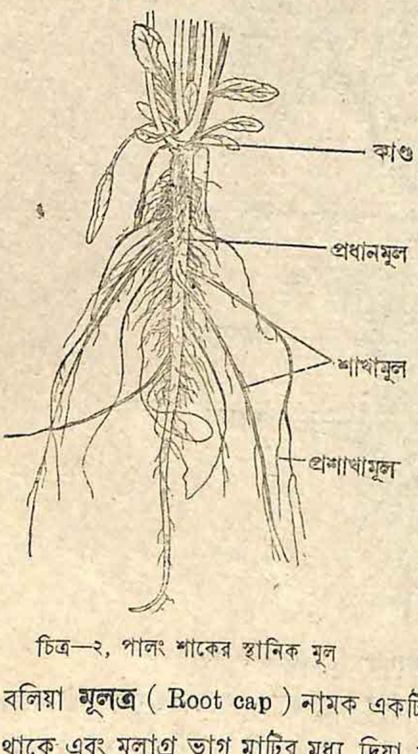
এক প্রকার নহে। কোন কোন উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুল সবই থাকে —এইগুলি **সপুষ্পক** উদ্ভিদ্। আবার কতকগুলি উদ্ভিদের ফুল হয় না,

এমনকি পাতা, কাণ্ড ও মূল নাও থাকিতে পারে। এইগুলি **অপুষ্পক** উদ্ভিদ্; —শেওলা, মস্, প্রভৃতি অপুষ্পকের উদাহরণ।

তবে অপুষ্পক অপেক্ষা সপুষ্পক উদ্ভিদ্ই সচরাচর বেশি সংখ্যায় আমাদের চোখে পড়ে। চন্দ্রমল্লিকা, আম, তাল প্রভৃতি সপুষ্পকের উদাহরণ।

একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদ্-দেহ সাধারণতঃ দুইটি প্রধান অংশ লইয়া গঠিত। অংশ দুইটির একটি থাকে মাটির নীচে—তাহাকে **মূল** (Root) বলা হয়, অপরটি থাকে মাটির উপরে—তাহাকে বলা হয় **বিটপ** (Shoot)।

মূল অংশ, সাধারণতঃ ইহার শাখা-প্রশাখা সহ, সোজাভাবে মাটির নীচেই থাকে এবং **প্রধান মূলটি** (Tap root) কাণ্ডের গোড়ার নিকট যথেষ্ট স্থূল থাকে, কিন্তু পরে ক্রমশঃ সরু হইয়া মাটির ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করে। প্রধান মূল হইতে **শাখা মূল** (Secondary root) ও **প্রশাখা মূল** (Tertiary root) বাহির হয়। প্রধান মূলটি ইহার শাখা ও প্রশাখাসহ **স্থানিক মূল** (True root) নামে অভিহিত। মূলাগ্র ভাগ অত্যন্ত নরম হয়



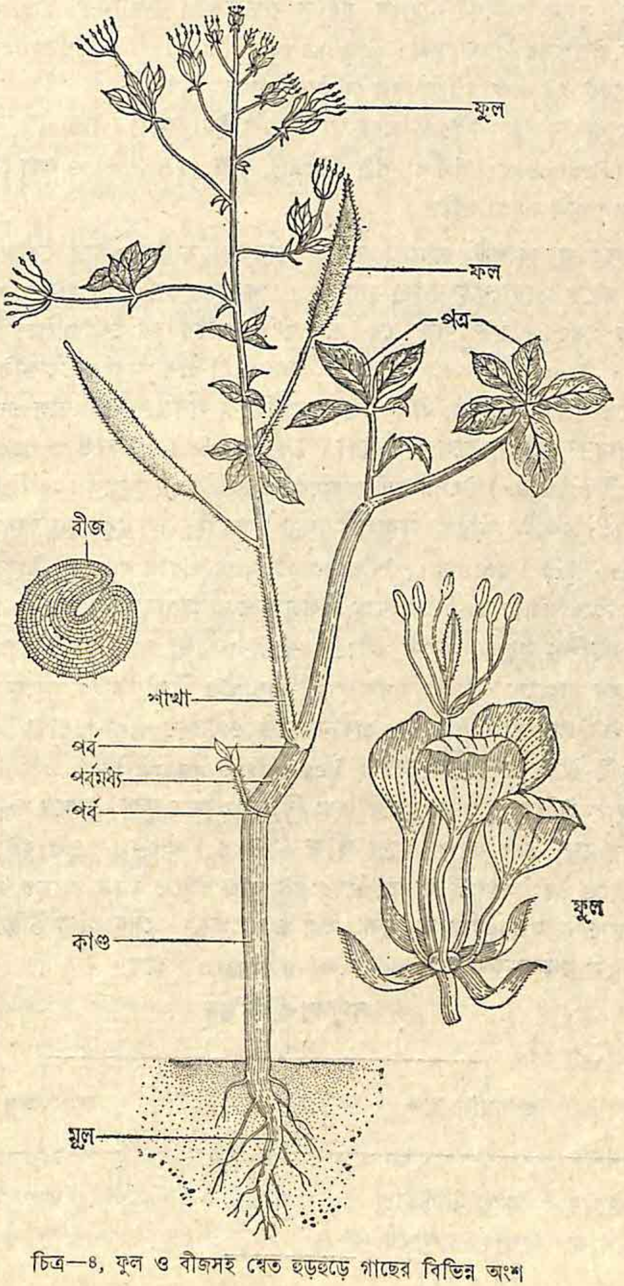
চিত্র—২, পালং শাকের স্থানিক মূল



চিত্র—৩, মুথা গাছের অস্থানিক মূল

বলিয়া **মূলত্র** (Root cap) নামক একটি পাতলা টুপি ইহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে এবং মূলাগ্র ভাগ মাটির মধ্য দিয়া বাড়িবার সময় মূলত্র ইহাকে সব রকম

আঘাত হইতে রক্ষা করে। মূলত্র অংশের কিছু উপরে মূলের কতক অংশ জুড়িয়া অসংখ্য ছোট ছোট সূক্ষ্ম রোম থাকে। এই সূক্ষ্ম রোমগুলিকে



চিত্র—৪, ফুল ও বীজসহ শ্বেত হুড়হুড়ে গাছের বিভিন্ন অংশ

মূলরোম (Root hairs) বলা হয় এবং মূলের এই অংশটির নাম **মূলরোগ অঞ্চল** (Root hair region)। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান মূল অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন বিটপের নিম্নাংশ হইতে কতকগুলি অস্থানিক সূত্রাকার মূল বাহির হয়, ইহাদের **শিফা মূল** (Fibrous root) বলে। সাধারণতঃ একবীজ-পত্রী উদ্ভিদেই এই প্রকার শিফামূল দেখিতে পাওয়া যায়।

বিটপ সাধারণতঃ মাটির উপরেই থাকে এবং ইহা **কাণ্ড** (Stem), **শাখা-প্রশাখা** (Branches), **পর্ণ** বা **পত্র** (Leaf), **ফুল** (Flower) ও **ফল** (Fruit) —এই অংশগুলি লইয়া গঠিত।

বিটপের যে অংশটি প্রধান এবং সাধারণতঃ মাটির উপরে সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে তাহাকেই **কাণ্ড** বলা হয়। কাণ্ডের চারিপাশ হইতে কাণ্ডেরই মত অথচ অপেক্ষাকৃত সরু যে অংশগুলি বাহির হয় সেইগুলিকে **শাখা-প্রশাখা** (Branches) বলে। কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখার কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থান হইতে পত্র বাহির হয়, ঐ নির্দিষ্ট স্থানগুলিকে **পর্ব** (Node) বলে এবং দুইটি পর্বের মধ্যবর্তী স্থানকে বলে **পর্ব-মধ্য** (Internode)। কাণ্ড ও পত্রের মধ্যে যে কোণটি (angle) উৎপন্ন হয় তাহাকে **কক্ষ** (Axil) বলে। প্রতিটি কক্ষে সাধারণতঃ একটি করিয়া **মুকুল** (Bud) জন্মায়, ইহাকে **কাক্ষিক মুকুল** (Axillary bud) বলা হয়। আবার মুকুল যখন প্রধান কাণ্ড বা উহার শাখা-প্রশাখার শীর্ষে জন্মায় তখন তাহাকে **শীর্ষমুকুল** বা **অগ্রমুকুল** (Apical bud) বলে। কাক্ষিক মুকুল হইতে কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা অথবা ফুল জন্মায় এবং অগ্রমুকুলের সাহায্যে কাণ্ডের অথবা শাখা-প্রশাখার বিস্তার হইয়া থাকে।

মূল ও উহার শাখা-প্রশাখা, প্রধান কাণ্ড ও উহার শাখা-প্রশাখা এবং পত্র হইতেছে উদ্ভিদের **জায়মান অঙ্গ** (Vegetative organs)।

সপুষ্পক উদ্ভিদে পরিণত বয়সে এবং বিশেষ ঋতুতে **ফুল** ফোটে, পরে ফুল হইতে হয় **ফল** এবং ফলের মধ্যে **বীজ** (Seed) থাকে। ফল হইতে বীজ মাটিতে পড়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায় এই বীজ হইতে নূতন গাছের জন্ম হয়। বংশ বিস্তারের জন্য প্রয়োজন ফুল, ফল ও বীজের। সেই হেতু উদ্ভিদের এই অংশগুলিকে **জনন-অঙ্গ** (Reproductive organs) বলে।

সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌

- জায়মান অঙ্গ
  - মূল ও উহার শাখা-প্রশাখা
  - কাণ্ড ও উহার শাখা-প্রশাখা
  - পত্র
- জনন-অঙ্গ
  - ফুল
  - ফল
  - বীজ

মূল
[Root]

একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের বীজের **ভ্রূণ** (Embryo) তিনটি অংশ লইয়া গঠিত, —**বীজপত্র** (Cotyledon), **ভ্রূণমূল** (Radicle) ও **ভ্রূণ মুকুল** (Plumule)। বীজপত্রের সহিত একটি দণ্ডের ন্যায় অংশ সংযুক্ত থাকে, ইহার নাম **ভ্রূণদণ্ড** (Tigellum)—এই ভ্রূণদণ্ডের যে অংশ বাহিরের দিকে থাকে সেইটিই ভ্রূণমূল ও অপর অংশটি, যেইটি ভিতরের দিকে থাকে তাহাকে বলা হয় ভ্রূণমুকুল। অঙ্কুরোদ্গমের সময় ভ্রূণমূলটি বীজ হইতে বাহির হইয়া মাটিতে প্রবেশ করে এবং সাধারণতঃ ভ্রূণমূল হইতেই মূল উৎপন্ন হয়।

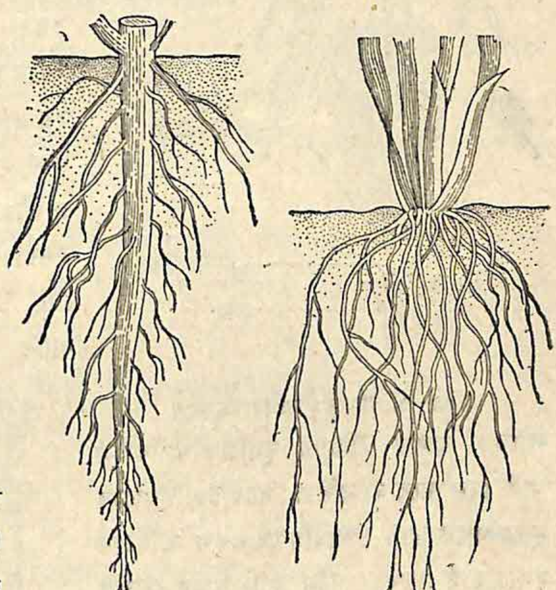
মূলের প্রকারভেদ (Types of roots)—

সাধারণতঃ দুই প্রকারের মূল দেখিতে পাওয়া যায়ঃ (১) **স্থানিক মূল** (True root) এবং (২) **অস্থানিক মূল** (Adventitious root)।

(১) **স্থানিক মূল** (True root) অথবা **সাধারণ মূল** (Normal root)—ভ্রূণমূল হইতে গঠিত মূলটিকে বলা হয় **প্রাথমিক মূল** (Primary root) এবং ইহারই অপর নাম **প্রধান মূল** (Tap root)। এই প্রধান মূল হইতে শাখা মূল (Secondary root) ও প্রশাখা মূল (tertiary root) উৎপন্ন হয়। ভ্রূণমূল হইতে জন্মায় বলিয়াই ইহার নাম **স্থানিক মূল**।

(২) **অস্থানিক মূল** (Adventitious root)—

ভ্রূণমূল হইতে না জন্মাইয়া উদ্ভিদের অন্য যে কোন অংশ হইতে যখন মূল জন্মায়, তাহাকে অস্থানিক মূল বলা হয়। উদ্ভিদের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা এমন কি পত্র হইতেও অস্থানিক মূল জন্মাইতে পারে। কাণ্ডের গোড়া হইতে কখন কখন যে **গুচ্ছমূল** (Fibrous root) বাহির হয়—সেইগুলিও একপ্রকার অস্থানিক মূল।



চিত্র—৫, ক—প্রাথমিক মূল খ—গুচ্ছমূল

একটি সাধারণ মূলের বিভিন্ন অংশ ও উহাদের কার্যাবলী

[Parts of a normal root and their functions]

একটি সাধারণ মূলে প্রধানতঃ চারিটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

(১) মূলত্র অঞ্চল (Root cap region),

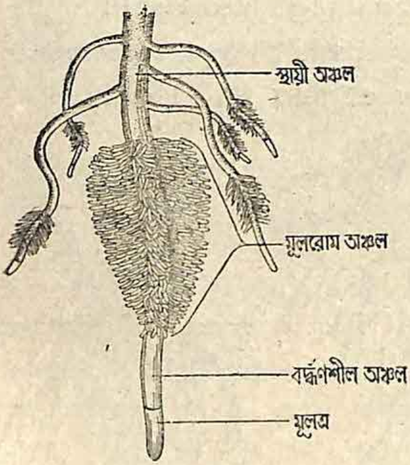
(২) ক্রমবর্ধমান অঞ্চল (Growing region),

(৩) মূলরোম অঞ্চল (Root hair region) এবং

(৪) স্থায়ী অঞ্চল (Permanent region).

(১) **মূলত্র অঞ্চল** (Root cap region)—

একটি মূলের অগ্রভাগ সাধারণতঃ অত্যন্ত নরম হইয়া থাকে এবং এই মূলাগ্রভাগকে বেষ্টন করিয়া একটি টুপির ন্যায় ঢাকনা থাকে। এই ঢাকনাটিকেই মূলত্র বলা হয়। নরম মূলাগ্রটি যখন কঠিন মাটি ভেদ করিয়া অগ্রসর হয় তখন এই মূলত্রটি উহাকে রক্ষা করে। মূলত্র হইতে এক জাতীয় আঠাল পদার্থ বাহির হওয়ায় ইহা পিচ্ছিল থাকে এবং সেই হেতু মূলাগ্র অনায়াসে মাটির ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। জলজ উদ্ভিদের মূলাগ্রভাগ কঠিন মাটি ভেদ করে না বলিয়া সচরাচর ইহাদের মূলত্র থাকে না। আবার যে সকল উদ্ভিদের মূলাগ্রভাগ যথেষ্ট কঠিন মাটি ভেদ করিয়া থাকে সেই সকল উদ্ভিদের মূলত্র বেশ পুরু হয়। কেয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের মূলত্র বহুস্তরযুক্ত হইয়া থাকে এবং সেই প্রকার মূলত্রকে **বহুযোজী মূলত্র** (Multiple root cap) বলে।



চিত্র—৬, পরিণত মূলের বিভিন্ন অংশ



চিত্র—৭, কেয়াগাছের ঠেশ মূলের বহুযোজী মূলত্র

(২)- ক্রমবর্ধমান অঞ্চল (Growing region)—

মূলত্রের ঠিক পিছনেই মূলের যে অংশটুকু থাকে তাহাকে ক্রমবর্ধমান অঞ্চল বলা হয়। এই অঞ্চলে দ্রুত কোষ-বিভাজন (Cell-division) হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে মূলটি ক্রমাগত লম্বা হইতে থাকে।

(৩) **মূলরোম অঞ্চল** (Root hair region)—

ক্রমবর্ধমান অঞ্চলের ঠিক পিছনেই থাকে মূলের মূলরোম অঞ্চল। এই অঞ্চল হইতে অসংখ্য ছোট ছোট এককোষী রোম বাহির হয়। মূলরোমের সাহায্যে উদ্ভিদ্ মাটি হইতে জল ও জলে দ্রবীভূত খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। মাটির সাহায্যে উদ্ভিদ্‌কে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখিতেও মূলরোমের সাহায্য প্রয়োজন। পুরাতন মূলরোমগুলি খসিয়া গেলে নূতন মূলরোম বাহির হয়।

(৪) **স্থায়ী অঞ্চল** (Permanent region)—

মূলরোম অঞ্চলের পিছন হইতে মূলের গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত মূলের অংশটির নাম স্থায়ী অঞ্চল। এই অঞ্চল হইতেই মূলের শাখা-প্রশাখাগুলি বাহির হয়। স্থায়ী অঞ্চলের কোষগুলি পরিণত অবস্থায় থাকে এবং ইহাদের বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না।

মূলের শাখা-প্রশাখার সাহায্যে উদ্ভিদ্ মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে এবং মূলরোম দ্বারা শোষিত জল ও দ্রবীভূত খাদ্যদ্রব্য এই স্থায়ী অঞ্চল দ্বারা কাণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে।

মূলের আভ্যন্তরীণ গঠন (Internal structure of roots)

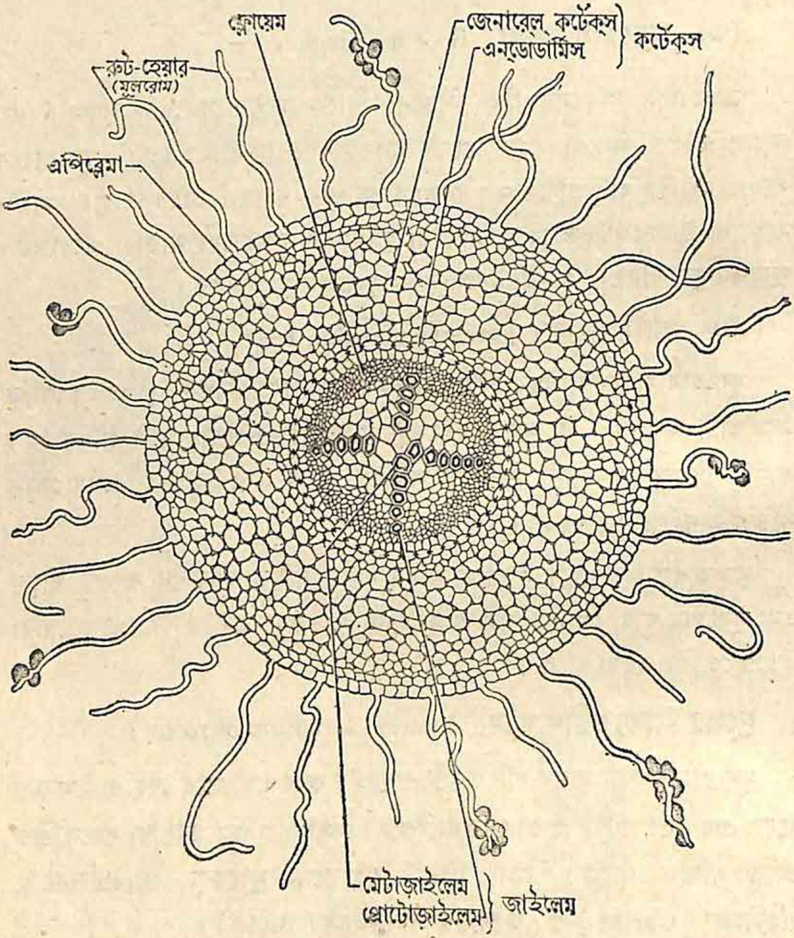
মূলরোম অঞ্চলে মূলের যদি একটি প্রস্থচ্ছেদ করা যায়, তবে সেই প্রস্থচ্ছেদের মধ্যে প্রধানতঃ তিন প্রকার কলাবিন্যাস দেখা যায় এবং তাহারা সমকেন্দ্রিক ভাবে সজ্জিত থাকে। কলা তিনটি হইতেছে—**মূলত্বক্** (Epiblema), **বহির্মজ্জা** (Cortex) ও **কেন্দ্রস্তম্ভ** বা **স্টেলি** (Stele)।

দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদ্ মূলের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়।

(১) **দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ্-মূলের প্রস্থচ্ছেদ** (T. S. of Dicot root):

একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ্-মূলের প্রস্থচ্ছেদ লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কলাগুলিকে পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্যন্ত পরপর সজ্জিত দেখা যায়ঃ—

১। **মূলত্বক** (Epiblema)—সর্বাপেক্ষা বাহিরে, একসারি কোষ দ্বারা গঠিত যে স্তরটি থাকে তাহাকে মূলত্বক্‌ বলে। এই স্তরের কোষগুলির কোষ-প্রাচীর সাধারণতঃ পাতলা হইয়া থাকে এবং ইহাদের কয়েকটি কোষ বাহিরের দিকে প্রসারিত হইয়া এক-কোষী মূল-রোম সৃষ্টি করে। এই কোষগুলি



চিত্র—৮, দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ্‌-মূলের প্রস্থচ্ছেদ

সাধারণতঃ পিপার ন্যায় দেখিতে এবং ইহাদের বাহিরের দিকে প্রাচীরে কোন কিউটিকল্‌ (Cuticle) থাকে না। মূলত্বকের সাহায্যে মূল মাটি হইতে রস আহরণ করিতে পারে এবং এই কোষগুলি বহির্মজ্জার কোষগুলিকে আংশিক ভাবে রক্ষা করিয়া থাকে।

২। **বহির্মজ্জা** (Cortex)—মূলত্বকের ঠিক পরের অংশটি হইতেছে বহির্মজ্জা। ইহা বহুস্তরযুক্ত এবং প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। ইহাদের মধ্যে আন্তঃকোষ রন্ধ্র (intercellular spaces) থাকে। কোষের মধ্যে শ্বেত প্লাসটিড (leucoplast) ও স্টার্চ-দানা দেখিতে পাওয়া যায়।

বহির্মজ্জার ভিতরের দিকে এক সারি কোষ দ্বারা গঠিত আর একটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে বলা হয় **অন্তর্ত্বক** (endodermis)। অন্তর্ত্বকের কোষগুলিও পিপাকৃতি এবং ইহাদের পার্শ্বপ্রাচীর দুইটি ফিতার ন্যায় স্থূল হইয়া থাকে। এইগুলিকে **ক্যাসপেরিয়ান ফিতা** (casperian strips) বলে। অন্তর্ত্বকের কতকগুলি কোষের কোষপ্রাচীর পাতলা হয়। এই পাতলা কোষ-প্রাচীরযুক্ত কোষগুলিকে **পারন কোষ** (passage cell) বলে।

৩। **কেন্দ্রস্তম্ভ** (Stele)—অন্তর্ত্বকের ভিতরের অংশকেই কেন্দ্রস্তম্ভ বা স্টেলি (stele) বলা হয়। স্টেলি মূলের কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া থাকে এবং ইহারও সাধারণতঃ তিনটি অঞ্চল আছে।

ক। **পরিধিস্তর** বা **পরিচক্র** (Pericycle)—অন্তর্ত্বকের ঠিক ভিতরেই একসারি পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত কোষদ্বারা এই স্তর গঠিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা একাধিক সারিতেও থাকে।

খ। **শিরাত্মক কলাসমষ্টি** (Vascular bundles)—

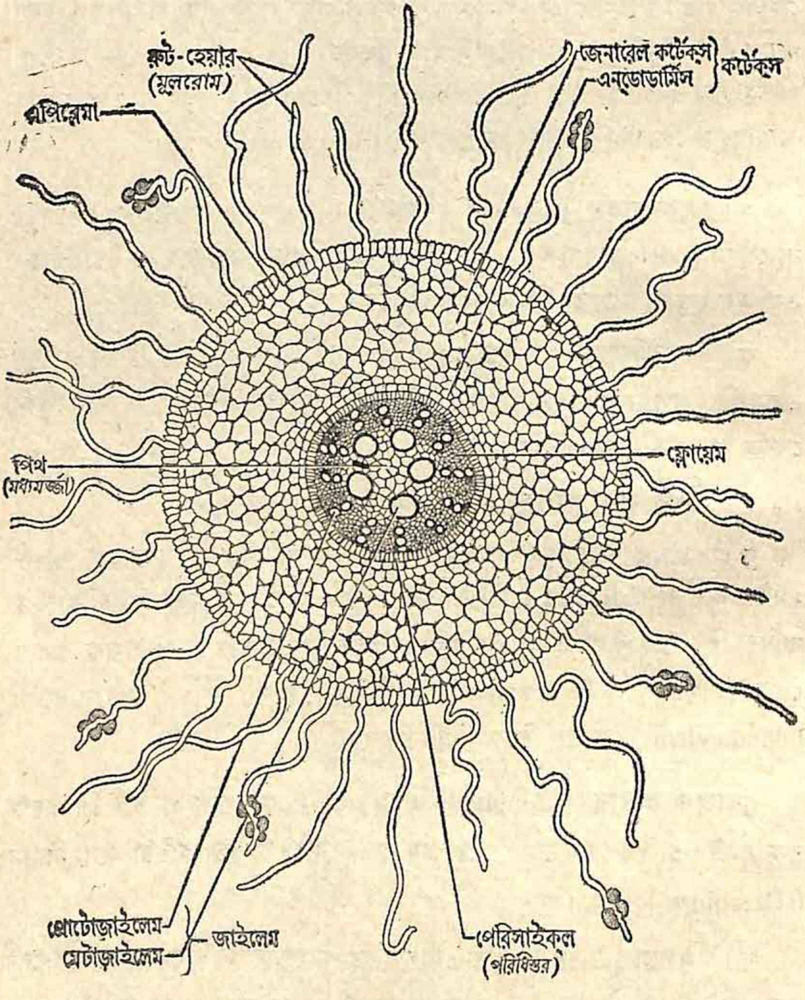
পরিধিস্তরের ভিতরেই শিরাত্মক কলাসমষ্টি পাওয়া যায়। মূলে এই কলা-সমষ্টির **অরীয়** (Radial) বিন্যাস হয়। সাধারণতঃ দুই, তিন অথবা চারিটি করিয়া শিরাত্মক কলা ও ফ্লোয়েম কলা দেখিতে পাওয়া যায়। শিরাত্মক কলায় প্রোটোজাইলেম (Protoxylem) পরিধির দিকে এবং মেটাজাইলেম (Metaxylem) কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত হয়।

যোজক কলার (Conjunctive tissue) কোষগুলি প্রতিটি শিরাত্মক কলাসমষ্টির চারিধারে থাকে। ফ্লোয়েম কলার নীচে কিছুটা করিয়া ক্যামবিয়াম (Cambium) থাকে।

গ। **মজ্জা** (Pith)—ইহা গোলাকৃতি প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত এবং প্রস্থচ্ছেদের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত। দ্বিবীজপত্রী মূলে মজ্জা খুব অল্প পরিমাণে থাকে।

(২) **একবীজপত্রী উদ্ভিদ্-মূলের প্রস্থচ্ছেদ** (T. S. of Monocot root) :—একটি একবীজপত্রী উদ্ভিদ্ মূলের প্রস্থচ্ছেদ করিলে দেখা যায় যে কেবল মাত্র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া উহার আর সবই দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ্-মূলের মত। প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে—

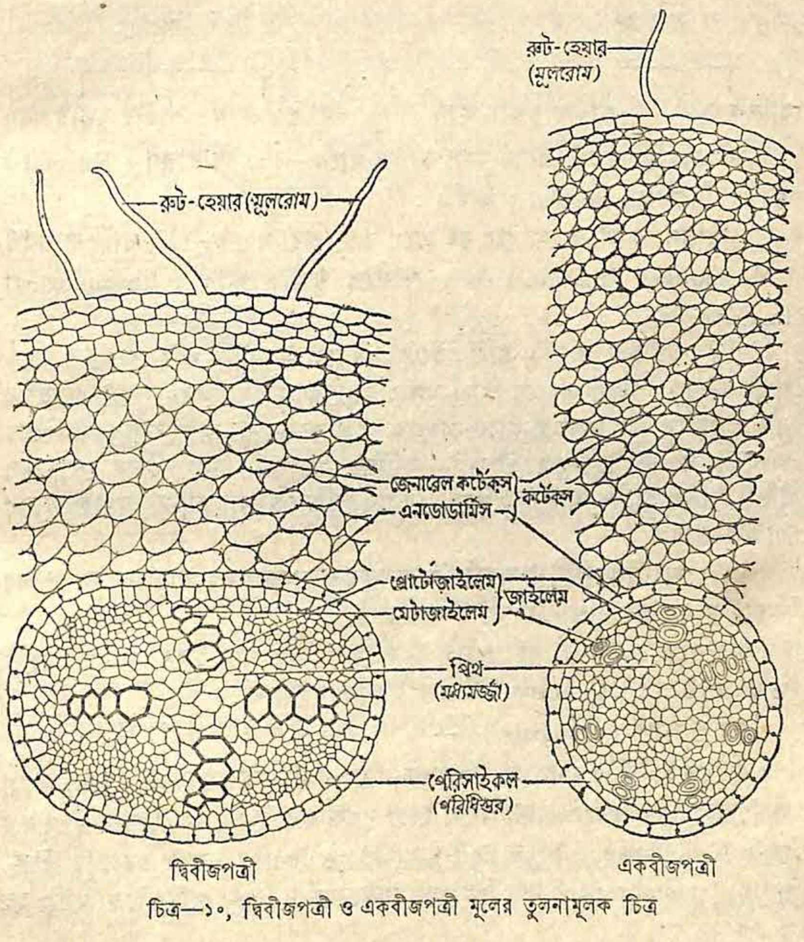
একবীজপত্রীমূলের মজ্জার অংশ দ্বিবীজপত্রী মূল অপেক্ষা অধিক। ইহাদের শিরাত্মক কলা সমষ্টি সংখ্যায় চারের অধিক এবং ক্যামবিয়াম থাকে না।



চিত্র—৯, একবীজপত্রী উদ্ভিদ্-মূলের প্রস্থচ্ছেদ

দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদ্-মূলের প্রস্থচ্ছেদের তুলনা ঃ—

দ্বিবীজপত্রীর মূল	একবীজপত্রীর মূল
১। এক প্রকার কোষ দ্বারা অন্তর্ত্বক গঠিত। ক্যাসপেরিয়ান ফিতা থাকে।	১। পিপার ন্যায় ঘন সন্নিবিষ্ট কতকগুলি কোষ দ্বারা অন্তর্ত্বক গঠিত। ক্যাসপেরিয়ান ফিতা দেখিতে পাওয়া যায়।
২। পারন কোষের সংখ্যা অন্তর্ত্বকে খুব কম।	২। যথেষ্ট সংখ্যায় পারন কোষ আছে।
৩। শিরাত্মক কলাসমষ্টির অরীয় বিন্যাস দেখা যায় এবং সংখ্যায় ইহারা সাধারণতঃ পাঁচের কম।	৩। শিরাত্মক কলাসমষ্টির অরীয় বিন্যাস দেখা যায় এবং সাধারণতঃ সংখ্যায় ইহারা পাঁচের অধিক।



চিত্র—১০, দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী মূলের তুলনামূলক চিত্র

দ্বিবীজপত্রীর মূল	একবীজপত্রীর মূল
৪। ফ্লোয়েম কলায় বাস্ট তন্তু থাকে।	৪। ফ্লোয়েম কলায় বাস্ট তন্তু থাকে না।
৫। শিরাত্মক কলার কোষগুলি সাধারণতঃ কোণ-বিশিষ্ট।	৫। শিরাত্মক কলার কোষগুলি সাধারণতঃ গোলাকার।
৬। ক্যাম্বিয়ামের উপস্থিতির জন্য ইহাদের গৌণ বৃদ্ধি হয়।	৬। ক্যাম্বিয়াম নাই বলিয়া কোন প্রকার বৃদ্ধি হয় না।
৭। মজ্জা খুবই কম অথবা নাই।	৭। কেন্দ্রস্থলে সুস্পষ্ট মজ্জা থাকে।

মূলের কার্যাবলী (Functions of root)

মূলের কার্য
- সাধারণ
  - যান্ত্রিক কার্য
  - শারীর বৃত্তীয় কার্য
- বিশেষ
  - যান্ত্রিক কার্য
  - শারীর বৃত্তীয় কার্য

উদ্ভিদের মূল দুইটি প্রধান কার্য করিয়া থাকে—(১) **সাধারণ** (Normal) ও (২) **বিশেষ** (Special) কার্য।

সাধারণ কার্যকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায় :—(১) **যান্ত্রিক কার্য** (Mechanical function) (২) **শারীর বৃত্তীয় কার্য** (Physiological function)।

(১) **যান্ত্রিক কার্য**—মাটি হইতে উদ্ভিদ্‌কে উৎপাটন করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। দেখা যায় যে শিফা মূল বা সাধারণ মূল উদ্ভিদ্‌কে যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে মাটির সহিত আটকাইয়া রাখে, যাহার ফলে ঝড়ে বা অন্য কোন বাহিরের আকর্ষণ সহজে উদ্ভিদ্‌কে উৎপাটন করিতে পারে না। মূল রোম, শাখামূল ইত্যাদির সাহায্যে মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে উদ্ভিদ্‌কে আটকাইয়া রাখাই মূলের যান্ত্রিক কার্য।

(২) **শারীর বৃত্তীয় কার্য**—মাটি হইতে মূলরোমের সাহায্যে রস শোষণ করাই মূলের প্রধান শারীর বৃত্তীয় কার্য।

মূলরোম যে মাটি হইতে জল বা জলে দ্রবীভূত খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা অভিস্রবণ (Osmosis) প্রক্রিয়ার দ্বারা হইয়া থাকে।

অভিস্রবণ (Osmosis) :—

যখন দুইটি ভিন্ন ঘনত্বযুক্ত তরল পদার্থকে একটি **ভেদ্য** (Permeable) অথবা **অর্ধভেদ্য** (Semipermeable) পর্দা দ্বারা পৃথক্ করা হয় তখন দেখা যায় যে কম ঘন (Less denser) হইতে বেশী ঘন (More denser) তরল পদার্থের দিকে, পর্দার (membrane) মধ্য দিয়া জল যাইতেছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়

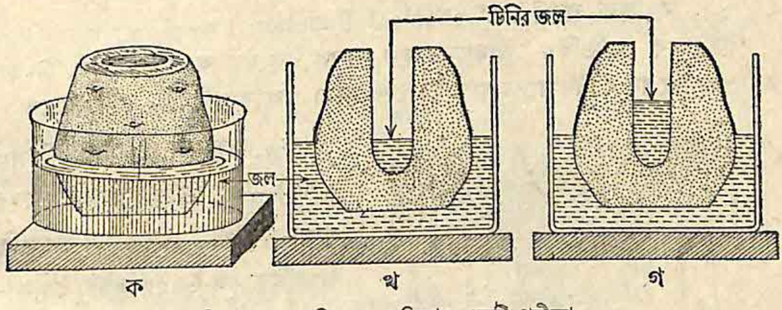
অভিস্রবণ। যতক্ষণ পর্যন্ত দুইটি তরল পদার্থের ঘনত্ব সমান না হইবে ততক্ষণ অবধি এই অভিস্রবণ চলিতে থাকে। এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়া একটি চাপের জন্য হইয়া থাকে, সেই চাপটিকে বলে **অভিস্রবণ চাপ** (Osmotic pressure)।

অভিস্রবণ আবার দুই প্রকারের হইয়া থাকে—(১) **অন্তঃঅভিস্রবণ** (endosmosis)—যখন দ্রাবকটি কম ঘন হইতে বেশী ঘন তরল পদার্থের দিকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় চালিত হয়। (২) **বহিঃঅভিস্রবণ** (exosmosis)—যখন দ্রাবকটি বেশী ঘন হইতে কম ঘন তরল পদার্থের দিকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

অভিস্রবণ প্রক্রিয়া একটি অতি সহজ পরীক্ষা দ্বারা দেখানো যাইতে পারে—

একটি বড় আলু লইয়া উহার দুইটি দিক এমনভাবে সমান্তরাল করিয়া কাটিতে হইবে যাহাতে উহাকে একটি জলের পাত্রে সোজাভাবে বসানো যাইতে পারে। আলুটির নীচে অর্ধাংশের অর্থাৎ যে অংশটুকু জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে, খোসা ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এইবার আলুটির উপরেরদিকের মাঝখানে একটি গর্ত করিতে হইবে এবং ঐ গর্তটি ঘন চিনির রস দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে হইবে।

কিছুক্ষণ জলের মধ্যে আলুটিকে এইভাবে রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে আলুর গর্তটির রস বা জলের উচ্চতা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে এবং পরে উপচাইয়া পড়িবে।



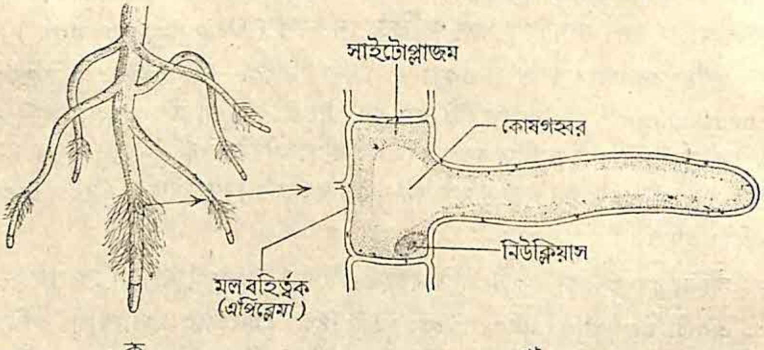
চিত্র—১১, অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার একটি পরীক্ষা

(ক) আলুটিকে জলের মধ্যে বসান হইয়াছে, (খ) পরীক্ষার আরম্ভে (গ) পরীক্ষার শেষে

এই পরীক্ষার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার দ্বারা পাত্রের জল আলুর কোষগুলির মধ্য দিয়া গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং গর্তের জলের পরিমাণ ও উচ্চতা বাড়াইতেছে।

এই প্রকারের অভিস্রবণ মূলেও হইয়া থাকে। মূলরোমের সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীরগুলি ভেদ্য পর্দার ন্যায় কাজ করে। মূলরোমের যে কোষগহ্বর আছে তাহার কোষ-রসে (Cell sap) প্রচুর দ্রবণীয় লবণ থাকায় মাটিতে অবস্থিত জল অপেক্ষা ইহা বেশী ঘন। মাটির জল এবং কোষরসের

মধ্যে সাইটোপ্লাজম পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দার ন্যায় কাজ করে। তাহার ফলে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাটির জল মূলরোমের কোষগহ্বরে প্রবেশ করে।



চিত্র—১২, এপিব্লেমা ও একটি মূলরোম

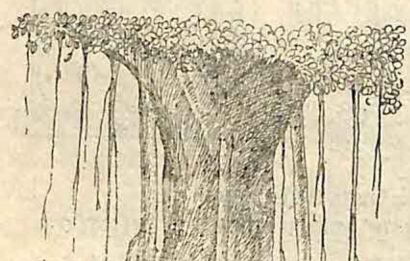
এই ভাবে উদ্ভিদ্ মূলরোমের সাহায্যে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাটি হইতে জল গ্রহণ করিয়া থাকে।

(২) **বিশেষ কার্য** (Special Function) :—

মাটি হইতে রস শোষণ বা দৃঢ়ভাবে গাছকে মাটির সঙ্গে আটকাইয়া রাখা ছাড়াও কয়েক প্রকার মূল সময়ে সময়ে বিশেষ ধরনের কার্য সমাধা করে। মূলের বিশেষ কার্যও সাধারণ কার্যের মত দুই প্রকার—

১। **যান্ত্রিক কার্য** (Mechanical Function)

উদ্ভিদ্‌কে অতিরিক্ত বলদানের জন্য কয়েক রকমের অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয় এবং বিশেষ কার্যসাধনের জন্য ইহাদের নানা প্রকার পরিবর্তন হইয়া থাকে।



চিত্র—১৩, বটগাছের স্তম্ভমূল

(ক) **স্তম্ভমূল বা ঝুরি** (Prop-root)—বট, রবার ইত্যাদি গাছের শাখা-প্রশাখা হইতে কতকগুলি অস্থানিক মূল উৎপন্ন হইয়া সোজা-সুজি নীচের দিকে নামিয়া আসে এবং পরে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। পরে ক্রমশঃ এইগুলি মোটা হইয়া থামের আকার ধারণ করে। এই সমস্ত গাছের বিশাল বিশাল সমান্তরাল শাখা প্রশাখা-গুলির ভার স্তম্ভমূল বহন করিয়া থাকে।

(খ) **ঠেশমূল** (Stilt root)—কেয়া প্রভৃতি গাছের প্রধান কাণ্ডটি যথেষ্ট দুর্বল হওয়ায় সোজাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। সেই হেতু কাণ্ডের গোড়ার চারিদিক হইতে কতকগুলি অস্থানিক মূল উৎপন্ন হইয়া তির্যকভাবে মাটিতে নামিয়া আসে এবং পরে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। এই ভাবে অস্থানিক ঠেশমূলগুলির সাহায্যে কাণ্ডটি সোজাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।



চিত্র—১৪, কেয়াগাছের ঠেশমূল



চিত্র—১৫, গজপিপুলের আরোহীমূল

(গ) **আরোহীমূল** (Climbing root)—পান, গজপিপুল প্রভৃতি কতকগুলি লতানো গাছের পর্ব হইতে কিছু সংখ্যক অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। এই মূলগুলির সাহায্যে এই গাছগুলি অন্য কোন বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, আলো ও বাতাসের জন্য উপরের দিকে উঠে।

(২) শারীরবৃত্তীয় কার্য (Physiological Function)

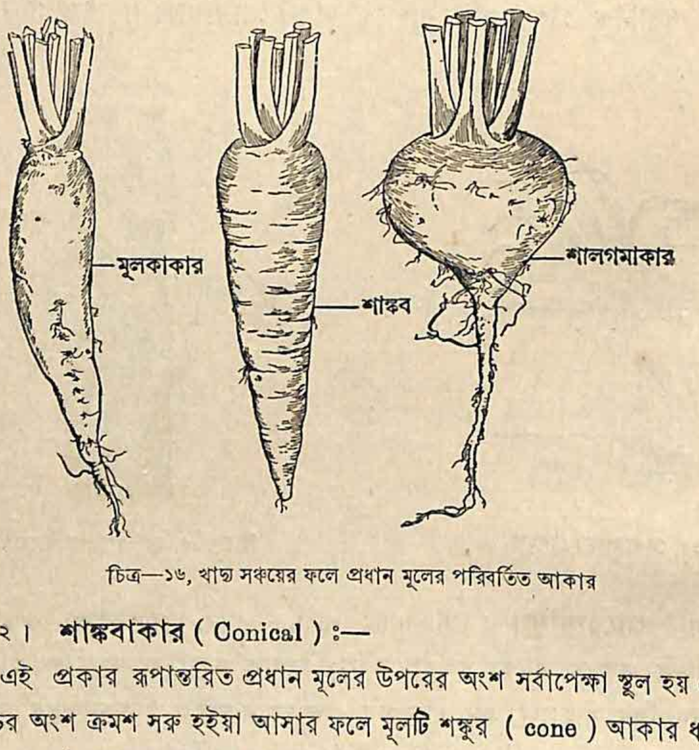
খাদ্য প্রস্তুত, খাদ্য সঞ্চয় ইত্যাদি নানা প্রকার বিশেষ শারীরবৃত্তীয় কার্য সাধনের জন্য স্থানিক এবং অস্থানিক মূলের বহু প্রকার পরিবর্তন হইয়া থাকে—

(i) **প্রধান মূলের পরিবর্তন** (Modified tap root) :—

ভবিষ্যতের জন্য প্রধান মূল অনেক সময় খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, এই খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে প্রধান মূল স্থুল হইয়া নানাপ্রকার আকার ধারণ করে। আকৃতি অনুযায়ী ইহাদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে—

১। **মূলকাকার বা মোচাকৃতি** (Fusiform) :—

যখন খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে প্রধান মূলের মধ্যস্থল স্ফীত হয় এবং উহার উপরের ও নীচের অংশ ক্রমশ সরু হইয়া কতকটা পটল বা মোচার আকৃতি ধারণ করে, তখন তাহাকে মূলকাকার বা মোচাকৃতি মূল বলে। যথা—মূলা।



চিত্র—১৬, খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে প্রধান মূলের পরিবর্তিত আকার

২। **শাঙ্কবাকার** (Conical) :—

এই প্রকার রূপান্তরিত প্রধান মূলের উপরের অংশ সর্বাপেক্ষা স্থূল হয় এবং নীচের অংশ ক্রমশ সরু হইয়া আসার ফলে মূলটি শঙ্কুর (cone) আকার ধারণ করে। এই প্রকার মূলকেই শাঙ্কবাকার মূল বলা হয়। যথা—গাজর।

৩। **শালগমাকার** (Napiform) :—

প্রধান মূলে খাদ্য সঞ্চিত হওয়ার ফলে মূলটির উপরের অংশ স্ফীত হইয়া প্রায় গোলাকার হইয়া যায় এবং নীচের অংশ হঠাৎ সরু হইয়া যায়। এই প্রকার মূলকে বলা হয় শালগমাকার মূল। যথা—বীট, শালগম ইত্যাদি।

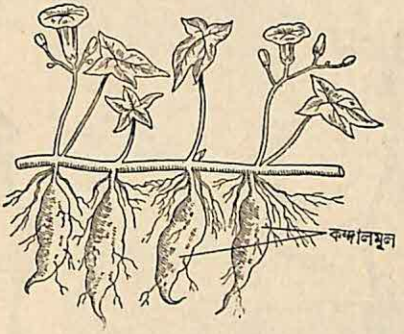
(ii) **অস্থানিক মূলের পরিবর্তন** (Modified adventitious roots) :

প্রধান মূলের মত অস্থানিক মূলও অনেক সময় খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং এই খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে অস্থানিক মূলেরও নানা প্রকার রূপান্তর দেখা যায়। তবে অস্থানিক মূলের পরিবর্তন বা রূপান্তর খাদ্য সঞ্চয় ছাড়াও অনেক প্রকার

শারীরবৃত্তীয় কার্য সাধনের জন্য হইয়া থাকে। ইহাদেরও আকৃতি বা প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন নামকরণ করা হইয়াছে—

(ক) **কন্দমূল** বা **কন্দালমূল** (Tuberous root) :—

কোন অস্থানিক মূল যখন খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে কোন নির্দিষ্ট আকার না লইয়া



চিত্র—১৭, রাঙ্গাআলুর কন্দালমূল

কন্দের মত স্ফীত হইয়া উঠে, তখন তাহাকে কন্দমূল বা কন্দালমূল বলে। যথা—রাঙ্গাআলু, শাঁকালু ইত্যাদি।

(খ) **গুচ্ছিত মূল** (Fasciculated root) :—

যখন কাণ্ডের গোড়ায় এক গুচ্ছ অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয় এবং সবগুলি মূলই

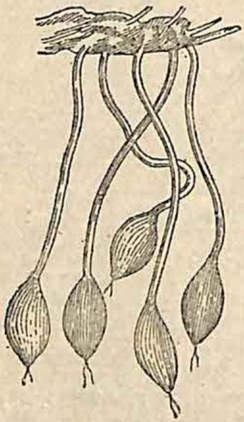


চিত্র—১৮, শতমূলীর গুচ্ছিত মূল

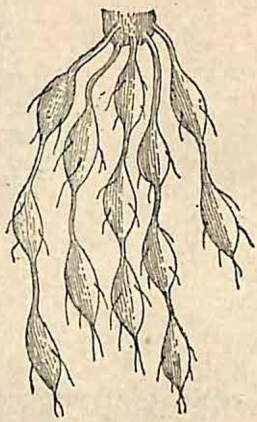
খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্ফীত হইয়া উঠে, তখন সেই প্রকার অস্থানিক মূলকে গুচ্ছিত মূল বলে। যথা—শতমূলী।

(গ) **অর্বুদযুক্ত মূল** (Nodulose root) :—

যখন কতকগুলি সুতার মত সরু অস্থানিক মূলের অগ্রভাগ খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে হঠাৎ স্ফীত হইয়া প্রায় গোলাকার ধারণ করে, তখন তাহাকে অর্বুদযুক্ত মূল বলে। যথা—মূথা ঘাস, আম-আদা ইত্যাদি।



চিত্র—১৯, আম-আদার অর্বুদযুক্ত মূল



চিত্র—২০, কাকরোলের মালাকৃতি মূল

(ঘ) **মালাকৃতি মূল** (Moniliform root) :—

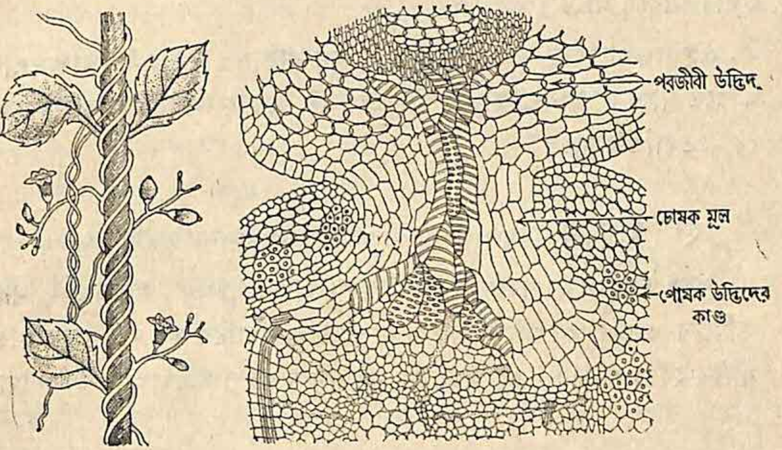
সরু সরু অস্থানিক মূলগুলি যখন খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে স্ফীত হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে মালার মত দেখায়, তখন তাহাকে মালাকৃতি মূল বলা হয়। যথা—কাকরোল ইত্যাদি।

কন্দমূল, গুচ্ছিত মূল, অর্বুদযুক্ত মূল ও মালাকৃতি মূলগুলির মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চিত থাকে বলিয়া এই চারিটি রূপান্তরিত মূলকে **ভাণ্ডার মূল** বা **সঞ্চয়ী মূল** (Storage root) বলে।

(ঙ) **শোষণ মূল** (Haustoria or sucking root) :—

সাধারণতঃ পরজীবী উদ্ভিদে (Parasitic plant) ক্লোরোফিল থাকে না বলিয়া তাহারা খাদ্যের জন্য অন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। পরজীবী উদ্ভিদের পর্ব হইতে কতকগুলি অস্থানিক মূল বাহির হইয়া আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের (Host plant) কাণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে। এই মূলগুলির সাহায্যে পরজীবী উদ্ভিদ্ আশ্রয় দাতা উদ্ভিদের দেহ হইতে রস (খাদ্য) শোষণ করিয়া বাঁচিয়া

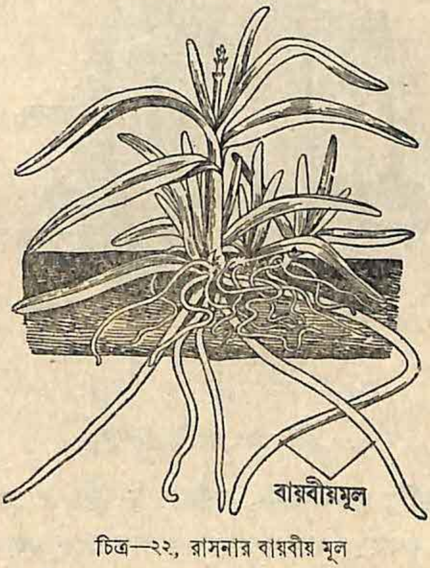
থাকে। এই অস্থানিক মূলগুলিকে শোষণ মূল বা চোষক মূল বলে। যথা—আলোকলতা, স্বর্ণলতা ইত্যাদি।



ক খ

চিত্র—২১, (ক) স্বর্ণলতার শোষণমূল, (খ) প্রস্থচ্ছেদ

(চ) **পরাশ্রয়ী মূল** বা **বায়বীয় মূল** (Epiphytic root) :—
পরাশ্রয়ী উদ্ভিদে দুই প্রকার অস্থানিক মূল দেখা যায়—এক প্রকার মূল



চিত্র—২২, রাসনার বায়বীয় মূল

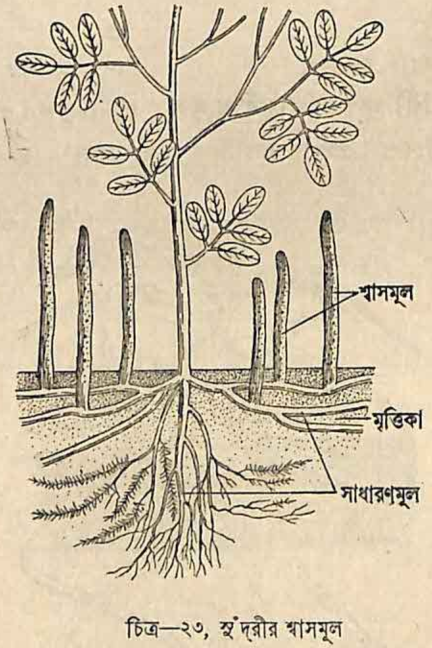
আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া থাকে এবং অন্য প্রকার মূলগুলি বাতাসে ঝুলিয়া

থাকে। এই দ্বিতীয় প্রকার মূলগুলিকেই পরাশ্রয়ী বা বায়বীয় মূল বলা হয়। বায়বীয় মূলগুলির চারিদিকে **ভেলামেন** (Velamen) নামক একপ্রকার নরম কলার আবরণ থাকে।

এই ভেলামেনের সাহায্যেই বায়বীয় মূল বাতাস হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করিতে পারে। রাসনা-জাতীয় উদ্ভিদে এই প্রকার অস্থানিক বায়বীয় মূল দেখিতে পাওয়া যায়।

(ছ) **শ্বাসমূল** (Breathing root or pneumatophores) :—

সমুদ্র উপকূলে যে সমস্ত লবণাম্বু উদ্ভিদ্ (Halophytes) জন্মায় সেই সকল উদ্ভিদের প্রধান কাণ্ডটিকে ঘিরিয়া কতকগুলি অস্থানিক মূল মাটি ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে। এই অস্থানিক মূলগুলি মূলের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে সাহায্য



চিত্র—২৩, সুঁদরীর শ্বাসমূল

করে। এই মূলগুলিতে কতকগুলি ছোট ছোট ছিদ্র থাকে এবং সেইগুলির মধ্য দিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বাতাস যাতায়াত করে, যথা—সুঁদরী, কেওড়া, গেঁও ইত্যাদি।

কাণ্ড সাধারণতঃ মাটির উপরে থাকে এবং ইহার উৎপত্তি **ভ্রূণমুকুল** (plumule) হইতে হইয়া থাকে। অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় ভ্রূণ মুকুলটি বীজ হইতে বাহির হইয়া সাধারণতঃ সোজা ভাবে মাটির উপরে উঠিয়া আসে এবং পরে এই অংশটিই কাণ্ডে রূপান্তরিত হয়। কাণ্ডের পরিধি সচরাচর গোল হয় তবে চতুর্ভুজ বা ত্রিকোণাকৃতিও হইয়া থাকে।

কাণ্ডের মধ্যে পর্ব থাকে এবং দুইটি পর্বের মধ্যস্থ অংশে থাকে পর্বমধ্য। পর্বের কক্ষে **কাক্ষিক মুকুল** (axillary bud) এবং কাণ্ডের শীর্ষে **শীর্ষ মুকুল** বা **অগ্রমুকুল** (terminal or apical bud) থাকে।

মুকুল (Bud) :—

প্রকৃতপক্ষে একটি অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট এবং সঙ্কুচিত শাখাকেই মুকুল বলে। একটি মুকুলে বহু পর্ব, পর্বমধ্য ও পত্র থাকে, তবে পর্বমধ্যগুলি থাকে সঙ্কুচিত ভাবে এবং পত্রগুলি থাকে ঘনসন্নিবিষ্ট অবস্থায়।

মুকুলের শীর্ষে একটি ক্রমবর্ধমান অগ্রভাগ থাকে, এবং মুকুল পত্র দ্বারা এই সমস্ত অংশগুলি (পর্ব, পর্বমধ্য ও অগ্রভাগ) আবৃত থাকে। বাঁধাকপি একটি



চিত্র—২৪, বৃহদাকার মুকুল (বাঁধাকপি)

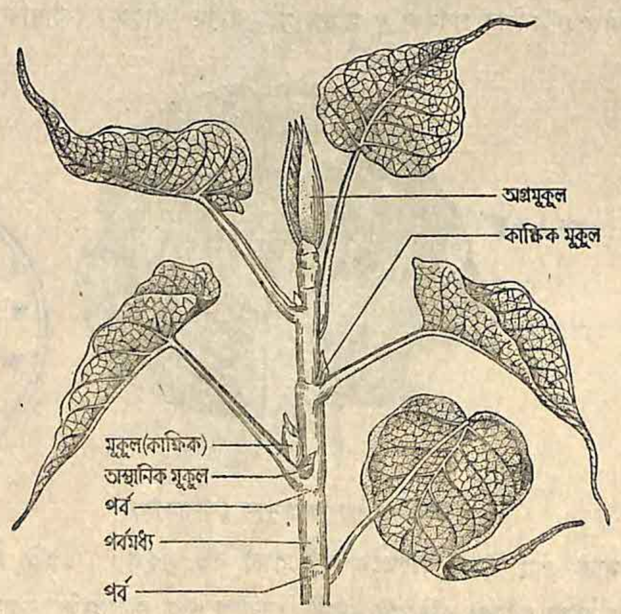
মুকুল মাত্র এবং ইহা আয়তনে সর্বাপেক্ষা বড় মুকুল। একটি বাঁধাকপির লম্বচ্ছেদ লইয়া পরীক্ষা করিলেই একটি মুকুলের সব অংশগুলি বুঝা যাইবে। দেখা যাইবে যে মুকুলের পর্ব, পর্বমধ্য ও ক্রমবর্ধমান অগ্রভাগ অংশগুলি বড় বড় মুকুলপত্র দ্বারা আবৃত।

বিভিন্ন প্রকারের মুকুল (Different types of buds) :—

নীচে বিভিন্ন প্রকারের মুকুলের একটি ছক দেওয়া হইল :

- **মুকুল** (প্রকৃতি অনুযায়ী)
  - পত্র-মুকুল (উৎপত্তি অনুযায়ী)
    - স্থানিক মুকুল (অবস্থিতি অনুযায়ী)
      - কাক্ষিক মুকুল
      - অগ্রমুকুল
    - অস্থানিক মুকুল (অবস্থিতি অনুযায়ী)
      - পত্রাশ্রয়ী মুকুল
      - কাণ্ডজ মুকুল
      - মূলজ মুকুল
  - পুষ্প-মুকুল (অবস্থিতি অনুযায়ী)
    - কাক্ষিক মুকুল
    - শীর্ষ মুকুল

প্রকৃতি অনুযায়ী দুই প্রকারের মুকুল দেখা যায়—যে সকল মুকুল হইতে পত্র বা শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হয় সেই সকল মুকুলকে বলা হয় **পত্র মুকুল** (leaf bud) এবং অন্য জাতীয় মুকুলটিকে বলা হয় **পুষ্প মুকুল** (flower bud)—



চিত্র—২৫, কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ

যেহেতু এই প্রকার মুকুল হইতে পুষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার অবস্থিতি

অনুযায়ী এই দুই প্রকার মুকুলকেই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পত্রকক্ষে যেই মুকুলগুলি অবস্থিত সেইগুলিকে **কাক্ষিক মুকুল** বা **কক্ষ মুকুল** (axillary bud) এবং কাণ্ডের শীর্ষে যেই মুকুলগুলি অবস্থিত সেইগুলিকে **শীর্ষ-মুকুল** বা **অগ্র-মুকুল** (terminal or apical bud) বলা হয়। পত্র-মুকুলগুলি কাক্ষিক হইলে সেই মুকুলগুলি হইতে নূতন শাখা-প্রশাখা বা পত্র উৎপন্ন হয় এবং শীর্ষ মুকুল হইলে গাছ লম্বায় বাড়ে।

কাক্ষিক মুকুল এবং শীর্ষ মুকুলগুলিকে **স্থানিক মুকুল** (normal bud or true bud) বলা হয়। পত্রের কক্ষ বা কাণ্ডের শীর্ষ ছাড়াও অন্যান্য স্থানে মুকুল জন্মাইতে পারে। সেই সকল মুকুলকে বলা হয় **অস্থানিক মুকুল** (adventitious bud or accessory bud)।

উৎপত্তি অনুযায়ী অস্থানিক মুকুলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—

(১) **পত্রাশ্রয়ী মুকুল** (Epiphyllous bud)—এই প্রকারের মুকুলগুলি উদ্ভিদের পত্র হইতে বাহির হয় ; যথা—পাথরকুচির পাতার মুকুল।

(২) **কাণ্ডজ মুকুল** (Cauline bud)—কতকগুলি গাছে দেখা যায় যে কাণ্ড ছাঁটিয়া ফেলিলে সেই ছাঁটা অংশের উপর মুকুল বাহির হয়, এই প্রকারের মুকুলকে কাণ্ডজ মুকুল বলে ; যথা—গোলাপ।

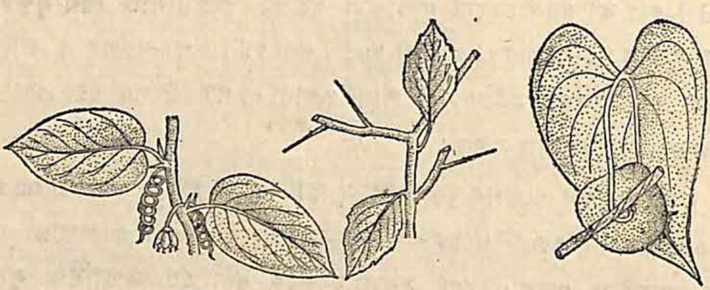
(৩) **মূলজ মুকুল** (Radical bud) এই জাতীয় মুকুল উদ্ভিদের মূল হইতে বাহির হয় ; যথা—পটল।

ইহা ছাড়াও অনেক সময় দেখা যায় যে, একই পত্রের কক্ষে একাধিক মুকুল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি স্থানিক, অপরগুলি অস্থানিক মুকুল। অস্থানিক মুকুলগুলি পাশাপাশি সাজানো থাকিলে তাহাকে **সমপার্শ্বীয় মুকুল** (Collateral buds) এবং একটির উপর আর একটি থাকিলে **উপরিপন্ন মুকুল** (Superposed buds) বলে।

কোন কোন গাছের মুকুল বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য রূপান্তরিত হইয়া থাকে :—

(ক) **আকর্ষ** (Tendril)—দুর্বল কাণ্ডযুক্ত কতকগুলি গাছের মুকুল আকর্ষে রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং এই আকর্ষ আশ্রয়দাতা গাছের উপর আরোহণে সাহায্য করে ; যথা—কুমড়া ইত্যাদি।

(খ) **শাখা কণ্টক** (Thorn)—আত্মরক্ষার জন্য আবার কয়েকটি গাছের মুকুল কণ্টকে রূপান্তরিত হয় ; যথা—তুরন্ত ইত্যাদি।



চিত্র—২৫(ক) ক—আকর্ষ খ—শাখাকণ্টক গ—বুলবিল

(গ) **বুলবিল** (Bulbil)—কয়েকটি গাছের মুকুলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চিত হওয়ার ফলে মুকুলগুলি গোলাকার হইয়া যায়। পরে এই মুকুলগুলি মাটিতে পড়িলে তাহা হইতে নূতন গাছের সৃষ্টি হইতে পারে ; যথা—কন্দপুষ্প (Globba bulbifera)।

কাণ্ডের আভ্যন্তরীণ গঠন (Internal structure of stems) :—

মূলের মত যদি কাণ্ডেরও একটি প্রস্থচ্ছেদ লইয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে সেই প্রস্থচ্ছেদে নানা প্রকার কলা বিন্যাস দেখা যায়। এই কলা বিন্যাস দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

(ক) **দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ্‌-কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ** (T. S. of Dicot stem) :—

একটি **সূর্যমুখী** গাছের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ লইয়া পরীক্ষা করিলে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কলাগুলিকে পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্যন্ত পরপর সজ্জিত দেখা যায় :—

(১) **বহিস্ত্বক** (Epidermis) :—

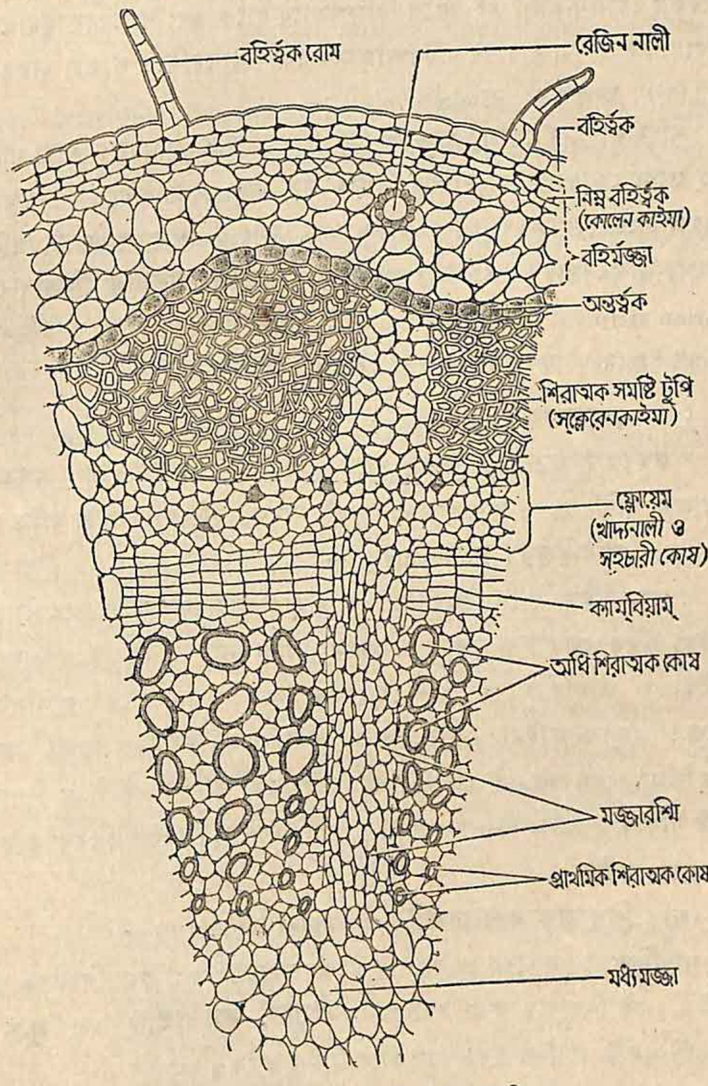
প্রস্থচ্ছেদের সর্বাপেক্ষা বাহিরের দিকে কতকগুলি সজীব আয়তক্ষেত্র কোষ একটি মাত্র স্তরে সজ্জিত থাকিয়া এই বহিস্ত্বক গঠন করে। বহিস্ত্বকের বহিঃ-প্রাচীর কিউটিক্‌ল (cuticle) যুক্ত হয় এবং কোষগুলি পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট থাকার জন্য ইহাদের মধ্যে কোনও আন্তঃকোষ রন্ধ্র থাকে না। কতকগুলি বহুকোষী কাণ্ড-রোম বহিস্ত্বক হইতে বাহির হয়। বহিস্ত্বকে অল্প সংখ্যক পত্ররন্ধ্রও থাকে।

(২) **বহির্মজ্জা** (Cortex) :—

বহিস্ত্বকের ঠিক ভিতরের অংশটিকেই বহির্মজ্জা বলা হয়। বহির্মজ্জা নিম্নলিখিত কলাগুলি লইয়া গঠিত—

(ক) **অধস্তক** (Hypodermis) :—

বহির্মজ্জার সর্বাপেক্ষা বাহিরের অংশ, অর্থাৎ যে অংশটি ঠিক বহিস্ত্বকের ভিতরেই থাকে তাহাকে অধস্তক বলে। ইহা কতকগুলি সজীব কোলেনকাইমা



চিত্র—২৬, সূর্যমুখীর কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)

কোষ লইয়া গঠিত এবং একাধিক স্তরে সজ্জিত। এই কোষগুলির মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

(খ) **সাধারণ বহির্মজ্জা** (General cortex) :—

কেবলমাত্র কতকগুলি প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা, অধস্তকের পরবর্তী এই অংশটি গঠিত। বড় বড় গোলাকার কোষগুলি বহুস্তরে সজ্জিত থাকে। কয়েকটি রেজিন-নালী এই অংশে বিক্ষিপ্তভাবে থাকে এবং প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত বলিয়া সাধারণ বহির্মজ্জায় অন্তঃকোষরন্ধ্র দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) **অন্তর্ত্বক** (Endodermis) :—

বহির্মজ্জার সর্বাপেক্ষা ভিতরের অংশ একটিমাত্র কোষস্তর দ্বারা গঠিত। এই স্তরের কোষগুলিকে দেখিতে পিপার মত এবং ঘনসন্নিবিষ্ট। অন্তর্ত্বকের পার্শ্বপ্রাচীরের স্থূলীকরণ হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে পার্শ্বপ্রাচীরগুলিকে ফিতার ন্যায় দেখায়। এই ফিতাগুলির নাম **ক্যাস্‌পেরিয়ান ফিতা** (Casparian strip)। অন্তর্ত্বকের কোষগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে স্টার্চ জমা হয় বলিয়া ইহাকে স্টার্চ আবরণীও বলা হইয়া থাকে।

(৩) **কেন্দ্রস্তম্ভ** (Stele) :—

অন্তর্ত্বকের ভিতরে যে অংশটি থাকে তাহাকেই কেন্দ্রস্তম্ভ বলে। কেন্দ্রস্তম্ভ প্রধানতঃ পরিধিস্তর ও শিরাত্মক কলাসমষ্টি নামক দুইটি কলা লইয়া গঠিত।

(ক) **পরিধিস্তর** (Pericycle) :—

প্যারেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা কোষ দ্বারা পরিধিস্তর গঠিত তবে প্যারেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা কোষ একসঙ্গে থাকে না। কিছু অংশ প্যারেনকাইমা ও তাহার পরের অংশ স্ক্লেরেনকাইমা এই ভাবে কোষগুলি সজ্জিত থাকে। স্ক্লেরেনকাইমা কোষগুলিকে দেখা যায় শিরাত্মক কলা সমষ্টির ঠিক উপরে, সেই জন্য এই কোষবিশিষ্ট অংশটিকে **বাণ্ডিল টুপি** বা শিরাত্মক সমষ্টি টুপি (Bundle cap) বলা হয়। পরিধিস্তরের কোষগুলি বেশ কয়েকটি স্তর লইয়া গঠিত।

(খ) **শিরাত্মক কলা সমষ্টি** (Vascular bundle) :—

পরিধিস্তরের ভিতরেই যে অংশটি থাকে তাহাকেই বলা হয় শিরাত্মক কলা সমষ্টি। এই শিরাত্মক কলা সমষ্টিগুলি **সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয়** এবং **মুক্ত** ও এইগুলি একটি পরিধির উপর চক্রাকারে বিন্যস্ত থাকে।

শিরাত্মক কলা সমষ্টিতে তিন প্রকার কলা দেখা যায়—

(i) **ফ্লোয়েম** (Phloem)—সীভনল, সঙ্গী কোষ ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত এই কলাটি শিরাত্মক কলাসমষ্টির বাহিরের দিকে অবস্থিত।

(ii) **ক্যাম্বিয়াম** (Cambium)—শিরাত্মক কলাসমষ্টিগুলি মুক্ত বলিয়া ফ্লোয়েম ও জাইলেমের মধ্যবর্তী অংশে কতকগুলি ছোট ছোট কোষ দ্বারা গঠিত এই ভাজক কলাটি থাকে।

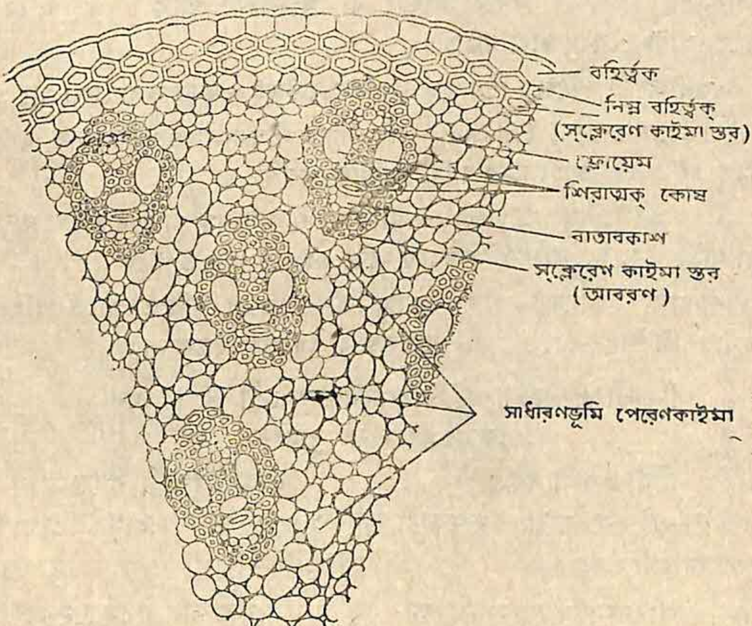
(iii) **জাইলেম** (Xylem)—শিরাত্মক কলা সমষ্টির সর্বাপেক্ষা ভিতরের দিকে থাকে জাইলেম। ইহা ট্র্যাকীয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও কাষ্ঠল তন্তু দ্বারা গঠিত।

(iv) **মজ্জারশ্মি** (Medullary rays)—দুইটি শিরাত্মক কলা সমষ্টির মধ্যবর্তী স্থানে প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত এই মজ্জারশ্মিগুলি থাকে। এইগুলি পরিধিস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

(v) **মজ্জা** (Pith)—প্রস্থচ্ছেদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত এই মজ্জা। মজ্জার কোষগুলি বেশ বড় বড় এবং আন্তঃকোষ-রন্ধ্রও আছে।

(খ) **একবীজপত্রী উদ্ভিদ্-কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ** (T. S. of Monocot stem) :—

একটি **ভুট্টার** কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ লইয়া পরীক্ষা করিলে তাহার মধ্যে নিম্ন-লিখিত কলাগুলিকে পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্যন্ত সজ্জিত দেখা যায় :—



চিত্র—২৭, ভুট্টার কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)

(১) **বহিস্ত্বক** (Epidermis) :—

প্রস্থচ্ছেদের সর্বাপেক্ষা বাহিরের দিকে কতকগুলি সজীব আয়তক্ষেত্র কোষ একটিমাত্র স্তরে সজ্জিত থাকিয়া এই বহিস্ত্বক গঠন করে।

বহিস্ত্বকের বহিঃপ্রাচীর কিউটিকল (cuticle) যুক্ত হয়। বহিস্ত্বকে কিন্তু কোন কাণ্ড-রোম নাই।

(২) **অধস্ত্বক** (Hypodermis) :—

বহিস্ত্বকের ভিতরেই দুই বা তিন স্তরবিশিষ্ট এবং স্ক্লেরেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত এই অধস্ত্বক দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তরটিকে নিম্ন-বহিস্ত্বক বলা হয়।

(৩) **আদি কলা** (Ground tissue) :—

অধস্ত্বকের ঠিক পরেই বহুস্তরবিশিষ্ট এবং প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত এই আদি কলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অংশে আন্তঃকোষরন্ধ্র আছে এবং ইহা কাণ্ডের কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। আদিকলাকে সাধারণভূমি প্যারেনকাইমাও বলা হইয়া থাকে।

(৪) **শিরাত্মক কলাসমষ্টি** (Vascular bundle) :—

বহু সংখ্যক শিরাত্মক কলাসমষ্টি আদি কলার মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়া থাকে এবং এইগুলি **সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয়** ও **বদ্ধ**। প্রতিটি শিরাত্মক কলাসমষ্টির চারিদিকে একটি আবরণ বা আচ্ছাদনী থাকে। এই আবরণ স্ক্লেরেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের শিরাত্মক কলাসমষ্টিতে দুই প্রকার কলা দেখা যায়:

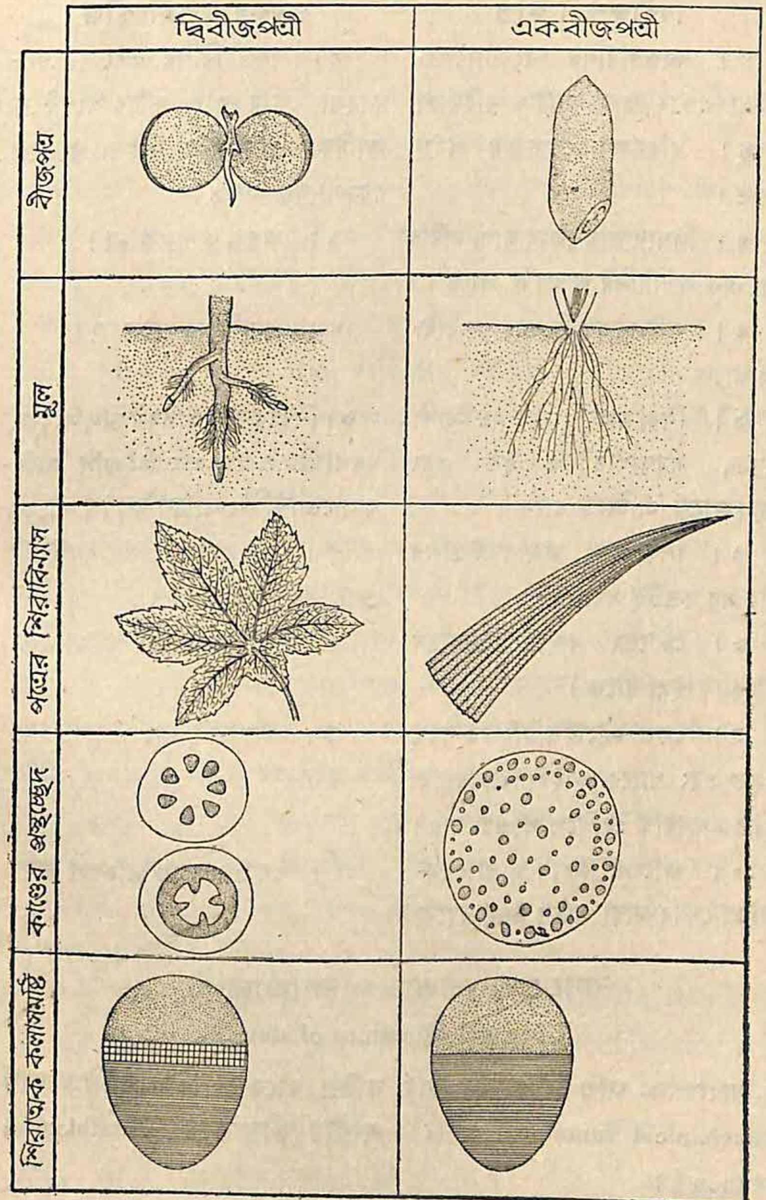
(i) **ফ্লোয়েম** (Phloem)—কেবলমাত্র সীভনালী ও সঙ্গী-কোষ দ্বারা গঠিত এই কলাটি জাইলেমের বাহিরের দিকে অবস্থিত।

(ii) **জাইলেম** (Xylem)—ট্র্যাকীয়া ও জাইলেম প্যারেনকাইমা দ্বারা ইহা গঠিত এবং ইংরাজী 'Y' অক্ষরের মতো এইগুলি সজ্জিত থাকে।

শিরাত্মক কলাসমষ্টি আদি কলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে সজ্জিত থাকে বলিয়া একবীজপত্রী উদ্ভিদ্-কাণ্ডে কোন কেন্দ্রস্তম্ভ বা মধ্যমজ্জা থাকে না।

দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের তুলনা

দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড	একবীজপত্রী কাণ্ড
১। বহিস্ত্বক হইতে বহুকোষী কাণ্ডরোম বাহির হয়।	১। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কাণ্ডরোম নাই।
২। কোলেনকাইমা অথবা স্ক্লেরেনকাইমা কোষ দ্বারা অধস্ত্বক গঠিত।	২। কেবলমাত্র স্ক্লেরেনকাইমা কোষ দ্বারাই অধস্ত্বক গঠিত।


দ্বিবীজপত্রী
একবীজপত্রী
বীজপত্র
মূল
পত্রের শিরাবিন্যাস
কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ
শিরাত্মক কলাসমষ্টি

দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড	একবীজপত্রী কাণ্ড
৩। বহুস্তরবিশিষ্ট এবং প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত বহির্মজ্জা আছে। বহির্মজ্জা কেন্দ্রস্তম্ভ পর্যন্ত বিস্তৃত।	৩। বহুস্তরবিশিষ্ট এবং প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত অংশটিকে আদিকলা বলে। আদিকলা কাণ্ডের কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।
৪। পিপার ন্যায় কোষ দ্বারা গঠিত এবং এক-স্তরবিশিষ্ট অন্তর্ত্বক আছে।	৪। অন্তর্ত্বক থাকে না।
৫। অন্তর্ত্বকের ভিতরে পরিধিস্তর থাকে।	৫। পরিধিস্তর থাকে না।
৬। শিরাত্মক কলাসমষ্টিগুলি সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও মুক্ত এবং **চক্রাকারে সজ্জিত** থাকে।	৬। শিরাত্মক কলাসমষ্টিগুলি সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও বদ্ধ এবং এইগুলি আদিকলাতে **বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান** থাকে।
৭। শিরাত্মক কলাসমষ্টিগুলির প্রায় সব কয়টিই সমান।	৭। শিরাত্মক কলাসমষ্টিগুলি ছোট বড় হইয়া থাকে।
৮। ফ্লোয়েম কলায় ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে।	৮। ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা নাই।
৯। কেন্দ্র হইতে পরিধিস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত মজ্জারশ্মি দেখিতে পাওয়া যায়।	৯। মজ্জারশ্মি নাই।
১০। কাণ্ডের মধ্যস্থলে প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত মজ্জা থাকে।	১০। কেন্দ্রস্থলে কোন মজ্জা নাই।

কাণ্ডের সাধারণ কার্যাবলী

(Normal Functions of stem)

সাধারণতঃ কাণ্ড দুই প্রকার কার্য করিয়া থাকে:—(১) **যান্ত্রিক কার্য** (Mechanical function) ও (২) **শারীরবৃত্তীয় কার্য** (Physiological function)।

১। **যান্ত্রিক কার্য** (Mechanical function)—শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল কাণ্ডে উৎপন্ন হয়। এই গুলির ভার গ্রহণ করা এবং যাহাতে ইহারা সূর্যালোক পাইতে পারে সেই হেতু উপরের দিকে তুলিয়া ধরাই কাণ্ডের যান্ত্রিক কার্য।

২। **শারীরবৃত্তীয় কার্য** (Physiological function)—কাণ্ডের অভ্যন্তরের কতকগুলি বিশেষ কোষ দ্বারা এই শারীরবৃত্তীয় কার্য সাধিত হয়। জল ও খাদ্য সঞ্চালনই হইতেছে কাণ্ডের শারীরবৃত্তীয় কার্য।

মূলরোম দ্বারা শোষিত রস কাণ্ডের মধ্য দিয়া উপরে উঠিয়া বিভিন্ন পাতার ভিতর আসিয়া জমা হয়। এই **জল সঞ্চালন** (Translocation of water) প্রক্রিয়া শিরাত্মক কলাসমষ্টির জাইলেম কলার দ্বারা সাধিত হয়। উদ্ভিদ্ কাণ্ডের মধ্য দিয়া জল সঞ্চালন বা রস সঞ্চালন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে, তাহাদের মধ্যে (১) **অধিপ্রাণ মতবাদ** (Vitalistic theory), (২) **মূলচাপ মতবাদ** (Root pressure theory) ও (৩) **ভৌত মতবাদ** (Physical theory or Cohesion theory) উল্লেখযোগ্য।

(১) **অধিপ্রাণ মতবাদ**—এই মতবাদটি ছিল জগৎবিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের। তাঁহার মতে উদ্ভিদের জল-সঞ্চালন জীবিত প্যারেন-কাইমা কোষের মাধ্যমে হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে বহির্মজ্জার ভিতরের দিকের প্যারেনকাইমা কোষগুলি একটি বিশেষ গুণের অধিকারী। এই কোষগুলি হৃৎপিণ্ডের ন্যায় পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় এবং কোষগুলি কপাটিকা যুক্ত হওয়ার ফলে মূলরোম দ্বারা শোষিত জল নিম্নপ্রান্ত হইতে কাণ্ডের মধ্য দিয়া উর্ধ্বদিকে সঞ্চালিত হয়।

বিজ্ঞানী ষ্ট্রাসবার্গার কয়েকটি পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করেন যে, প্যারেন-কাইমা কোষে কোন কপাটিকা নাই এবং ইহা পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিতও হয় না; এবং ইহাও প্রমাণ করেন যে কেবলমাত্র শিরাত্মক কলাদ্বারাই উদ্ভিদের উর্ধ্বদিকে জল সঞ্চালন হইয়া থাকে।

(২) **মূলচাপ মতবাদ**—এই মতবাদ, কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতে, উদ্ভিদের জল সঞ্চালনের জন্য দায়ী। কিন্তু পরীক্ষার ফলে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই মূলচাপ কেবলমাত্র দুই বায়ুচাপের সমান। অর্থাৎ মূলচাপ মতবাদ অনুযায়ী কেবলমাত্র ৬৮ ফিট উপর পর্যন্ত জলসঞ্চালন সম্ভব। কিন্তু পৃথিবীতে বহুসংখ্যক উদ্ভিদ আছে যাহাদের উচ্চতা ৬৮ ফিটেরও অধিক। এইজন্য উর্ধ্বজল সঞ্চালনের পক্ষে এই মতবাদ বাতিল হইয়া যায়।

(৩) **ভৌত মতবাদ**—উদ্ভিদের জল সঞ্চালনের জন্য মূলচাপ অপেক্ষা বাষ্প-মোচনের প্রয়োজন অধিকতর এবং এই বাষ্প মোচনের ফলে শিরাত্মক কলাস্থিত জল উপরের দিকে উঠিয়া থাকে—ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইলে,

এই প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া ডিক্সন ও জোলী (Dixon & Joly) তাহাদের ভৌত মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বাষ্প-মোচনের ফলে উদ্ভিদের জল বাহিরে চলিয়া যায়, ফলে পত্রের মেসোফিল কোষের কৈশিক নালিকাগুলির জলে টান পড়ে। কৈশিক নালিকার জল বাহির হইয়া গেলে উহা সংলগ্ন প্রটোপ্লাজম হইতে প্রয়োজনীয় জল গ্রহণ করে। প্রটোপ্লাজম তাহার প্রয়োজনীয় জল শিরাত্মক কোষ হইতে গ্রহণ করে।

শিরাত্মক কলায় প্রচুর সংখ্যায় কৈশিক নালিকা বিদ্যমান, এবং এই কৈশিক নালিকার অন্তস্থঃ গহ্বর (lumen) যত সূক্ষ্ম হইবে কৈশিক নালিকাস্থ জলের উচ্চতা ততই উর্দ্ধে উঠিবে। শিরাত্মক কলার কৈশিক নালিকা-গহ্বরগুলি এতই সূক্ষ্ম যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ উদ্ভিদের উচ্চতম পত্রেও ইহার জল পৌছাইবে। ডিক্সন ও জোলীর মতে জল অণুর পরস্পরের মধ্যে সংসক্তি (Cohesion) এবং শিরাত্মক কোষ-প্রাচীর ও জল-অণুর মধ্যে আসঞ্জন (Adhesion) থাকার ফলে কৈশিক জলে কোন ছেদ দেখা যায় না। ডিক্সন ও জোলীর ভৌত মতবাদ ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, বাষ্পমোচনের ফলে পত্রের মেসোফিল কোষ যে পরিমাণ জল বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দিতেছে সেই পরিমাণ জল আবার শিরাত্মক কলা হইতে গ্রহণ করিতেছে এবং শিরাত্মক কলার জলের অভাব পূরণ করিতেছে মূলরোম হইতে শোষিত জল। এই মূলরোম দ্বারা শোষিত জল বাষ্পমোচনজনিত টান-এর (tension) ফলে শিরাত্মক কলার কৈশিক নালিকা দ্বারা উদ্ভিদের উপরের দিকে চালিত হইতেছে।

পাতা হইতে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে তরল খাদ্য প্রবাহিত হয় এবং এই খাদ্য সঞ্চালন ফ্লোয়েমের সাহায্যে হইয়া থাকে।

কাণ্ডের রূপান্তর ও উহাদের বিশেষ কার্যাবলী (Modification of stems and their special functions) :—

সাধারণ কার্য ছাড়াও কাণ্ড কতকগুলি বিশেষ প্রকার কার্য সাধন করিয়া থাকে এবং কার্য অনুযায়ী তাহাদের দেহেরও নানা প্রকার রূপান্তর ঘটে।

প্রধানত এই রূপান্তর তিন প্রকার—(১) **মৃদ্গত** (Underground or Subterranean), (২) **অর্ধ বায়বীয়** (Subaerial) ও (৩) **বায়বীয়** (Aerial)।

নীচে ইহাদের একটি ছক দেওয়া হইল—

- রূপান্তরিত কাণ্ড
  - মৃদ্গত
    - গ্রন্থিকাণ্ড
    - স্থূলকন্দ
    - গুঁড়িকন্দ
    - কন্দ
      - পূরিত কন্দ
      - শল্কিত কন্দ
  - অর্ধবায়বীয়
    - ধাবক
    - বক্রধাবক
    - হ্রস্বধাবক
    - উর্ধ্বধাবক
  - বায়বীয়
    - শাখাকণ্টক
    - আকর্ষ
    - পর্ণকাণ্ড

১। **মৃদ্গত কাণ্ড** (Underground or Subterranean stem)—

কতকগুলি গাছের কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখা সর্বদা মাটির ভিতরে থাকিয়া বৃদ্ধিলাভ করে। মৃদ্গত কাণ্ডগুলি প্রধানত তিন প্রকার কার্য সাধন করে—

(১) প্রতিকূল অবস্থায় যখন উদ্ভিদের বায়বীয় অংশ শুকাইয়া যায় তখন মাটির নীচের অংশ বাঁচিয়া থাকে এবং পরে আবার অনুকূল অবস্থায় মাটির নীচের অংশ হইতে নূতন বায়বীয় অংশ বাহির হয়।

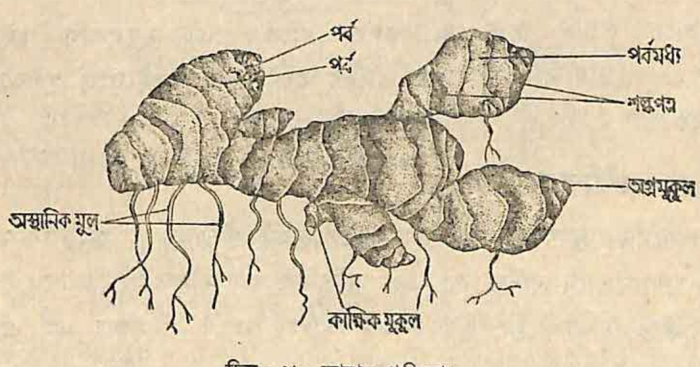
(২) মৃদ্গত কাণ্ডে ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চিত থাকে।

(৩) মুকুলের সাহায্যে ইহাদের অঙ্গজ জনন হইয়া থাকে এবং এইভাবে বংশ বিস্তার করে।

চারি প্রকারের মৃদ্গত কাণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়—

(১) **গ্রন্থিকাণ্ড** (Rhizome)—

গ্রন্থিকাণ্ড মাটির নীচে মাটির সমান্তরাল ভাবে জন্মায় ও বর্ধিত হয়। এইগুলি



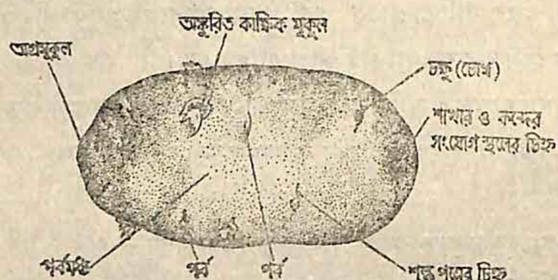
চিত্র—২৮, আদার গ্রন্থিকাণ্ড

দেখিতে মূলের মতো, তবে সুস্পষ্ট পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। পর্ব হইতে শল্ক-

পত্র ও অস্থানিক মূল জন্মায়। কাক্ষিক মুকুলগুলি শল্কপত্রের কক্ষে উৎপন্ন হয় এবং এইগুলি হইতে নূতন শাখা-প্রশাখার উৎপত্তি হয় এবং কতকগুলি মুকুল হইতে অনুকূল অবস্থায় বায়বীয় কাণ্ডও উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রন্থিকাণ্ডের অগ্রভাগে অগ্রমুকুল দেখা যায়। আদা, হলুদ ইত্যাদি ইহার উদাহরণ।

(২) **স্থূলকন্দ** (Tubers)—

মৃদ্‌গত কাণ্ডের অগ্রভাগে অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চিত হইবার ফলে এই অগ্রভাগগুলি স্থূল হইয়া গোলাকার হইয়া যায়। কাণ্ডের ঐ গোলাকার অগ্রভাগটিকেই স্থূলকন্দ বলা হয়। বায়বীয় কাণ্ডের মতো এই মৃদ্‌গত স্থূল কাণ্ডেরও পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। এই পর্বগুলি হইতে ছোট ছোট শল্কপত্র বাহির হয় এবং এই শল্কপত্রগুলির কক্ষ হইতে কাক্ষিক মুকুল বাহির হয়। স্থূলকন্দের



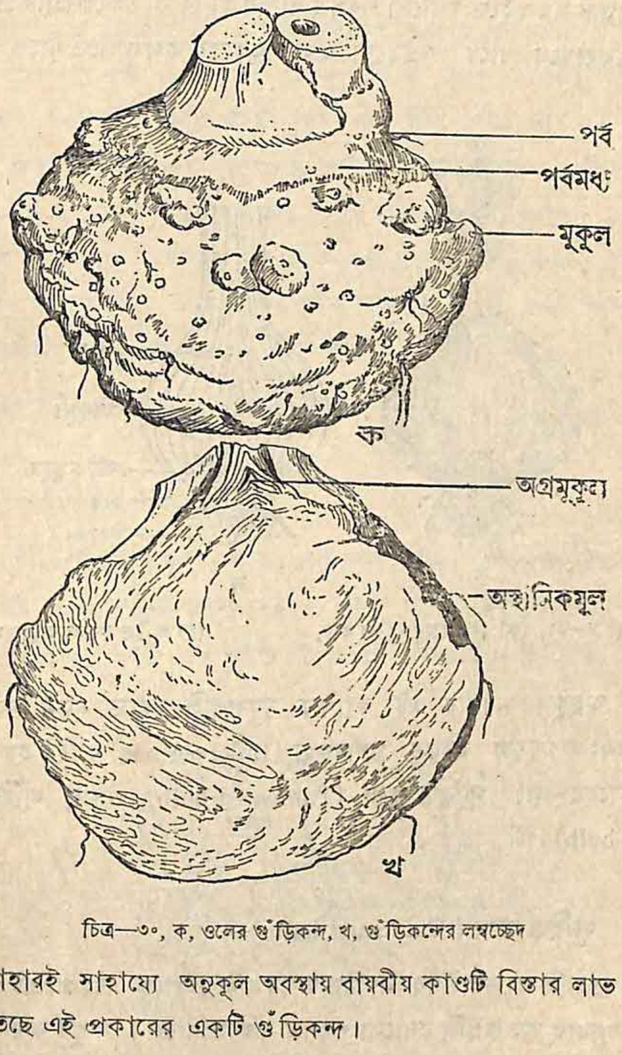
চিত্র—২৯, আলুর স্থূলকন্দ

অগ্রভাগে একটি ছোট অগ্রমুকুলও থাকে। এই মুকুলগুলি হইতেই অনুকূল অবস্থায় বায়বীয় কাণ্ড বাহির হয়। আলু হইতেছে স্থূলকাণ্ডের উদাহরণ।

(৩) **গুঁড়িকন্দ** (Corm)—

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মৃদ্‌গত কাণ্ড হইতেছে এই গুঁড়িকন্দ। গুঁড়িকন্দ মাটির নীচে সোজাভাবে বর্ধিত হয় এবং অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চিত হইবার ফলে ইহারা গোলাকার হইয়া গাছের গুঁড়ির মত দেখিতে হয়। সেইজন্য এই প্রকার মৃদ্‌গত কাণ্ডকে গুঁড়িকন্দ বলে। গুঁড়িকন্দের উপর বেশ কিছু অস্থানিক মূল জন্মায় এবং গুঁড়িকন্দের পর্ব ও পর্বমধ্য আছে। পর্বগুলি হইতে যে শল্কপত্রগুলি

জন্মায় সেইগুলিরই কক্ষে কাক্ষিক মুকুলগুলি থাকে। গুঁড়িকন্দের যে অগ্রমুকুলটি



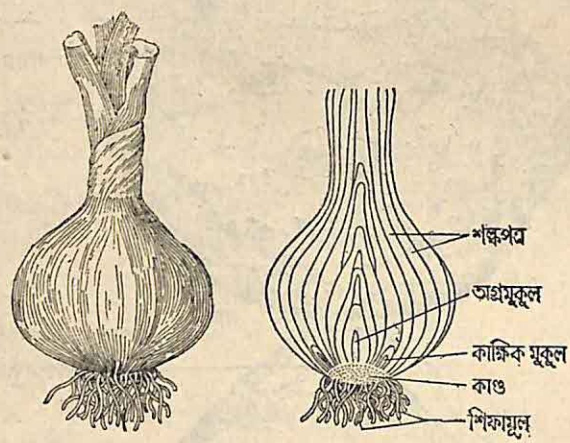
চিত্র—৩০, ক, ওলের গুঁড়িকন্দ, খ, গুঁড়িকন্দের লম্বচ্ছেদ

থাকে তাহারই সাহায্যে অনুকূল অবস্থায় বায়বীয় কাণ্ডটি বিস্তার লাভ করে। ওল হইতেছে এই প্রকারের একটি গুঁড়িকন্দ।

(৪) কন্দ (Bulb)—

ছোট ছোট চাকতির মত দেখিতে এই কন্দগুলি হইতেছে মৃদ্গত কাণ্ডগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম। এই কন্দের পর্বমধ্যগুলি এত বেশী ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট যে মনে হয় একটি পর্বের গায় আর একটি পর্ব লাগিয়া রহিয়াছে।

কন্দের নীচের দিক হইতে অনেকগুলি অস্থানিক মূল বাহির হয় ও উপরের দিকে প্রতিটি পর্ব হইতে রসালো শল্কপত্র বাহির হইয়া কাণ্ডটিকে ঢাকিয়া রাখে। কাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে থাকে অগ্রমুকুল এবং শল্কপত্রের কক্ষগুলিতে থাকে কাক্ষিক



ক খ

চিত্র—৩১, (ক) পিঁয়াজের পূরিত কন্দ, (খ) পূরিত কন্দের লম্বচ্ছেদ

মুকুল। অনুকূল অবস্থায় এই কাক্ষিক মুকুলগুলি হইতে নূতন নূতন গাছ জন্মায় এবং অগ্রমুকুল হইতে পুষ্পমঞ্জরী (Inflorescence) বাহির হয়। কন্দ দুই প্রকারের—(i) **পূরিত কন্দ** (Tunicated bulb) ও (ii) **শল্কিত কন্দ** (Scaly bulb)।

(i) **পূরিত কন্দ** (Tunicated bulb)—

শল্কপত্রগুলি কন্দের উপর নিয়মিত ভাবে সজ্জিত থাকে এবং প্রতিটি শল্কপত্রের ভিতরে আবার কতকগুলি রসালো শল্কপত্র সজ্জিত থাকে। সম্পূর্ণ কন্দটি আবার একটি শুষ্ক ঝিল্লিদ্বারা আবৃত থাকে। পিঁয়াজ পূরিত কন্দের একটি উদাহরণ।

(ii) **শল্কিত কন্দ** (Scaly bulb)—

শল্কিত কন্দের শল্কপত্রগুলি নিয়মিত ভাবে সজ্জিত নহে এবং সম্পূর্ণ কন্দটিকে আবৃত করিয়া কোন ঝিল্লি থাকে না। লিলির কন্দটি শল্কিত কন্দের উদাহরণ।

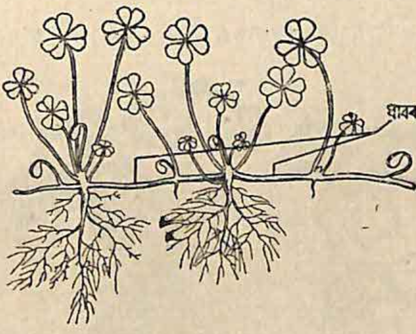
২। **অর্ধবায়বীয় কাণ্ড** (Subaerial stem)—

কতকগুলি বিশেষ ধরনের উদ্ভিদের কাণ্ড সমান্তরাল ভাবে মাটির উপর দিয়া বাড়িতে থাকে এবং এই সকল উদ্ভিদের কাণ্ডের পর্ব হইতে নীচের দিকে কিছু অস্থানিক মূল ও উপরের দিকে বিটপ অংশ বাহির হয়। পরে ইহাদের পর্বমধ্যগুলি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। আবার কতকগুলি উদ্ভিদের শাখাগুলি মাটির নীচে জন্মায় এবং কিছুদূর পর্যন্ত মাটির নীচ দিয়া অগ্রসর হইয়া মাটির উপরে বাহির হইয়া আসে। এই শাখাগুলিরও কতকগুলি অস্থানিক মূল থাকে এবং পরে শাখাটি প্রধান কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই প্রকারে অর্ধবায়বীয় কাণ্ড দ্বারা **অঙ্গজ জনন** (Vegetative reproduction) হইয়া থাকে।

অর্ধবায়বীয় কাণ্ড চারি প্রকারের দেখা যায়—

(১) **ধাবক** (Runner)—

কাণ্ড হইতে শাখা বাহির হইয়া মাটির উপর দিয়া সমান্তরাল ভাবে বাড়িতে থাকে এবং বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া ইহাকে ধাবক বলা হয়। এই শাখাগুলি অত্যন্ত সরু হইয়া থাকে এবং পর্বমধ্যগুলি খুব লম্বা হয়। পর্ব-

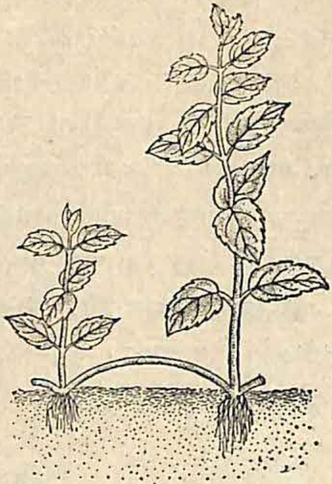


চিত্র—৩২, আমরুল শাকের ধাবক

গুলি হইতে অস্থানিক মূল বাহির হইয়া মাটিতে প্রবেশ করে এবং পর্বগুলি হইতেই উপরের দিকে কতকগুলি পাতার উৎপত্তি হয়। আমরুল শাক ধাবকের উদাহরণ।

(২) **বক্রধাবক** (Stolon)—

ইহারা একটি বিশেষ প্রকারের ধাবক। বক্র ধাবকের পর্বমধ্যগুলি ধনুকের



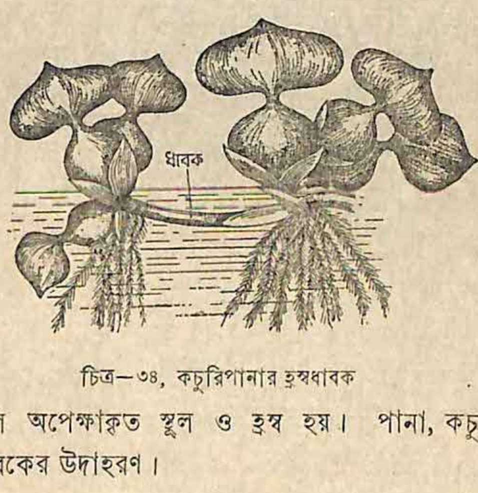
চিত্র—৩৩, মেন্থার বক্রধাবক

মত বাঁকিয়া থাকার জন্য কেবলমাত্র পর্বগুলিই মাটি স্পর্শ করে। ধাবকের মত বক্রধাবকের পর্বগুলি হইতেও নিচের দিকে অস্থানিক মূল ও উপরের দিকে শাখা উৎপন্ন হয়।

মেন্থা, স্ট্রবেরী ইত্যাদি হইতেছে বক্রধাবকের উদাহরণ।

(৩) **হ্রস্বধাবক** (Offset)

সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদেই হ্রস্বধাবক উৎপন্ন হয়। ইহারাও ধাবকের মত,

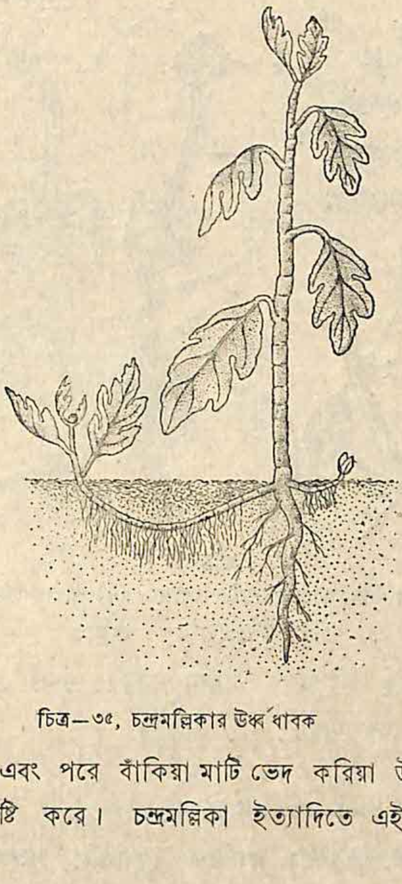


চিত্র—৩৪, কচুরিপানার হ্রস্বধাবক

তবে পর্বমধ্যগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল ও হ্রস্ব হয়। পানা, কচুরিপানা ইত্যাদি হইতেছে হ্রস্বধাবকের উদাহরণ।

(৪) **উধ্বর্ধাবক** (Sucker)—

কাণ্ডের মাটির নীচের অংশ হইতে মুকুল জন্মাইয়া থাকে এবং এই মুকুল হইতে শাখা উৎপন্ন হইয়া মাটির নীচ দিয়াই সমান্তরাল ভাবে কিছুদূর



চিত্র—৩৫, চন্দ্রমল্লিকার উর্ধ্বধাবক

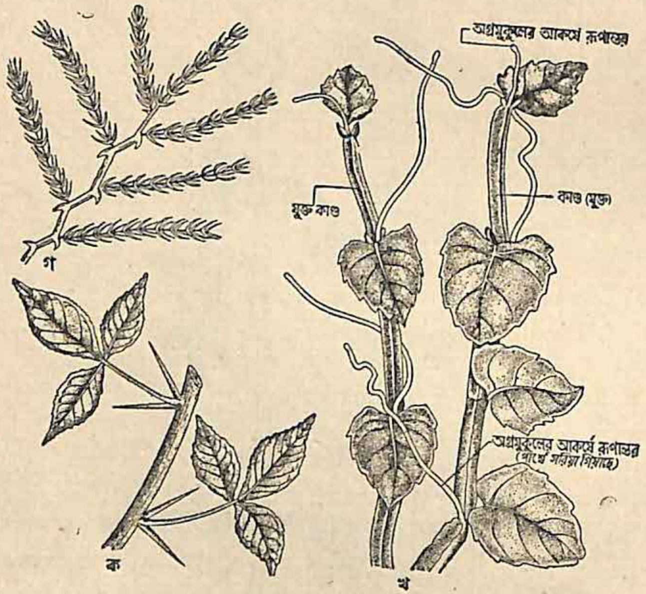
পর্যন্ত অগ্রসর হয়, এবং পরে বাঁকিয়া মাটি ভেদ করিয়া উপরের দিকে উঠে ও নূতন গাছ সৃষ্টি করে। চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদিতে এই প্রকার উর্ধ্বধাবক দেখা যায়।

৩। **বায়বীয় কাণ্ড** (Aerial stem) :—

ভিন্ন ভিন্ন কার্য সাধনের জন্য কাণ্ডের বায়বীয় অংশের কখনও কখনও এইরূপ পরিবর্তন হয় যে, তখন উহাকে আর কাণ্ড বলিয়া মনে হয় না। শাখা-কণ্টক, আকর্ষ ও পর্ণকাণ্ড হইতেছে এইপ্রকার পরিবর্তিত বায়বীয় কাণ্ড।

(১) **শাখাকণ্টক** (Thorn)

কাক্ষিক মুকুলগুলি অনেক সময় শাখা, পাতা বা ফুল উৎপন্ন না করিয়া কণ্টকে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এইপ্রকার কণ্টকগুলিকে শাখাকণ্টক বলে।



চিত্র—৩৬, কাণ্ডের বায়বীয় রূপান্তর—(ক) শাখাকণ্টক,
(খ) আকর্ষ ও (গ) একক পর্ণকাণ্ড

আত্মরক্ষাই হইতেছে এইগুলির প্রধান কার্য। দুরন্ত, বেল ইত্যাদিতে এই জাতীয় শাখাকণ্টক দেখা যায়।

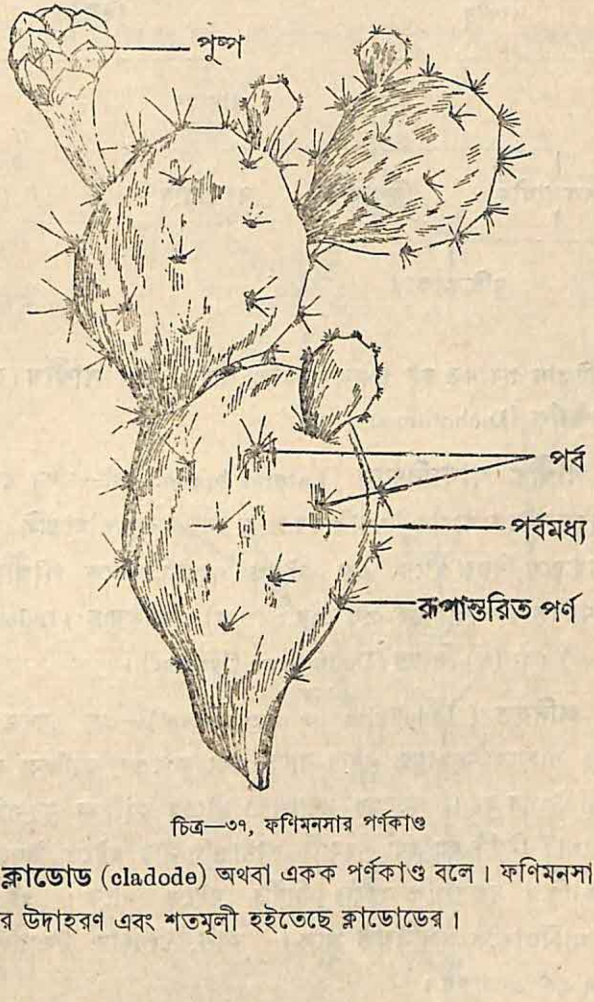
(২) **আকর্ষ** (Stem tendril)

দুর্বল কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুলগুলি অনেক সময় রূপান্তরিত হইয়া আকর্ষে পরিণত হয়। কোন শক্ত বস্তুকে বাহিয়া এই আকর্ষের সাহায্যে দুর্বল কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদ্গুলি উপরের দিকে উঠে। কুমড়া, আঙ্গুর, হাড়জোড়া প্রভৃতি উদ্ভিদে এই প্রকার আকর্ষ দেখা যায়।

(৩) **পর্ণকাণ্ড** (Phylloclade)

কতকগুলি ঊষর উদ্ভিদের পাতাগুলি কণ্টকে রূপান্তরিত হইয়া বাষ্পমোচন রোধ করে। এই অবস্থায় উদ্ভিদের কাণ্ডটি চ্যাপ্‌টা হইয়া পাতার আকার ধারণ

করে এবং ক্লোরোফিলের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করে। এই রূপান্তরিত কাণ্ডকে পর্ণকাণ্ড বলা হয় এবং পাতাগুলি কণ্টকে রূপান্তরিত হয় বলিয়া সেইগুলিকে **পর্ণকণ্টক** (spines) বলা হয়। পর্ণকাণ্ড একটি মাত্র পর্বমধ্যযুক্ত হইলে



চিত্র—৩৭, ফণিমনসার পর্ণকাণ্ড

তাহাকে **ক্লাডোড** (cladode) অথবা একক পর্ণকাণ্ড বলে। ফণিমনসা হইতেছে পর্ণকাণ্ডের উদাহরণ এবং শতমূলী হইতেছে ক্লাডোডের।

শাখাবিন্যাস (Branching) :—

কাণ্ডের কাক্ষিক বা শীর্ষ মুকুল হইতে কাণ্ডেরই মত যে অংশ উৎপন্ন হয় তাহাকে **শাখা** (Branch) বলে। যে পদ্ধতিতে এই শাখাগুলি কাণ্ডের গায়ে সজ্জিত থাকে তাহাকে **শাখাবিন্যাস** বলে।

নীচে বিভিন্ন প্রকারের শাখা বিন্যাসের একটি ছক দেওয়া হইল—

- শাখাবিন্যাস
  - পার্শ্বীয়
    - অনিয়ত
    - নিয়ত
      - একপার্শ্বীয়
        - শুণ্ডাকার
        - বৃশ্চিকাকার
      - দ্বিপার্শ্বীয়
      - বহুপার্শ্বীয়
  - দ্বিশীর্ষক
    - সাধারণ
    - সন্ধিপদ

শাখাবিন্যাস প্রধানত দুই প্রকারের হইয়া থাকে—(১) **পার্শ্বীয়** (Lateral) ও (২) **দ্বিশীর্ষক** (Dichotomous)।

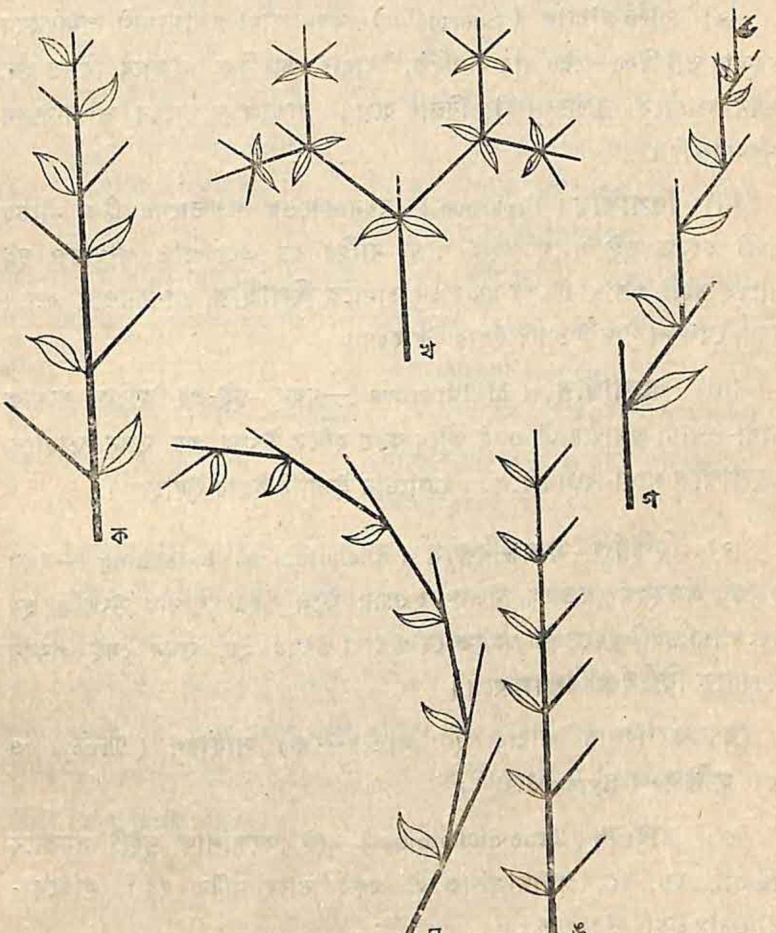
(১) **পার্শ্বীয় শাখাবিন্যাস** (Lateral branching)—যখন কেবলমাত্র কাক্ষিক মুকুল হইতে শাখার উৎপত্তি হয় তখন সেই সকল শাখাগুলি কেবলমাত্র কাণ্ডের পার্শ্বদেশে বিন্যস্ত থাকে এবং এইরূপ শাখাবিন্যাসকে **পার্শ্বীয়** বলে। পার্শ্বীয় শাখাবিন্যাস আবার দুই প্রকারের : (ক) **অনিয়ত** (Indefinite or Racemose) এবং (খ) **নিয়ত** (Definite or Cymose)।

(ক) **অনিয়ত** (Indefinite or Racemose)—এই ক্ষেত্রে কাণ্ডটি অগ্রমুকুলের সাহায্যে ক্রমাগত লম্বায় বাড়ে এবং কাণ্ডের কাক্ষিক মুকুলগুলি হইতে শাখা উৎপন্ন হয়। কাণ্ডের সর্বাপেক্ষা নীচের কাক্ষিক মুকুলটি হইতে সর্বপ্রথম শাখাটি নির্গত হয় এবং পরবর্তী শাখাগুলি নীচ হইতে উপরের দিকে পর পর কাক্ষিক মুকুলগুলি হইতে নির্গত হইতে থাকে। এই প্রকার পার্শ্বীয় শাখাবিন্যাসকে **অনিয়ত** বলে। ঝাউ, দেবদারু ইত্যাদি গাছের শাখাবিন্যাস এই প্রকারের।

(খ) **নিয়ত** (Definite or Cymose)—এই ক্ষেত্রে কাণ্ডের অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায় এবং সেই কারণে কাণ্ডটিও অনির্দিষ্ট কাল অবধি বাড়িতে পারে না। কাণ্ডের বৃদ্ধি রহিত হইয়া গেলে অগ্রভাগের ঠিক নীচের কাক্ষিক মুকুল হইতে এক বা একাধিক শাখা উৎপন্ন হয়। এই প্রকার

পার্শ্বীয় শাখাবিন্যাসকে **নিয়ত** বলে। নিয়ত শাখাবিন্যাস আবার তিন জাতীয়—

(২) **একপার্শ্বীয়** (Uniparous)—যখন কাণ্ডের একটিমাত্র পর্ব হইতে একটি মাত্র শাখা উৎপন্ন হয় এবং পরবর্তী শাখা-প্রশাখাগুলি ঐ একইভাবে উৎপন্ন



চিত্র—৩৮, বিভিন্ন প্রকার শাখাবিন্যাস—(ক) অনিয়ত বিন্যাস, (খ) দ্বি-পার্শ্বীয় নিয়ত বিন্যাস, (গ) বৃশ্চিকাকার বিন্যাস, (ঘ) শুণ্ডাকার বিন্যাস ও (ঙ) একপার্শ্বীয় সন্ধিপদ বিন্যাস

হয় তখন তাহাকে **একপার্শ্বীয়** শাখাবিন্যাস বলে। এই বিন্যাস আবার দুই প্রকারের—**শুণ্ডাকার** (Helicoid) ও **বৃশ্চিকাকার** (Scorpioid)।

(১) **শুণ্ডাকার** (Helicoid)—যদি শাখা ও প্রশাখাগুলি ক্রমান্বয়ে একই দিকে উৎপন্ন হইতে থাকে এবং তাহার ফলে শাখাবিন্যাসটিকে শুঁড়ের মত দেখায় তখন তাহাকে **শুণ্ডাকার** বিন্যাস বলে। হেমেলিয়া পেটেন্স নামক উদ্ভিদের শাখাবিন্যাসটি এই প্রকারের।

(২) **বৃশ্চিকাকার** (Scorpioid)—যখন শাখা-প্রশাখাগুলি পর্যায়ক্রমে একবার ডানদিক, পরের বার বামদিক, আবার ডানদিক এইভাবে বিন্যস্ত হয়, তখন তাহাকে **বৃশ্চিকাকার** বিন্যাস বলে। হাড়জোড়া গাছের শাখাবিন্যাস বৃশ্চিকাকার।

(ii) **দ্বিপার্শ্বীয়** (Biparous)—যখন কাণ্ডের অগ্রভাগের ঠিক নীচের পর্বটি হইতে দুই পার্শ্বে দুইটি শাখা বাহির হয় এবং প্রতি শাখারও দুই পার্শ্বেই দুইটি প্রশাখা উৎপন্ন হয় তখন তাহাকে **দ্বিপার্শ্বীয়** শাখাবিন্যাস বলে। টগর, বেলফুল গাছ ইত্যাদি ইহার উদাহরণ।

(iii) **বহুপার্শ্বীয়** (Multiparous)—যখন দুই-এর অধিক সংখ্যক শাখা-প্রশাখা ক্রমান্বয়ে ঐ একই ভাবে কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয় তখন তাহাকে **বহুপার্শ্বীয়** শাখা-বিন্যাস বলে। ক্রোটোন ইত্যাদি ইহার উদাহরণ।

(২) **দ্বিশীর্ষক শাখা-বিন্যাস** (Dichotomous branching)—যখন কাণ্ডের অগ্রমুকুল দুইভাগে বিভক্ত হওয়ার ফলে দুইটি শাখার উৎপত্তি হয় এবং শাখা দুইটি হইতেও একইভাবে প্রশাখা উৎপন্ন হয়, তখন সেই প্রকার বিন্যাসকে **দ্বিশীর্ষক বিন্যাস** বলে।

দ্বিশীর্ষক বিন্যাস আবার দুই জাতীয়—(ক) **সাধারণ** (True) ও (খ) **সন্ধিপদ** (Sympodial)।

(ক) **সাধারণ** (True dichotomy)—এই ক্ষেত্রে শাখা দুইটি সমভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং প্রশাখাগুলিও ঐ একই ভাবে বর্ধিত হয়। লাইকোপোডিয়াম ইহার উদাহরণ।

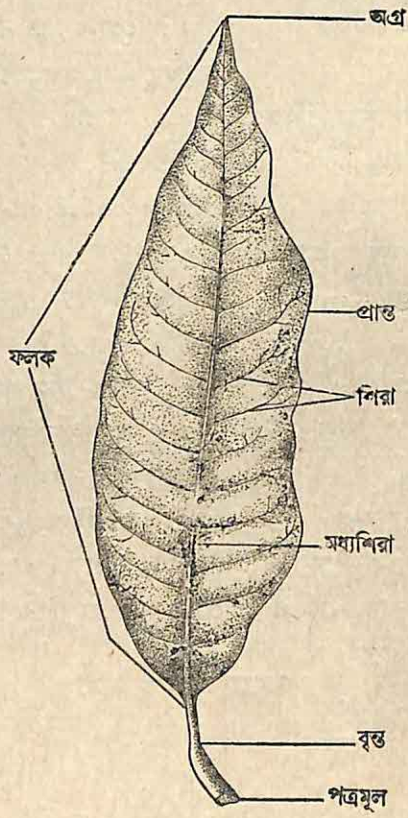
(র) **সন্ধিপদ** (Sympodial dichotomy)—এই ক্ষেত্রে দুইটি শাখার মধ্যে একটির বৃদ্ধি কম হয়। প্রশাখাগুলির মধ্যে ঐ একই অবস্থা দেখা যায়। অশোক গাছের কাণ্ডে এই প্রকার বিন্যাস দেখা যায়।

মূল ও কাণ্ডের পার্থক্য (Differences between Root and Stem)

মূল (Root)	কাণ্ড (Stem)
১। সাধারণতঃ আলো পছন্দ করে না এবং মাটির নীচে থাকে।	১। সাধারণতঃ আলো পছন্দ করে ও মাটির উপরেই থাকে।
২। সাধারণতঃ ভ্রূণমূল (Radicle) হইতেই ইহার উৎপত্তি।	২। সাধারণতঃ ভ্রূণমুকুল (Plumule) হইতে কাণ্ড উৎপন্ন হয়।
৩। কোন পর্ব বা পর্বমধ্য নাই।	৩। পর্ব এবং পর্বমধ্য আছে।
৪। মূলে পাতা বা ফুল জন্মায় না।	৪। ইহাতে পাতা ও ফুল জন্মায়।
৫। মূলাগ্রভাগে মূলত্র থাকে।	৫। কোন মূলত্র নাই তবে কাণ্ডের অগ্রভাগে থাকে অগ্রমুকুল।
৬। মূলের শাখা-প্রশাখা পরিধিস্তর হইতে জন্মায় (Endogenous in origin)।	৬। কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা বাহিরের দিকের কলা হইতে জন্মায় (Exogenous in origin)।
৭। মূলত্বকের কোষ প্রাচীরে কোন কিউটিকল থাকে না।	৭। কাণ্ডের বহিস্ত্বকের কোষগুলির বাহিরের দিকের প্রাচীরে সাধারণতঃ কিউটিকল থাকে।
৮। মূলরোম এক-কোষী।	৮। কাণ্ড-রোম বহুকোষী।
৯। মূলের শিরাত্মক কলাসমষ্টির অরীয় বিন্যাস দেখা যায়।	৯। কাণ্ডের শিরাত্মক কলাসমষ্টির অরীয় বিন্যাস কখনও দেখা যায় না।
১০। প্রাথমিক শিরাত্মক কোষ (Protoxylem) বাহিরের দিকে এবং অধিশিরাত্মক কোষ (Metaxylem) ভিতরের দিকে বিন্যস্ত থাকে।	১০। প্রাথমিক শিরাত্মক কোষ ভিতরের দিকে এবং অধিশিরাত্মক কোষ বাহিরের দিকে বিন্যস্ত থাকে।

পাতা ও তাহার বিভিন্ন অংশ (Leaf and its different parts)

সৃষ্টির আদিতে যে সকল উন্নত ধরনের উদ্ভিদ্ পৃথিবীতে দেখা যাইত, বিজ্ঞানীদের মতে, তাহাদের প্রায় প্রতিটি কোষেই (বিশেষতঃ যেই কোষগুলি



চিত্র—৩৯, একটি আদর্শ পত্রের বিভিন্ন অংশ

সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসিত) সবুজ কণিকা থাকিত। ক্রমবিবর্তনের ফলে, পরবর্তী কালের উদ্ভিদে একটি বিশেষ অঙ্গ দেখা দিল যে অঙ্গটির মধ্যেই

কেবলমাত্র সবুজ কণিকাবিশিষ্ট কোষগুলি সীমাবদ্ধ রহিল এবং এই বিশেষ অঙ্গটির প্রধান কার্য হইল সালোকসংশ্লেষ। এই অঙ্গটিই হইল **পাতা** বা **পর্ণ** বা **পত্র** (অবশ্য সাধারণতঃ উদ্ভিদ্-কাণ্ডেও অল্প সংখ্যক সবুজ কণিকাবিশিষ্ট কোষ থাকে)।

কাণ্ডের পর্ব হইতে যে চ্যাপ্‌টা, পাতলা, প্রসারিত ও সাধারণতঃ হরিৎবর্ণের অঙ্গটি উৎপন্ন হয় তাহাই হইল এই পাতা। পাতাগুলি একটি নির্দিষ্ট আকার-প্রাপ্ত হইবার পরে আর বাড়ে না।

একটি আদর্শ পাতার তিনটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—(ক) **পত্রমূল** (Leaf base or Hypopodium), (খ) **পর্ণবৃন্ত** (Petiole or Leaf stalk or Mesopodium) ও (গ) **ফলক** (Lamina or Leaf blade or Epipodium).

(ক) **পত্রমূল** (Leaf base or Hypopodium)—কাণ্ডের পর্বের সহিত যে অংশটির দ্বারা পাতা সংযুক্ত থাকে সেই অংশটিকে পত্রমূল বলে।

কোন কোন পত্রমূলের পার্শ্বীয় অঙ্গ হিসাবে **উপপত্র** (stipule) থাকিতে পারে। যে সকল পত্রমূলের উপপত্র থাকে সেই পত্রগুলিকে **সোপপত্রীক** (stipulate) পত্র এবং যাহাদের থাকে না, তাহদের **অনুপপত্রীক** (estipulate) পত্র বলে।

(খ) **পর্ণবৃন্ত** (Petiole or Leaf stalk or Mesopodium)—পত্রমূল হইতে ফলক পর্যন্ত যে লম্বা, গোলাকার ডাঁটার মত অংশটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই বৃন্ত বলে। সকল পত্রে এই বৃন্ত না-ও থাকিতে পারে। বৃন্ত থাকিলে **সবৃন্তক** (petiolate) এবং না থাকিলে **অবৃন্তক** (sessile) পত্র বলা হয়।

(গ) **ফলক** (Lamina or Leaf blade or Epipodium)—বৃন্তের উপরে যে চ্যাপ্‌টা ও প্রসারিত অংশটি থাকে তাহাকেই ফলক বলে। ফলকের শীর্ষদেশকে **পত্রাগ্র** (Leaf apex) এবং দুই পাশের কিনারাকে **পত্র-প্রান্ত** (Leaf margin) বলে। ফলকে **শিরা** (veins) ও **উপশিরা** (veinlets) দেখা যায়। ঠিক মধ্যস্থলে যে মোটা শিরাটি ফলকের নিম্নদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে উহাকে **মধ্যশিরা** (mid rib) বলে।

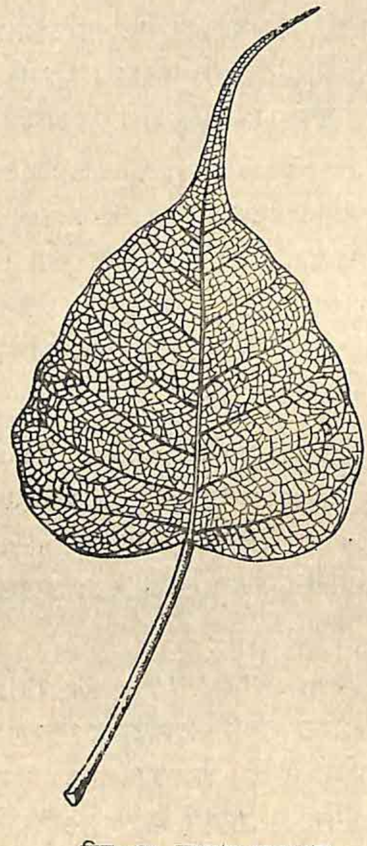
ক্লোরোফিল থাকে বলিয়া ফলকের বর্ণ সাধারণতঃ হরিৎ হইয়া থাকে এবং এই ফলকই খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে।

পূর্ব পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তিনটি অংশের যে কোন একটি না থাকিলে পত্রটিকে **অপূর্ণ পত্র** (Incomplete leaf) বলা হয়।

একক ও যৌগিক পত্র

(Simple and Compound leaves)

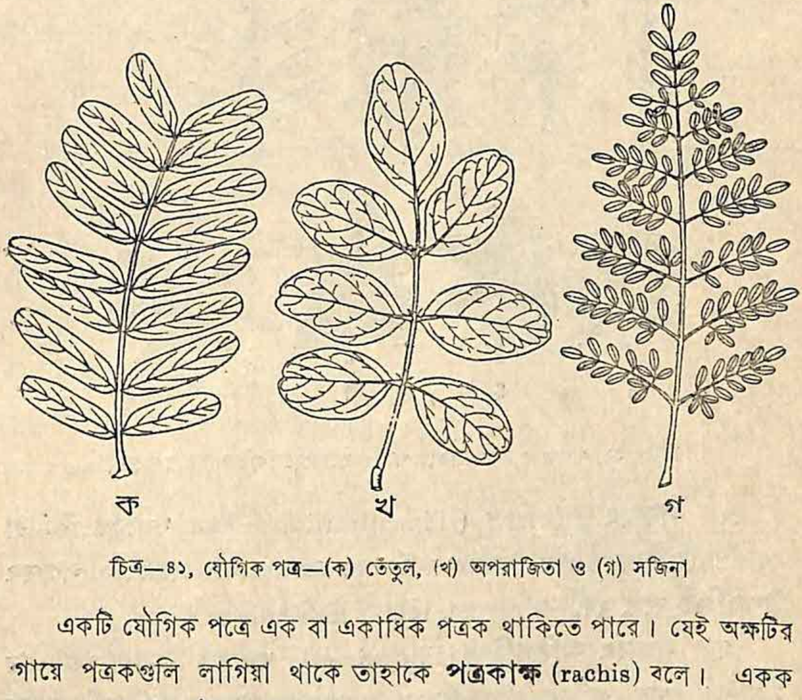
পাতা প্রধানতঃ দুই প্রকারের হইয়া থাকে—(ক) **একক পত্র** (Simple leaf) ও (খ) **যৌগিক পত্র** (Compound leaf)।



চিত্র—৪০, অশ্বত্থের একক পত্র

(ক) **একক পত্র** (Simple leaf)—যখন একটি মাত্র ফলক দ্বারা একটি পাতা গঠিত হয় তখন তাহাকে একক পত্র বলে, যথা—আম, জবা, বট, অশ্বত্থ, আকন্দ ইত্যাদি।

(খ) **যৌগিক পত্র** (Compound leaf)—কোন কোন ক্ষেত্রে পাতার ফলকটি খণ্ডিত হইয়া পাতার মধ্যশিরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং কতকগুলি ছোট ছোট পত্রের মত খণ্ড অংশে বিভক্ত হয়। এই ছোট ছোট পত্রগুলিকে **পত্রক** বা **অনুফলক** (Leaflet) বলে এবং সম্পূর্ণ পত্রটিকে তখন **যৌগিক পত্র** বলা হয়।



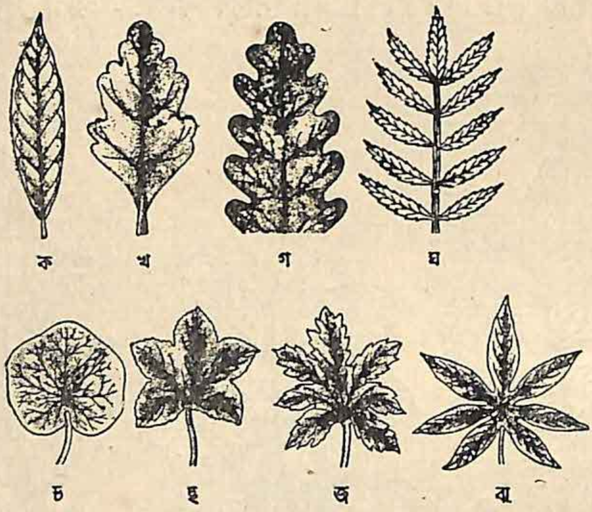
চিত্র—৪১, যৌগিক পত্র—(ক) তেঁতুল, (খ) অপরাজিতা ও (গ) সজিনা

একটি যৌগিক পত্রে এক বা একাধিক পত্রক থাকিতে পারে। যেই অক্ষটির গায়ে পত্রকগুলি লাগিয়া থাকে তাহাকে **পত্রকাক্ষ** (rachis) বলে। একক পত্রের মধ্যশিরাটিই পত্রকাক্ষে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। গোলাপ, তেঁতুল, অপরাজিতা, সজিনা, শিমুল ইত্যাদি হইতেছে যৌগিক পত্রের উদাহরণ।

একক পত্রের খণ্ডন (Segmentation of the simple leaf)

একক পত্রের ফলকে যখন একটি মাত্র মধ্যশিরা থাকে এবং বৃন্তটি ফলকের নিম্নদেশে সংযুক্ত থাকে তখন সেই প্রকার একক পত্রকে **পক্ষলপত্র** বলে। পক্ষল পত্রের কিনারা বিভিন্ন প্রকারে খণ্ডিত হইতে পারে এবং এই খণ্ডনের গভীরতা অনুযায়ী ইহাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—

(ক) **পক্ষবৎ খণ্ডিত** (Pinnatifid)—কোন কোন পক্ষল পত্রের কিনারা মধ্য-শিরার দিকে কর্তিত থাকে এবং ইহা অর্ধেক বা অর্ধেকের কম হইলে তাহাকে **পক্ষবৎ খণ্ডিত** পত্র বলে ; যথা—চন্দ্রমল্লিকা।



চিত্র—৪২, পক্ষল ও করতলাকার পত্র ও তাহাদের বিভিন্ন প্রকার খণ্ডন

(খ) **পক্ষবৎ উপখণ্ডিত** (Pinnatipartite)—যখন ফলকের কিনারা মধ্য-শিরার দিকে অর্ধেকের অধিক কর্তিত হয় তখন সেই পত্রটিকে **পক্ষবৎ উপখণ্ডিত** বলে, যথা—মূলা পাতা, শিয়ালকাঁটা ইত্যাদি।

(গ) **পক্ষবৎ অতিখণ্ডিত** (Pinnatisect)—ফলকের কিনারা যখন প্রায় মধ্যশিরা পর্যন্ত কর্তিত হইয়া থাকে তখন তাহাকে **পক্ষবৎ অতিখণ্ডিত পত্র** বলে, যথা—গাঁদা ইত্যাদি।

একক পত্রের ফলকে যখন একাধিক প্রধান শিরা থাকে এবং ফলকটিকে করতলের মত দেখায় তখন তাহাকে **করতলাকার পত্র** বলে। করতলাকার পত্রের কিনারাও বিভিন্ন ভাবে খণ্ডিত হইতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ইহারাও তিন প্রকারের—

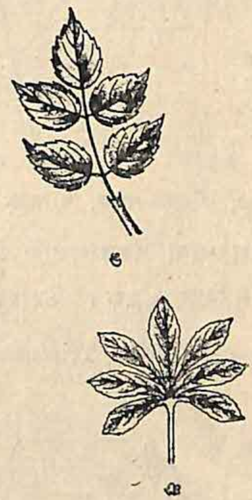
(ঘ) **করতলাকার খণ্ডিত** (Palmatifid)—কোন কোন করতলাকার পত্রের কিনারা পর্ণবৃন্তের দিকে অর্ধেক বা অর্ধেকের কম কর্তিত হইলে তাহাকে **করতলাকার খণ্ডিত** পত্র বলে, যথা—কুমড়া।

(ঙ) **করতলাকার উপখণ্ডিত** (Palmatipartite)—যখন ফলকের কিনারা পর্ণবৃন্তের দিকে অর্ধেকের অধিক কর্তিত হয় তখন সেই পত্রটিকে **করতলাকার উপখণ্ডিত পত্র** বলে, যথা—করলা।

(চ) **করতলাকার অতিখণ্ডিত** (Palmatisect)—ফলকের কিনারা যখন প্রায় পর্ণবৃন্ত পর্যন্ত কর্তিত হইয়া থাকে তখন তাহাকে **করতলাকার অতিখণ্ডিত পত্র** বলে, যথা—শিমূল, সপ্তপর্ণ ইত্যাদি।

যৌগিক পত্রের প্রকারভেদ (Types of compound leaves)

যখন পক্ষল পত্রের কিনারা কর্তিত হইয়া মধ্যশিরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তখন তাহাকে **পক্ষল যৌগিক পত্র** (Pinnately compound leaf) বলে। আবার যখন করতলাকার পত্রের কিনারা কর্তিত হইয়া পর্ণবৃন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তখন তাহাকে **করতলাকার যৌগিক পত্র** (Palmately compound leaf) বলে।



চিত্র—৪৩, (ঙ) পক্ষল যৌগিক পত্র
(ঞ) করতলাকার যৌগিক পত্র

১। **পক্ষল যৌগিক পত্র** (Pinnately compound leaf) :—

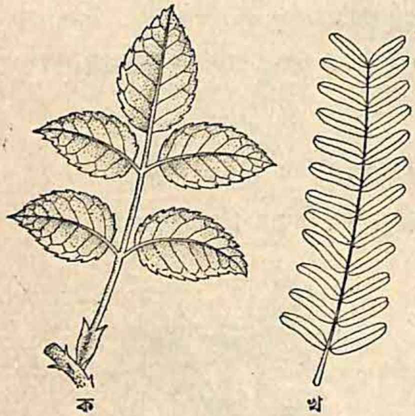
পত্রক বা অনুফলকের বিন্যাস অনুযায়ী পক্ষল যৌগিক পত্রকে নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলিতে ভাগ করা হইয়াছে :—

(ক) **একপক্ষল** (Unipinnate)—এই প্রকার পক্ষল যৌগিক পত্রের ফলকটিকে মাত্র একবার কর্তিত হইতে দেখা যায়, ফলে পত্রকগুলি একটিমাত্র পত্রকাক্ষের দুইপাশে বিন্যস্ত থাকে, যথা—অপরাজিতা, কালকাসুন্দি, গোলাপ ইত্যাদি।

একপক্ষল যৌগিক পত্র আবার দুই প্রকারের হইয়া থাকে—

(i) **অচূড় পক্ষল** (Paripinnate) ও (ii) **সচূড় পক্ষল** (Imparipinnate)।

(i) **অচূড় পক্ষল** (Paripinnate)—এই প্রকার একপক্ষল যৌগিক পত্রের পত্রকাক্ষটির শীর্ষদেশে দুইটি পত্রক থাকে, অর্থাৎ যৌগিক পত্রটি জোড় সংখ্যক পত্রক লইয়া গঠিত। উদাহরণ—কালকাসুন্দি, তেঁতুল ইত্যাদি।

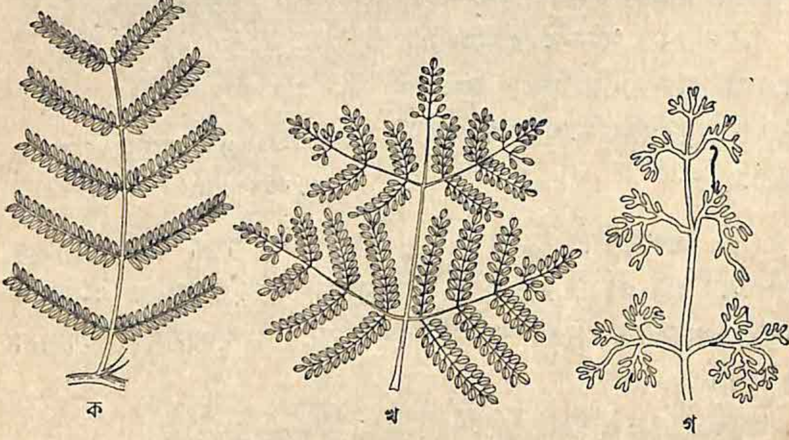


চিত্র—৪৪, (ক) সচূড় পক্ষল, (খ) অচূড় পক্ষল

(ii) **সচূড় পক্ষল** (Imparipinnate)—এই প্রকার একপক্ষল যৌগিক পত্রের পত্রকাক্ষটির শীর্ষদেশে একটি মাত্র পত্রক এমনভাবে থাকে যে ঐ যৌগিক পত্রে বিজোড় সংখ্যক পত্রক থাকে। উদাহরণ—অপরাজিতা, গোলাপ ইত্যাদি।

(খ) **দ্বিপক্ষল** (Bipinnate)—এই জাতীয় পক্ষল যৌগিক পত্রের ফলকটিকে দুইবার কর্তিত হইতে দেখা যায়, ফলে প্রধান পত্রকাক্ষটির দুই পাশে শাখা পত্রকাক্ষগুলি উৎপন্ন হয়। এই শাখা পত্রকাক্ষগুলির গায়ে পত্রকগুলি বিন্যস্ত থাকে। উদাহরণ—লজ্জাবতী, বাব্‌লা ইত্যাদি।

(গ) **ত্রিপক্ষল** (Tripinnate)—যৌগিক পত্রের ফলকটিকে তিনবার



চিত্র—৪৫, (ক) দ্বিপক্ষল, (খ) ত্রিপক্ষল (গ) বহুপক্ষল

কর্তিত হইতে দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে প্রধান পত্রকাক্ষটির দুইপাশে কতকগুলি

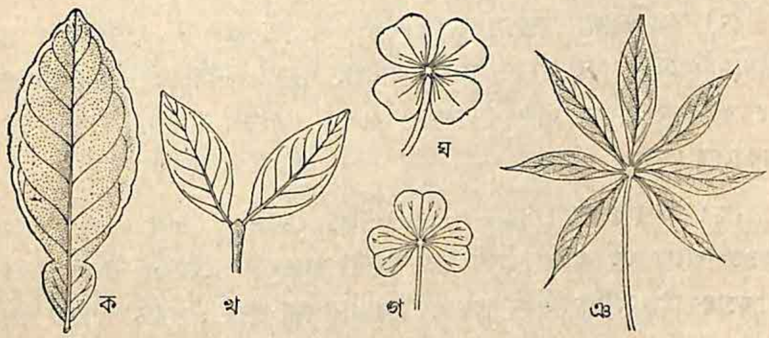
শাখা পত্রকাক্ষ উৎপন্ন হয়, এই শাখা পত্রকাক্ষগুলি হইতে আবার প্রশাখা অক্ষ উৎপন্ন হয়। পত্রকগুলি এই প্রশাখা পত্রকাক্ষের দুই পাশে বিন্যস্ত থাকে। উদাহরণ—সজিনা ইত্যাদি।

(খ) **বহুপক্ষল** (Decompound)—তিনেরও অধিকবার যখন যৌগিক পত্রের ফলকটি কর্তিত হয় তখন তাহাকে বহুপক্ষল যৌগিক পত্র বলে। উদাহরণ—ধনে ইত্যাদি।

২। **করতলাকার যৌগিক পত্র** (Palmately compound leaf)—

যখন করতলাকার পত্রের কিনারা একেবারে পর্ণবৃন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তখন সেই পত্রটিকে করতলাকার যৌগিক পত্র বলা হয়। এই প্রকার পত্র-কে নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলিতে ভাগ করা হইয়াছে—

(ক) **একফলক** (Unifoliate)—যখন বৃন্তের শীর্ষে যৌগিক পত্রের একটি মাত্র পত্রক থাকে তখন তাহাকে একফলক করতলাকার যৌগিক পত্র বলে। উদাহরণ—কমলা ও বিভিন্ন জাতীয় লেবু।



ক—এক ফলক, খ—দ্বিফলক, গ—ত্রিফলক, ঘ—চতুর্ফলক, ঙ—অঙ্গুলাকার

(খ) **দ্বিফলক** (Bifoliate)—যখন করতলাকার যৌগিকপত্রের বৃন্তশীর্ষে দুইটি মাত্র পত্রক থাকে তখন তাহাকে দ্বিফলক করতলাকার যৌগিক পত্র বলে। উদাহরণ—হিঙ্গল ইত্যাদি।

(গ) **ত্রিফলক** (Trifoliate)—দ্বিফলকের মতই তবে দুইটির পরিবর্তে তিনটি পত্রক পর্ণবৃন্তের শীর্ষে সংযুক্ত থাকে। উদাহরণ—আমরুল, বেল ইত্যাদি।

(ঘ) **চতুর্ফলক** (Quadrifoliate)—এই প্রকার করতলাকার যৌগিক পত্রের বৃন্ত শীর্ষে চারিটি পত্রক থাকে। উদাহরণ—সুষনি ইত্যাদি।

(ঙ) **অঙ্গুলাকার** (Digitate)—বৃন্তশীর্ষের একটি বিন্দুতে যখন চারিটিরও অধিক পত্রক থাকে তখন তাহাকে অঙ্গুলাকার যৌগিক পত্র বলে। উদাহরণ—সপ্তপর্ণ, শিমুল ইত্যাদি।

পত্রবিন্যাস (Phyllotaxy)—

প্রত্যেক উদ্ভিদের কাণ্ড বা শাখার উপর পাতাগুলি যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যস্ত থাকে তাহাকেই **পত্রবিন্যাস** বলে। এই বিন্যাস দ্বারা সকল পত্রই তাহাদের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য, যথেষ্ট পরিমাণে বাতাস ও সূর্য-কিরণ পাইয়া থাকে।

পত্রবিন্যাস তিন প্রকারের হয় :—

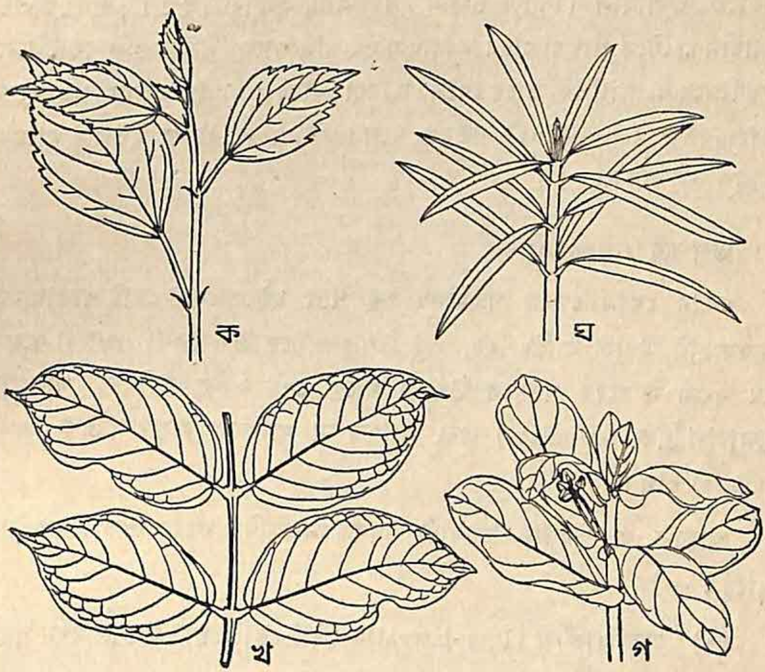
(১) **একান্তর বিন্যাস** (Alternate phyllotaxy)—যখন কাণ্ড বা শাখার প্রত্যেক পর্ব হইতে কেবলমাত্র একটি করিয়া পত্র উৎপন্ন হয় তখন তাহাকে একান্তর বিন্যাস বলে—জবা, নিম, সিম, আম, জাম ইত্যাদি।

(২) **অভিমুখ বিন্যাস** (Opposite phyllotaxy)—যখন কাণ্ড বা শাখার প্রত্যেক পর্ব হইতে দুইটি করিয়া, পরস্পর বিপরীতমুখী পত্র উৎপন্ন হয় তখন তাহাকে অভিমুখ বিন্যাস বলে। এইরূপ বিন্যাস আবার দুই প্রকারের :—

(ক) **উপরিপন্ন** (Superposed)—এই ক্ষেত্রে পত্রগুলি এমন ভাবে বিন্যস্ত থাকে যে প্রতি পর্বের পত্র দুইটি তাহার উপরের ও নীচের পর্বের পত্রদ্বয়ের ঠিক নীচে ও উপরে পর পর সাজানো থাকে ; অর্থাৎ উপরের পত্র দুইটি নীচের জোড়াকে ঢাকিয়া রাখে। উদাহরণ—পেয়ারা, মালতীলতা, ইত্যাদি।

(খ) **তির্যকৃপন্ন** (Decussate)—এই ক্ষেত্রে পত্রগুলির বিন্যাস এমন ভাবে হয় যাহাতে একটি পর্বের পত্র দুইটি তাহার উপরের ও নীচের পর্বের পত্রগুলির সহিত একটি সমকোণ সৃষ্টি করিয়া অবস্থান করে অর্থাৎ প্রথম পর্বের পত্রদ্বয় তৃতীয় পর্বের পত্রদ্বয়ের সহিত সমান্তরাল এবং দ্বিতীয় পর্বের পত্র দুইটি চতুর্থ পর্বের পত্রদ্বয়ের সহিত সমান্তরাল। এইভাবে সমস্ত জোড় সংখ্যক পর্বগুলির

পত্রগুলি বিজোড় সংখ্যক পর্বের পত্রগুলির সহিত সমকোণ সৃষ্টি করিয়া বিন্যস্ত থাকে। উদাহরণ—আকন্দ, নয়নতারা, তুলসী ইত্যাদি।



চিত্র—৪৭, পত্রবিন্যাস—(ক) একান্তর, (খ) অভিমুখ বিন্যাস—উপরিপন্ন, (গ) অভিমুখ বিন্যাস—তির্যক্‌পন্ন, (ঘ) আবর্ত

(৩) **আবর্ত** (wborled)—যখন কাণ্ডের বা শাখার প্রতিটি পর্ব হইতে দুইটির অধিক পত্র উৎপন্ন-হয়, তখন তাহাকে আবর্ত বিন্যাস বলে। উদাহরণ—করবী, কল্কে ইত্যাদি।

পত্রবিন্যাসের একটি ছক নীচে দেওয়া হইল—

- পত্রবিন্যাস
  - একান্তর বিন্যাস
  - অভিমুখ বিন্যাস
    - উপরিপন্ন
    - তির্যক্‌পন্ন
  - আবর্ত বিন্যাস

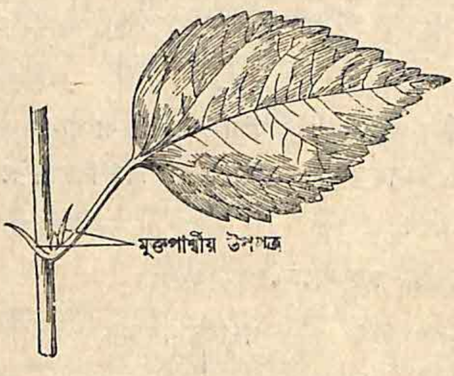
পত্রমূল (Leaf base or Hypopodium)—অতি ক্ষুদ্রাকার এই অংশটির দ্বারা পর্বের সহিত পত্রটি সংযুক্ত থাকে। এই পত্রমূল যখন স্ফীত হয় তখন তাহাকে **উপাধান** (Pulvinus) বলে। আম, লজ্জাবতী ইত্যাদি গাছের এই উপাধান দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কতকগুলি গাছের পত্রমূলগুলি পর্বগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে বেষ্টন করিয়া থাকে। এই প্রকার পত্রমূলকে **কাণ্ডবেষ্টক** (sheathing) পত্রমূল বলে। ঘাস, নারিকেল ইত্যাদি গাছের পত্রমূল এই প্রকারের।

উপপত্র (Stipules)—

কোন কোন ক্ষেত্রে পত্রমূলের দুই পাশ হইতে ছোট ছোট পাতার মত কতকগুলি উপাঙ্গ বাহির হয়, এই উপাঙ্গগুলিকে **উপপত্র** (stipules) বলে। যে সকল উদ্ভিদের পত্রমূলে উপপত্র থাকে সেই সকল উদ্ভিদের পাতাকে **সোপপত্রিক** (stipulate) এবং উপপত্র না থাকিলে **অনুপপত্রিক** (estipulate) বলে।

আকৃতি ও অবস্থান অনুযায়ী উপপত্র নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হইতে পারে :—

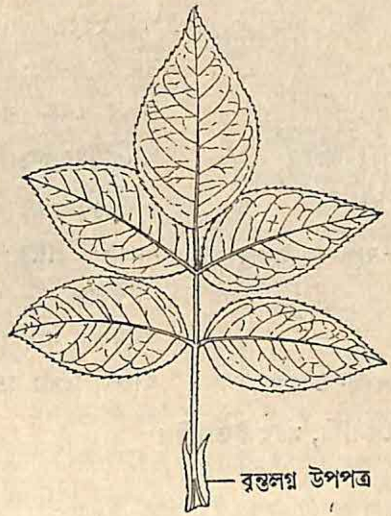
(১) **মুক্তপার্শ্বীয়** (Free-lateral)—দুইটি ছোট ছোট উপপত্র যখন পত্র-



চিত্র—৪৮, মুক্তপার্শ্বীয় উপপত্র

মূলের দুই পাশে পরস্পর মুক্ত অবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে মুক্তপার্শ্বীয় উপপত্র বলে, যথা—জবা, ঢেঁড়স ইত্যাদি।

(২) **বৃন্তলগ্ন** (Adnate)—এই ক্ষেত্রেও দুইটি উপপত্র পত্রমূলের দুইপাশে উৎপন্ন হয়, তবে উপপত্র দুইটির নীচের দিক বৃন্তের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং উপর দিকে বৃন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হয় ; যথা—গোলাপ ইত্যাদি।



চিত্র—৪৯, বৃন্তলগ্ন উপপত্র

(৩) **বৃন্তমধ্যক** (Interpetiolar)—অভিমুখ পত্রদ্বয়ের পত্রমূলের দুই পাশ হইতে দুইটি করিয়া উপপত্র উৎপন্ন হয়, তবে একটি পত্রের উপপত্র দুইটি, অপর পত্রটির উপপত্র দুইটির সহিত সংযুক্ত হওয়ায় দুইটি বৃন্তের মধ্যস্থলে একটি করিয়া দুইপাশে দুইটি উপপত্র দেখা যায় ; যথা—রঙ্গন, কদম ইত্যাদি।

(৪) **কাক্ষিক** (Intrapetiolar)—পত্রমূলের দুই পাশ হইতে দুইটি উপপত্র উৎপন্ন হয় এবং পরস্পর সংযুক্ত হইয়া পত্রের কক্ষে অবস্থান করে ; যথা—গন্ধরাজ।



চিত্র—৫০, কাক্ষিক উপপত্র

(৫) **কাণ্ডবেষ্টক** (Ochreate)—এই ক্ষেত্রে উপপত্র দুইটি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় একটি ফাঁপা নলের সৃষ্টি হয়। এই ফাঁপা নলটি পর্ব হইতে উপরের দিকের পর্ব-মধ্যটির নীচের কিছুটা অংশ সম্পূর্ণ ভাবে বেষ্টন করিয়া রাখে, যথা—পাণিমরিচ ইত্যাদি।



চিত্র—৫১, কাণ্ডবেষ্টক উপপত্র

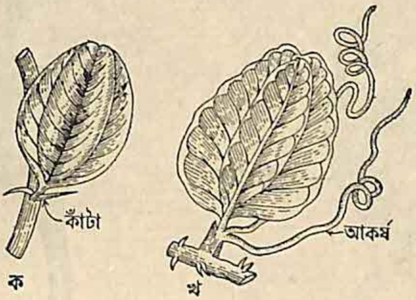
(৬) **ফলকাকার** (Foliaceous)—উপপত্র দুইটি যখন বৃহৎ আকারের হয় এবং দেখিতে অনেকটা সাধারণ পত্রের মতো হইয়া থাকে তখন তাহাকে ফলকাকার উপপত্র বলে, যথা—খেসারি, মটর ইত্যাদি।



চিত্র—৫২, (ক) ফলকাকার উপপত্র (খ) শল্কপত্রাকার উপপত্র

(৭) **শল্কপত্রাকার** (Bud Scales)—কাক্ষিক বা শীর্ষমুকুলকে দুইটি শল্ক-পত্রের মতো উপপত্র যখন আবৃত করিয়া রাখে তখন সেই প্রকার উপপত্রকে শল্কপত্রাকার বা আঁইশআকার উপপত্র বলে, যথা—বট, রাবার ইত্যাদি।

উপপত্রের রূপান্তর (Modification of stipules)—অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কার্যসাধনের জন্য উপপত্রের নানা প্রকার রূপান্তর হইয়া থাকে। বাবলা, কুল ইত্যাদি গাছের কাঁটাগুলি রূপান্তরিত উপপত্র মাত্র। এই



চিত্র—৫৩, উপপত্রের রূপান্তর—(ক) কণ্টক, (খ) আকর্ষ

কাঁটাগুলি আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। আবার কুমারিকার পত্রমূলের দুই পাশে যে দুইটি আকর্ষ দেখা যায় তাহাও এই রূপান্তরিত উপপত্র। অন্য কোন অবলম্বনকে বাহিয়া আরোহণ করিতে এই আকর্ষ সাহায্য করে।

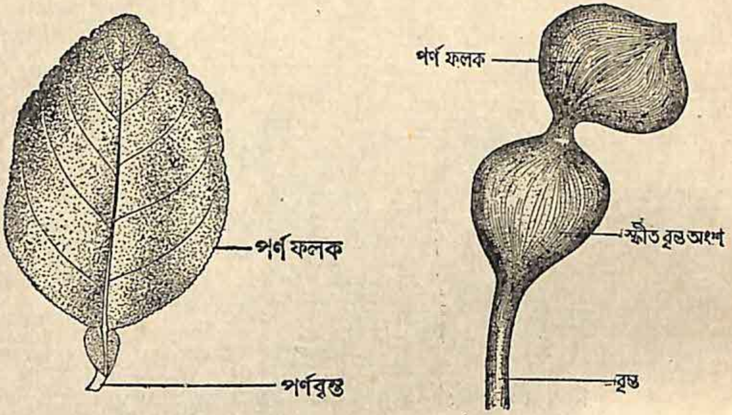
পর্ণবৃন্ত (Petiole or Leaf stalk or Mesopodium)—

ইহা দেখিতে একটি লম্বা, গোলাকার ডাঁটার মতো এবং বৃন্তটি পত্রমূল হইতে ফলক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সকল পত্রেই এই পর্ণবৃন্ত থাকে না। যে সমস্ত পত্রে পর্ণবৃন্ত থাকে সেই সকল পত্রকে **সবৃন্তক পত্র** (Petiolate leaves) এবং যাহাদের থাকে না সেই সকল পত্রকে **অবৃন্তক পত্র** (Sessile leaves) বলে। আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদির পত্র সবৃন্তক এবং শিয়ালকাঁটা, আকন্দ ইত্যাদির পত্র অবৃন্তক।

বৃন্তের রূপান্তর (Modification of petiole)—

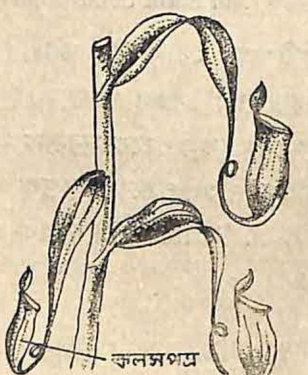
(১) **পক্ষল বৃন্ত** (Winged petiole)—পর্ণবৃন্তটি চ্যাপ্‌টা হইয়া পক্ষের আকার ধারণ করিলে তাহাকে পক্ষল বৃন্ত বলে। লেবু ইত্যাদি গাছের পর্ণবৃন্ত এই প্রকার।

(২) **স্ফীত বৃন্ত** (Swollen petiole)—কতকগুলি জলজ উদ্ভিদের পর্ণবৃন্তের নিম্নাংগ স্ফীত হইয়া বেলুনের আকার ধারণ করে। কচুরিপানার বৃন্তটি এই জাতীয়।



চিত্র—৫৪, (ক) পক্ষলবৃন্ত (খ) স্ফীতবৃন্ত

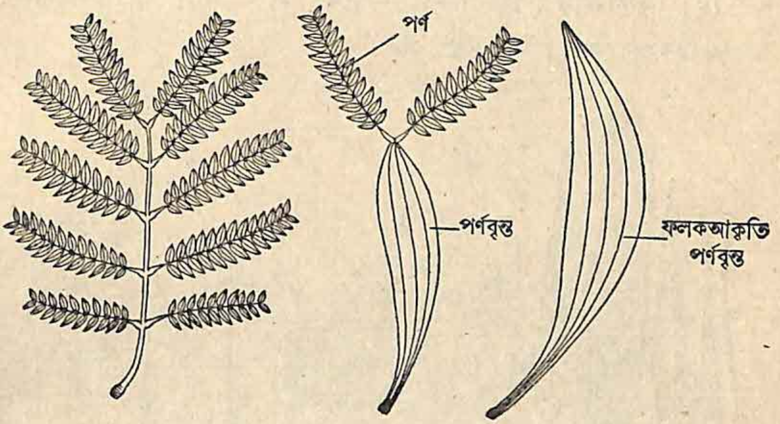
(৩) **আকর্ষীভূত বৃন্ত** (Tendrillar petiole)—কয়েকটি গাছের পর্ণবৃন্তগুলি অত্যন্ত লম্বা হয় এবং আরোহণ করিবার জন্য কোন অবলম্বনকে জড়াইয়া থাকে। ছাগলবটীর ও কলস পত্রের পর্ণবৃন্তটি এইরূপ।



চিত্র—৫৫, আকর্ষীভূত বৃন্ত.

(৪) **বৃন্তপর্ণ** (Phyllode)—বৃন্তপর্ণের পর্ণবৃন্তটি চ্যাপ্‌টা হইয়া ফলকের আকার ধারণ করে এবং ফলকটি শৈশবেই ঝরিয়া পড়াতে এই ফলকাকার

পর্ণবৃন্তটি ফলকের মতই কার্য করে। আকাশমণি গাছের পর্ণবৃন্তটি একটি বৃন্তপর্ণ।



চিত্র—৫৬, বৃন্তপর্ণ

১। **ফলকের আকার** (Shape of Lamina)—

একক পত্রের ফলকের আকার নানা প্রকারের হইতে পারে, ইহাদের কতকগুলির উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) **সূচাকার** (Acicular)—সূচের মতো সরু ফলকগুলিকে সূচাকার ফলক বলে, যথা—পাইনের পাতা।

(খ) **রেখাকার** (Linear)—ফলকগুলি সরু ও লম্বা হইয়া থাকে, যথা—ধান, দূর্বা, রজনীগন্ধা ইত্যাদি।

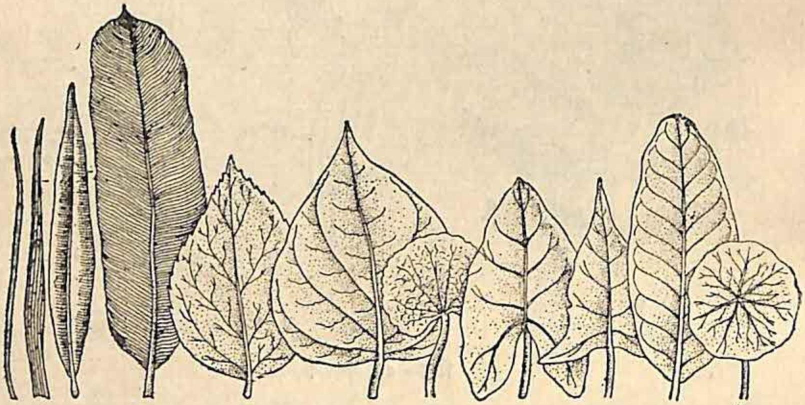
(গ) **বল্লমাকার** (Lanceolate)—বল্লমের ফলার মতো ফলকের মধ্যভাগ চওড়া এবং অগ্র ও নিম্নভাগ সরু লইয়া থাকে, যথা—আম, বাঁশ ইত্যাদি।

(ঘ) **আয়তাকার** (Oblong)—ফলকটি দেখিতে অনেকটা আয়তক্ষেত্রের মতো এবং ইহার প্রান্ত দুইটি গোলাকার হইয়া থাকে ; যথা—কলাপাতা, রবার পাতা ইত্যাদি।

(ঙ) **ডিম্বাকার** (Ovate)—ফলকটি ডিমের মতো দেখিতে হয় এবং ইহার নিম্নাংশ চওড়া ও অগ্রভাগ সরু হইয়া থাকে ; যথা—জবা, বট ইত্যাদি।

(চ) **তাম্বুলাকার** (Cordate)—ফলকটি দেখিতে পান পাতার মতো যথা—পান, গুলঞ্চ ইত্যাদি।

(ছ) **বৃক্কাকার** (Reniform)—বৃক্কের মতো আকারের ফলকগুলিকে বৃক্কাকার ফলক বলে ; যথা—থান্‌কুনি।



চিত্র—৫৭, বিভিন্ন প্রকার ফলকের আকার

(জ) ***মানকচুপত্রাকার** (Sagittate)—তীরের ফলার মত পাতার ফলককে মানকচু পত্রাকার ফলক বলে ; যথা—কচু, মানকচু ইত্যাদি।

(ঝ) **কলমীপত্রাকার** (Hastate)—এই প্রকার ফলকটি দেখিতে মানকচু-পত্রের মতো, তবে ফলকের নিম্নাংশ দুই পাশে বিস্তৃত থাকে ; যথা—কলমী শাক, ঘেঁটু, কচু ইত্যাদি।

(ঞ) **উপবৃত্তাকার** (Elliptical)—উপবৃত্তের মতো ফলকের আকার হইলে তাহাকে উপবৃত্তাকার পত্র বলে ; যথা—নয়নতারা, পেয়ারা ইত্যাদি।

(ট) **মণ্ডলাকার** (Orbicular)—এইপ্রকার পত্রের ফলকটি গোলাকার হইয়া থাকে ; যথা—পদ্ম ইত্যাদি।

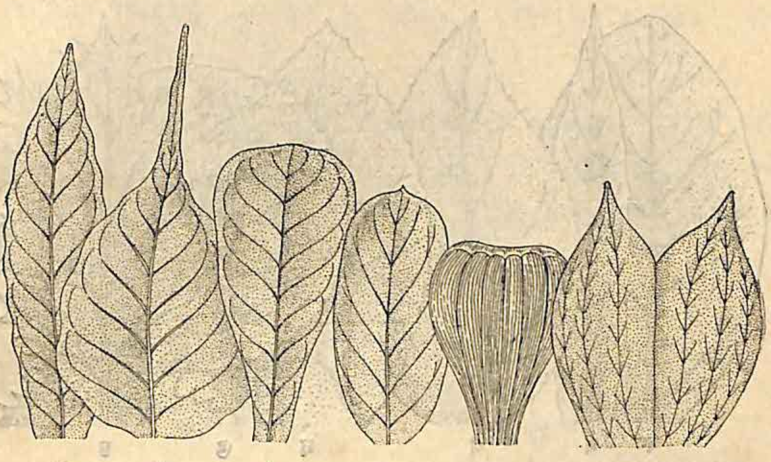
ফলকের অগ্রভাগ (Apex of the Lamina)—

নানা প্রকারের ফলকের অগ্রভাগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং আকৃতি অনুযায়ী ইহাদের বিভিন্ন নামকরণ করা হইয়াছে :—

(ক) **সূক্ষ্মাগ্র** (Acute)—পাতার অগ্রভাগ যখন ক্রমশঃ সরু হইয়া আসে তখন তাহাকে সূক্ষ্মাগ্র বলা হয় ; যথা—জবা, বাঁশ, আম ইত্যাদি।

(খ) **দীর্ঘাগ্র** (Acuminate)—কতকগুলি পাতার অগ্রভাগ চওড়া হইতে হঠাৎ সরু হইয়া একটি লেজের আকার ধারণ করে, ইহাদের দীর্ঘাগ্র বলে ; যথা—অশ্বত্থ ইত্যাদি।

(গ) **স্থুলাগ্র** (Obtuse)—অগ্রভাগ যখন বেশ চওড়া ও গোলাকার হয় তখন তাহাকে স্থূলাগ্র বলে ; যথা—কাঁঠাল, পেয়ারা ইত্যাদি।



ক খ গ ঘ ঙ চ

বিভিন্ন ধরণের ফলকের অগ্রভাগ

চিত্র—৫৮, (ক) সূক্ষ্মাগ্র, (খ) দীর্ঘাগ্র, (গ) স্থূলাগ্র, (ঘ) খর্ব সূক্ষ্মাগ্র, (ঙ) সামান্য খণ্ডিত, (চ) খণ্ডিত

(ঘ) **খর্ব সূক্ষ্মাগ্র** (Mucronate)—ইহা দেখিতে অনেকটা স্থূলাগ্রের মতো গোলাকার ও চওড়া কিন্তু আগাটি সূক্ষ্ম ; যথা—রঙ্গন, নয়নতারা ইত্যাদি।

(ঙ) **সামান্য খণ্ডিত** (Retuse)—অগ্রভাগটি চওড়া ও গোলাকার কিন্তু ঠিক মধ্যস্থলে একটি ছোট খাঁজ থাকাতে ইহা সামান্য খণ্ডিত হয় ; যথা—অপরাজিতা ইত্যাদি।

(চ) **খণ্ডিত** (Emerginate)—এই প্রকার অগ্রভাগটির খাঁজটি আরও গভীর হইয়া থাকে ; যথা—আমরুল, কাঞ্চন ইত্যাদি।

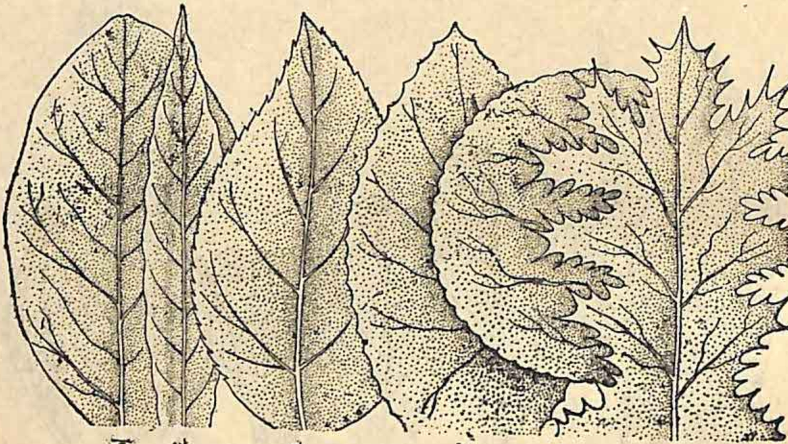
ফলকের কিনারা (Margins of Lamina)—

ফলকের কিনারাও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে :—

(ক) **অখণ্ড** (Entire)—ফলকের কিনারায় কোন খাঁজ না থাকিলে তাহাকে অখণ্ড কিনারা বলে ; যথা—আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

(খ) **তরঙ্গায়িত** (Wavy)—ফলকের কিনারা তরঙ্গের মতো উঁচু নীচু হইলে সেই কিনারাকে তরঙ্গায়িত বলে ; যথা—দেবদারু ইত্যাদি।

(গ) **ক্রকচ** (Serrate)—ফলকের কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা হইলে তাহাকে ক্রকচ কিনারা বলে ; যথা—জবা, গোলাপ ইত্যাদি।



চিত্র—৫৯, (ক) অখণ্ড, (খ) তরঙ্গায়িত, (গ) ক্রকচ, (ঘ) দন্তর, (ঙ) সভঙ্গ, (চ) কণ্টকিত

(ঘ) **দন্তর** (Dentate)—ফলকের কিনারা যখন দাঁতের মতো খাঁজ কাটা হয় তখন তাহাকে দন্তর কিনারা বলে ; যথা—আনারস, শালুক ইত্যাদি।

(ঙ) **সভঙ্গ** (Crenate)—কিনারার খাঁজগুলি এই ক্ষেত্রে গোলাকার হইয়া থাকে ; যথা—পাথরকুচি, থানকুনি ইত্যাদি।

(চ) **কণ্টকিত** (Spiny)—এই প্রকার ফলকের কিনারায় কাঁটা থাকে ; যথা—শিয়ালকাঁটা ইত্যাদি।

ফলকের পৃষ্ঠ (Surface of Lamina)—

(ক) **মসৃণ** (Glabrous)—করঞ্জা ইত্যাদি গাছের পাতার পৃষ্ঠ মসৃণ।

(খ) **সশুঙ্গ** (Hairy)—আকন্দ, সূর্যমুখী ইত্যাদি গাছের পাতার পৃষ্ঠে রোম বা শুঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) **চকচকে** (Glaucous)—বাঁধাকপি ইত্যাদি কয়েকটি গাছের পাতা চক্‌চকে হইয়া থাকে।

(ঘ) **আঠালো** (Viccid)—হুড়হুড়ে, ভেরেণ্ডা প্রভৃতির পাতার পৃষ্ঠ আঠালো হয়।

(ঙ) **কণ্টকিত** (Spiny)—বেগুন, কন্টিকারি প্রভৃতির পাতার পৃষ্ঠে কণ্টক থাকে।

ফলকের শিরাবিন্যাস (Venation of lamina)—পাতার ফলকে শিরা ও উপশিরাসহ মধ্যশিরা থাকে। যে পদ্ধতিতে এই শিরাগুলি ফলকে বিন্যস্ত থাকে তাহাকে শিরাবিন্যাস বলে। নীচে এই শিরাবিন্যাসের একটি ছক দেওয়া হইল :—

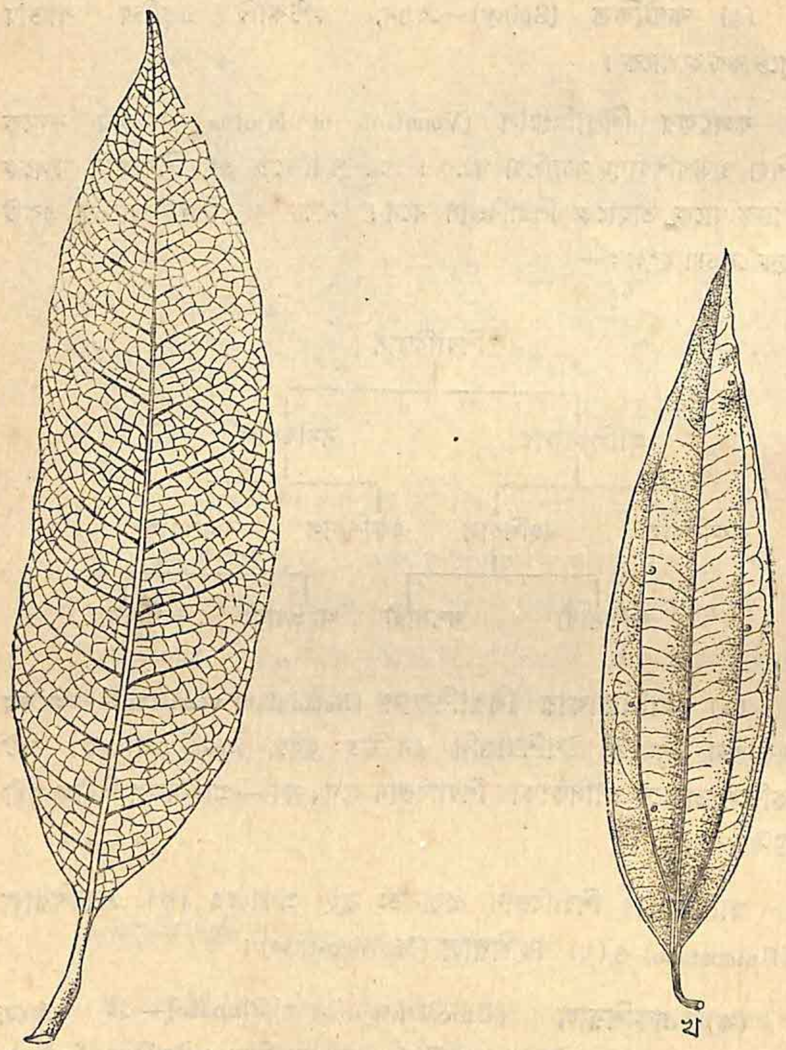
- শিরাবিন্যাস
  - জালিকাকার
    - একশিরাল
    - বহুশিরাল
      - অভিসারী
      - অপসারী
  - সমান্তরাল
    - একশিরাল
    - বহুশিরাল
      - অভিসারী
      - অপসারী

(১) **জালিকাকার শিরাবিন্যাস** (Reticulate venation)—ফলকের মধ্যশিরা, শিরা ও উপশিরাগুলি একত্রিত হইয়া একটি জালিকা সৃষ্টি করিলে তাহাকে জালিকাকার শিরাবিন্যাস বলে; যথা—প্রায় সকল দ্বিবীজ-পত্রী উদ্ভিদের পাতা।

জালিকাকার শিরাবিন্যাস প্রধানতঃ দুই প্রকারের (ক) **একশিরাল** (Unicostate) ও (খ) **বহুশিরাল** (Multicostate)।

(ক) **একশিরাল** (Unicostate or Pinnate)—এই ক্ষেত্রে ফলকের মধ্যস্থলে একটি মাত্র মধ্যশিরা থাকে এবং শিরা ও উপশিরাগুলি ইহার দুই পার্শ্বে বিন্যস্ত থাকে। উদাহরণ—অশ্বত্থ, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

(খ) **বহুশিরাল** (Multicostate or Palmate)—এই জাতীয় শিরা-বিন্যাসে, ফলকে মধ্যশিরার মতো একাধিক স্থূল শিরা উৎপন্ন হয়। এই শিরা-গুলি বৃন্তের অগ্রভাগ হইতে ফলকের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। উদাহরণ—কুমড়া, তেজপাতা ইত্যাদি।

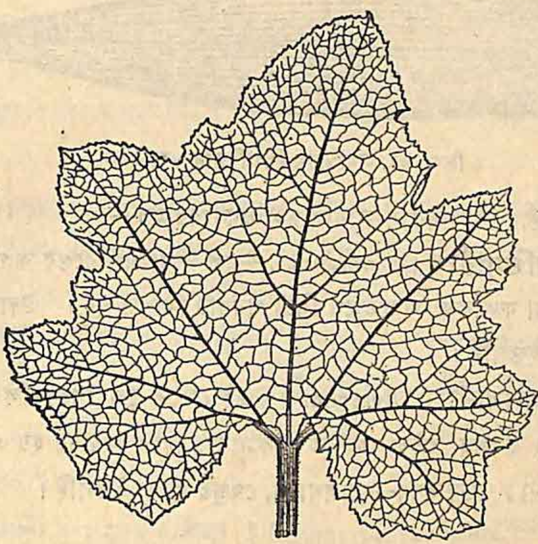


চিত্র—৬০, জালিকাকার শিরাবিন্যাস

(ক) একশিরাল (খ) বহুশিরাল (অভিসারী)

বহুশিরাল শিরাবিন্যাস দুই প্রকারের হয়—

(i) **অভিসারী** (Convergent)—শিরাগুলি বৃন্তের অগ্রভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া ফলকের অগ্রভাগে গিয়া পুনরায় মিলিত হয়। উদাহরণ—কুল, তেজপাতা ইত্যাদি।



চিত্র—৬১, বহুশিরাল (অপসারী)

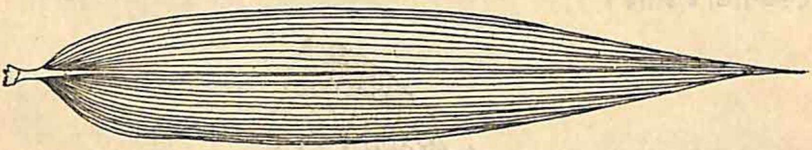
(ii) **অপসারী** (Divergent)—এই ক্ষেত্রে শিরাগুলি বৃন্তের অগ্রভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া ফলকের কিনারার দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে এবং কখনও মিলিত হয় না। উদাহরণ—কুমড়া, লাউ, উচ্ছে ইত্যাদি।

(২) **সমান্তরাল শিরাবিন্যাস** (Parallel venation)—ফলকের মধ্যশিরা বা স্থূলশিরাগুলি হইতে যে শিরা এবং উপশিরাগুলি উৎপন্ন হয় সেইগুলি সমান্তরালভাবে থাকিলে সেই প্রকার শিরাবিন্যাসকে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস বলে ; যথা—প্রায় সকল একবীজ-পত্রী উদ্ভিদের পাতা।

ইহা দুই প্রকারের হইয়া থাকে—(ক) **একশিরাল** (Unicostate) ও (খ) **বহুশিরাল** (Multicostate)।

(ক) **একশিরাল** (Unicostate or pinnate)—এই ক্ষেত্রে ফলকের মধ্যস্থলে একটি মাত্র মধ্যশিরা থাকে এবং শিরাগুলি ইহার দুই পার্শ্বে সমান্তরাল ভাবে বিন্যস্ত থাকে। উদাহরণ—কলা পাতা, সর্বজয়া ইত্যাদি।

(খ) **বহুশিরাল** (Multicostate or palmate)—এই প্রকার শিরা-বিন্যাসে ফলকে একাধিক স্থূল শিরা উৎপন্ন হয় এবং এই শিরাগুলি পরস্পর সমান্তরাল। উদাহরণ—বাঁশপাতা, ঘাস, তালপাতা ইত্যাদি।



চিত্র—৬২, সমান্তরাল শিরাবিন্যাস—বহুশিরাল

এই জাতীয় শিরাবিন্যাস আবার দুই প্রকারের হয়—

(i) **অভিসারী** (Convergent)—স্থূল শিরাগুলি বৃন্তের অগ্রভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া ফলকের অগ্রভাগে গিয়া পুনরায় মিলিত হয়। উদাহরণ—বাঁশ-পাতা, ঘাস ইত্যাদি।

(ii) **অপসারী** (Divergent)—এই ক্ষেত্রে স্থূল শিরাগুলি বৃন্তের অগ্র-ভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া ফলকের কিনারার দিকে অগ্রসর হয় এবং কখনও মিলিত হয় না। উদাহরণ—তালপাতা, খেজুর পাতা ইত্যাদি।

পাতা ও তাহার আভ্যন্তরীণ গঠন
(Leaf and its internal structure)

কতকগুলি গাছের পাতা মাটির সহিত প্রায় সমান্তরাল ভাবে কাণ্ডের গায়ে লাগিয়া থাকে ফলে পাতার উপরের পৃষ্ঠ নীচের পৃষ্ঠ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সূর্যকিরণ পাইয়া থাকে এবং উহার সবুজ রং গাঢ়তর হইয়া থাকে। এই জাতীয় পাতাকে **বিষমপৃষ্ঠ পত্র** (Dorsiventral leaf) বলা হয়। আম, কাঁঠাল ইত্যাদির পাতা এই প্রকারের।

আর একজাতীয় গাছের পাতাগুলি খাড়াভাবে গাছের গায়ে লাগিয়া থাকায় উভয় পৃষ্ঠই সমান পরিমাণে সূর্যকিরণ পাইয়া থাকে এবং উভয় পৃষ্ঠের রংও একই রকম। এই জাতীয় পাতাকে **সমাঙ্কপৃষ্ঠ পত্র** (Isobilateral leaf) বলে। বাঁশ, খেজুর প্রভৃতির পাতা এই প্রকারের।

বিষমপৃষ্ঠ ও সমাঙ্কপৃষ্ঠ পত্রের আভ্যন্তরীণ গঠনে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

১। বিষমপৃষ্ঠ পত্রের আভ্যন্তরীণ গঠন (Internal structure of a dorsiventral leaf) ঃ—

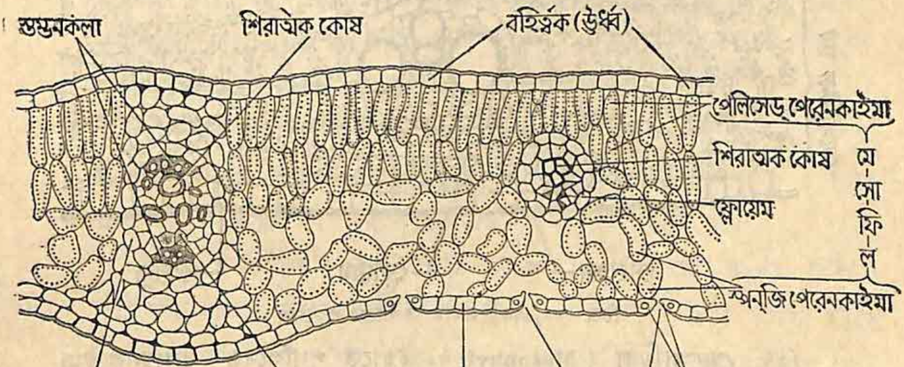
একটি বিষমপৃষ্ঠ পত্রের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে, উপর পৃষ্ঠ হইতে নীচের দিকে, নিম্নপ্রকার কলা ও কলাতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

(১) **উর্ধ্বত্বক** (Upper epidermis)—কতকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট আয়ত ক্ষেত্র কোষ দ্বারা এই উর্ধ্বত্বক গঠিত। ইহা এক বা একাধিক স্তর দ্বারা গঠিত এবং কোষগুলির বহিঃপ্রাচীরে কিউটিক্‌ল থাকে। **উর্ধ্বত্বকে পত্ররন্ধ্র থাকে না।**

(২) **মধ্যকলাতন্ত্র** বা **মেসোফিল** (Mesophyll)—উর্ধ্বত্বকের নীচে একাধিক স্তরবিশিষ্ট এই কলাতন্ত্রটি থাকে এবং ইহা প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। মেসোফিল কলাতন্ত্রের দুইটি অংশ থাকে—

(i) **প্যালিসেড প্যারেনকাইমা** (Palisade parenchyma)—দুই বা তিন স্তরবিশিষ্ট মেসোফিলের এই অংশটি উর্ধ্বত্বকের ঠিক নীচেই থাকে। এই অংশটির কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট এবং স্তম্ভাকার। কোষগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

(ii) **স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা** (Spongy parenchyma)—প্যালিসেড প্যারেনকাইমার নীচে এবং নিম্নত্বকের উপরে মেসোফিলের এই অংশটি থাকে। ইহা বহুস্তরবিশিষ্ট এবং কোষগুলি অসংলগ্নভাবে সন্নিবিষ্ট এবং গোলাকার। কোষগুলির মধ্যে অল্প পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।



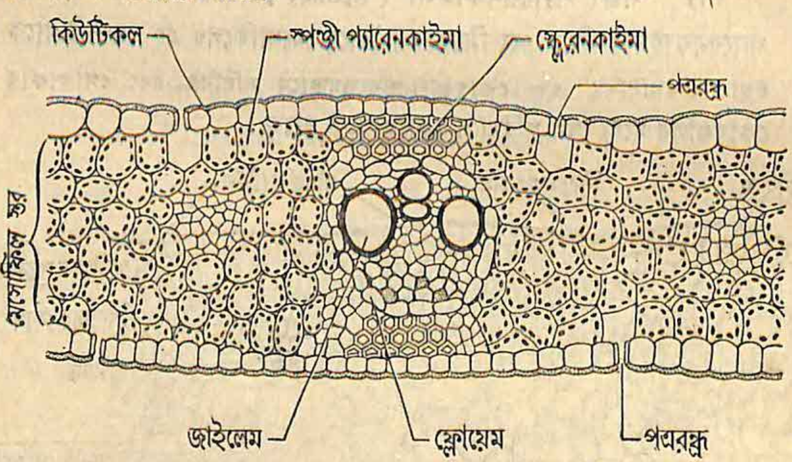
চিত্র—৬৩, একটি বিষমপৃষ্ঠ পত্রের প্রস্থচ্ছেদ

(৩) **শিরাত্মক কলাসমষ্টি** (Vascular bundles)—একটি পাতার প্রতিটি শিরা ও উপশিরাই হইতেছে একটি করিয়া শিরাত্মক কলাসমষ্টি। এই কলাসমষ্টিগুলি সংযুক্ত, বদ্ধ ও সমপার্শ্বীয় এবং প্যালিসেড ও স্পঞ্জী কোষস্তরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রতিটি কলাসমষ্টি আবার একটি **আবরণী** (Sheath) দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং ইহার উপরের দিকে থাকে জাইলেম (Xylem) ও নীচের দিকে থাকে ফ্লোয়েম (Phloem)—(i) **জাইলেম** (Xylem)—ইহা ট্রাকিড, কাষ্ঠলতন্তু ও জাইলেম প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত। ট্রাকিডগুলির প্রাচীর বলয়াকার বা সর্পিলাকার হইয়া থাকে। (ii) **ফ্লোয়েম** (Phloem)—ইহা চালনী নালিকা, সঙ্গীকোষ ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত।

(৪) **নিম্নত্বক** (Lower epidermis)—উর্ধ্বত্বকের মতো ইহাও কতকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট আয়তক্ষেত্র কোষ দ্বারা গঠিত। নিম্নত্বক সাধারণতঃ একস্তরবিশিষ্ট এবং ইহাতে অনেকগুলি পত্র-রন্ধ্র থাকে। পত্ররন্ধ্রের দুই পার্শ্বের রক্ষীকোষ দুইটিতে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

২। **সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতার আভ্যন্তরীণ গঠন** (Internal structure of an isobilateral leaf)—একটি সমাঙ্কপৃষ্ঠ পাতার প্রস্থচ্ছেদ করিলে উপর হইতে নীচের দিকে নিম্নলিখিত কলা ও কলাতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়—

(১) **উর্ধ্বত্বক** (Upper epidermis)—বিষমপৃষ্ঠ পাতার উর্ধ্বত্বকেরই মতো তবে **পত্ররন্ধ্র আছে।**



চিত্র—৬৪, একটি সমাঙ্কপৃষ্ঠ পত্রের প্রস্থচ্ছেদ

(২) **মেসোফিল** (Mesophyll)—ইহাতে প্যালিসেড প্যারেনকাইমা থাকে না। সুতরাং মেসোফিলের কেবল মাত্র একটি অংশ এবং তাহা অপেক্ষাকৃত ঘনসন্নিবিষ্ট প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত।

(৩) **শিরাত্মক কলাসমষ্টি** (Vascular bundle)—বিষমপৃষ্ঠ পাতার মতো।

(৪) **নিম্নত্বক** (Lower epidermis)—উর্ধ্বত্বকের মতো।

৩। **পাতার সাধারণ কার্যাবলী** (General functions of leaves)—

পাতা প্রধানতঃ চারিটি কার্য করিয়া থাকে—(ক) **বাষ্পমোচন** (Transpiration), (খ) **সালোক সংশ্লেষ** (Photosynthesis), (গ) **শ্বাসকার্য** (Respiration) ও (ঘ) **খাদ্য ও জল সংবহন** (Conduction of food and water)

(ক) **বাষ্পমোচন** (Transpiration)—মূলের সাহায্যে গাছ মাটি হইতে অসমোসিস প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করিয়া থাকে। এই জলের কিছুটা অংশ গাছের শারীরবৃত্তীয় কার্যসাধন করিতে লাগে অপর অংশ কোনও কাজেই লাগে না। এই অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে উদ্ভিদ্-দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়াকে বাষ্পমোচন বলা হয়।

উদ্ভিদের এই বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া প্রধানতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে—

(১) **পত্ররন্ধ্রজনিত বাষ্পমোচন** (Stomatal transpiration),

(২) **কিউটিকল্‌জনিত বাষ্পমোচন** (Cuticular transpiration)

(৩) **লেন্টিসেলজনিত বাষ্পমোচন** (Lenticular traspiration)

(১) **পত্ররন্ধ্রজনিত বাষ্পমোচন**—পত্রের বহিত্বকে কতকগুলি অতিক্ষুদ্র রন্ধ্র থাকে, ইহাদের **পত্ররন্ধ্র** (stomata) বলা হয়। এই পত্ররন্ধ্রগুলির প্রতিটির দুই পার্শ্বে দুইটি বৃত্তাকার **রক্ষীকোষ** (guard cells) থাকে। পত্ররন্ধ্রের নিচে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার কোষান্তর রন্ধ্র থাকে তাহাকে **পত্ররন্ধ্র গহ্বর** (Stomatal cavity) বলা হয়।

বাষ্পমোচনের সময় পত্রের মেসোফিল কোষ হইতে প্রয়োজন-অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে কোষান্তর রন্ধ্রের মধ্য দিয়া **পত্ররন্ধ্র গহ্বরে** আসিয়া পৌঁছায় এবং পরে পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়া উদ্ভিদ্-দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষ দুইটি থাকার ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী রন্ধ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কারণ রক্ষীকোষদ্বয়ের মধ্যে রসস্ফীতি চাপ বর্ধিত হইলে পত্ররন্ধ্রটি বৃহদাকার ধারণ করে এবং এই চাপ কমিয়া গেলে পত্ররন্ধ্রটিও ছোট হইয়া যায়। এই ভাবে রক্ষীকোষ দুইটি পত্ররন্ধ্রকে ছোট ও বড় করিয়া বাষ্পমোচন নিয়ন্ত্রণ করে।

(২) **কিউটিক্ল্জনিত বাষ্পমোচন**—পত্ররন্ধ্র ছাড়াও পত্রের বা কাণ্ডের বহির্ত্বকে যে কিউটিক্ল্ থাকে তাহার মাধ্যমে অল্প পরিমাণে জল বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়। ইহাকে কিউটিক্ল্জনিত বাষ্পমোচন বলা হয়।

(৩) **লেন্টিসেলজনিত বাষ্পমোচন**—কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ডে পত্ররন্ধ্রের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এই রন্ধ্রগুলির কোন রক্ষীকোষ নাই। ইহাদের বলা হয় **লেন্টিসেল** (Lenticel)। ইহার মাধ্যমেও উদ্ভিদের বাষ্পমোচন হইয়া থাকে।

বাষ্পমোচনের দ্বারা উদ্ভিদ্ তাহার দেহ-তাপমাত্রার তারতম্য বজায় রাখে ও জল সঞ্চালনে সাহায্য করে।

৪। **বাষ্পমোচনের উপর কতকগুলি অবস্থার প্রভাব** (**Factors influencing transpiration**)—

নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি উদ্ভিদের বাষ্পমোচন নিয়ন্ত্রণ করে—

(ক) **বাহ্যিক কারণ** (External factors)—

১। **আর্দ্রতা** (Humidity)—বায়ুর আর্দ্রতা অধিক হইলে বাষ্পমোচন হ্রাস পাইয়া থাকে এবং বায়ু শুষ্ক হইলে উদ্ভিদ্ অধিক পরিমাণে বাষ্পমোচন করিয়া থাকে।

২। **উষ্ণতা** (Temperature)—পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে অধিক পরিমাণে কোষমধ্যস্থ জল বাষ্পীভূত হইয়া থাকে এবং দেহের উত্তাপের তারতম্য বজায় রাখিবার জন্য উদ্ভিদের বাষ্পমোচন বৃদ্ধি পায়।

৩। **বায়ু** (Wind)—বাষ্পমোচন বায়ুর গতির উপর অনেকটা নির্ভর করে, কারণ বায়ুর গতি অধিক হইলে সাধারণতঃ আর্দ্রতা কমিয়া যায় ফলে বাষ্পমোচন অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

৪। **আলোক** (Light)—নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত আলোকের তীব্রতার উপর পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষ দুইটির রসস্ফীতি নির্ভর করে, ফলে পত্ররন্ধ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি নির্ভর করে। এইভাবে পরোক্ষভাবে আলোকের তীব্রতা বাষ্পমোচন নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। **জল** (Water)—মূলরোম অধিক পরিমাণে জল শোষণ করিলে বাষ্পমোচনও বর্ধিত হারে হইয়া থাকে।

(খ) **আভ্যন্তরীণ কারণ** (Internal factor)—

১। **পত্ররন্ধ্র** (Stomata)—পত্রের পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা যদি কম হয় বা পত্ররন্ধ্রগুলি বহিস্ত্বকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এবং রোম দ্বারা আবৃত হয়, তাহা হইলে বাষ্পমোচনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

২। **বহিস্ত্বক** (Epidermis)—কাণ্ড বা পত্রের বহিস্ত্বকে কিউটিকল্ যদি স্থূল হয় বা ইহা রোম বা মোম দ্বারা আবৃত থাকে তাহা হইলেও বাষ্পমোচন হ্রাস পায়।

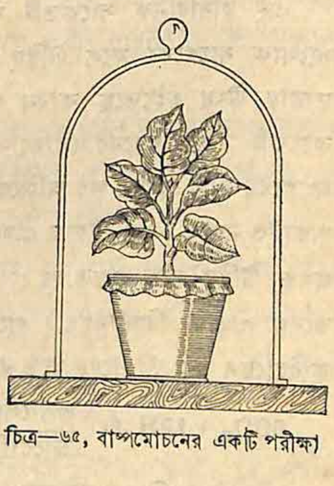
৩। **মেসোফিল কলার জলের পরিমাণ** (Water contents of the mesophyll tissue)—মেসোফিল কলার জলের পরিমাণ অনুযায়ী বাষ্পমোচনের তারতম্য নির্ভর করে।

বাষ্পমোচন (transpiration) ও বাষ্পীভবন (evaporation) এক নহে। বাষ্পমোচন একটি জৈবনিক (physiological) প্রক্রিয়া এবং ইহা কেবলমাত্র উদ্ভিদের জীবিত কোষ দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি দ্বারা গাছের বাষ্পমোচন প্রমাণ করা যায়—

পরীক্ষা :

অনেকক্ষণ সূর্যালোকে আছে এমন একটি টবের গাছ লইয়া উহার মাটি একটি রবারের চাদরের সাহায্যে ঢাকিয়া দিতে হইবে। এইবার গাছ এবং টবটিকে একটি কাচের বেলজার দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে বেলজারের ভিতরের দিকে বিন্দু বিন্দু জলকণা জমা হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে বাষ্পাকারে যে জল উদ্ভিদ্-দেহ হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাই বেলজারের শীতল গাত্রের সংস্পর্শে আসিয়া বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হইয়াছে।


চিত্র—৬৫, বাষ্পমোচনের একটি পরীক্ষা

(খ) **সালোক সংশ্লেষ** (Photosynthesis)—খাদ্য প্রস্তুত করা পাতার আর একটি প্রধান কার্য। গাছের প্রধান খাদ্য হইতেছে শ্বেতসার (Starch)

এবং সালোক সংশ্লেষের সাহায্যে এই শ্বেতসারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মূল মাটি হইতে যে জল শোষণ করে তাহা ক্রমে শিরাত্মক কলার ভিতর দিয়া পাতার কোষগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। এই কোষগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। এই ক্লোরোপাস্ট সূর্যরশ্মির শক্তি আহরণ করে এবং সেই শক্তির সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের মধ্যে একটি রাসায়নিক মিলন ঘটায়। এই মিলনের ফলে দ্রাক্ষা শর্করা (Glucose) সৃষ্টি হয় এবং অক্সিজেন বাহির হইয়া আসে। এই প্রক্রিয়ার নাম সালোক সংশ্লেষ এবং ইহা কেবলমাত্র সূর্যালোকের উপস্থিতিতে দিনের বেলাই হইয়া থাকে। পরে এই দ্রাক্ষা শর্করা হইতে শ্বেতসার উৎপন্ন হয়।

পূর্বে সালোক সংশ্লেষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল যে ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ছয়-অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড ছয়-অণু জলের সহিত মিলিত হইয়া এক-অণু দ্রাক্ষা শর্করা প্রস্তুত করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের সম পরিমাণ, অর্থাৎ ছয়-অণু অক্সিজেন ত্যাগ করে।

এই প্রক্রিয়ার রাসায়নিক সংকেত হইতেছে।

$$6CO_2+6H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6+6O_2$$

এই রাসায়নিক সংকেতটি যদি নির্ভুল হইত তবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সালোক সংশ্লেষের ফলে উদ্ভিদ্ পত্ররন্ধ্র দিয়া যে অক্সিজেন ত্যাগ করিতেছে তাহার উৎস হইতেছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানীরা কয়েকটি উন্নত ধরনের পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষের ফলে যে ছয় অণু অক্সিজেন বাহির হয় তাহার উৎস জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড নহে; এবং ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই প্রক্রিয়ার ফলে ছয়-অণু জলও উদ্ভিদ্-দেহে প্রস্তুত হয়। এই সকল বিজ্ঞানীরা (বেনসন, কেলভিন, রুবেল প্রভৃতি বিজ্ঞানিগণ) পূর্বের রাসায়নিক সংকেতটিকে ভুল প্রমাণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতে রাসায়নিক সংকেতটি হইবে—

$$6CO_2+12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O$$

এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময় জল-অণু (H_2O), সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন (H) ও হাইড্রোক্সিল (OH) কণিকায় ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার পর সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতেই হাইড্রোজেন কার্বন-

ডাই-অক্সাইডের সহিত মিলিত হইয়া বহু যৌগিক ক্রিয়া দ্বারা শর্করা ও অক্সিজেন কণিকায় রূপান্তরিত হয়। অপর দিকে দুইটি হাইড্রোক্সিল কণিকা মিলিত হইয়া জল ও অক্সিজেন কণিকায় রূপান্তরিত হয়। অক্সিজেন কণিকা দুইটি মিলিত হইয়া অক্সিজেন অণু গঠন করে ও উদ্ভিদ্-দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

সালোক সংশ্লেষের উপর কতকগুলি অবস্থার প্রভাব (Factors influencing Photosynthesis)

নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে—

(ক) বাহ্যিক অবস্থা (External Factors)

১। **কার্বন ডাই-অক্সাইড** (CO_2)—শর্করা প্রস্তুত করিবার জন্য অঙ্গারের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদ্ এই অঙ্গার সালোক সংশ্লেষের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে গ্রহণ করে। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব বেশী হইয়া গেলে উহা উদ্ভিদের পক্ষেও ক্ষতিকর।

২। **আলোক** (Light)—সালোক সংশ্লেষের জন্য যে তাপ ও শক্তির প্রয়োজন সূর্যালোক হইতে উদ্ভিদ্ তাহা পাইয়া থাকে।

৩। **তাপ** (Temperature)—উদ্ভিদ্ কোষ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা না পাইলে সালোক সংশ্লেষ করিতে পারে না। উদ্ভিদ্ অনুযায়ী এই তাপমাত্রার তারতম্য হয় তবে 20° সে. হইতে 45° সে. অবধি সাধারণত এই তাপমাত্রা হইয়া থাকে।

৪। **জল** (Water)—শর্করা প্রস্তুত করিতে কার্বনের ন্যায় হাইড্রোজেনেরও প্রয়োজন আছে। আলোক ও ক্লোরোফিলের দ্বারা জল হইতে যে হাইড্রোজেন কণিকা নির্গত হয় তাহা শর্করা প্রস্তুতে সাহায্য করে।

৫। **অক্সিজেন** (Oxygen)—সালোক সংশ্লেষের সময় অক্সিজেন উদ্ভিদ্ দেহ হইতে বাহির হয়। বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব বেশী হইলে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া হ্রাস পায়।

(খ) আভ্যন্তরিণ অবস্থা (Internal factors)—

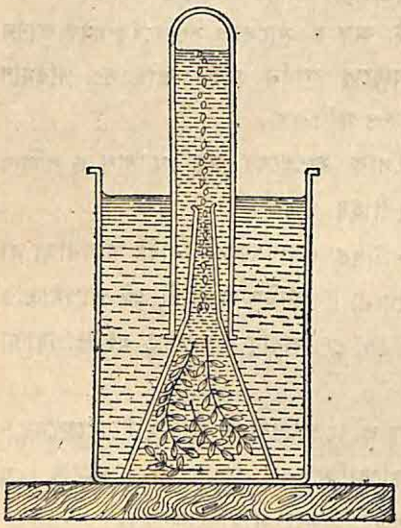
১। **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll)—যে সমস্ত কোষে ক্লোরোফিল থাকে না সেই সমস্ত কোষ কখনই সালোক সংশ্লেষ করিতে পারে না। সুতরাং ক্লোরোফিল সালোক সংশ্লেষের একটি অতি আবশ্যকীয় অংশ।

২। **শর্করার স্থানান্তরণ** (Removal of sugar)—সালোক সংশ্লেষের ফলে কোষমধ্যে শর্করা জমা হইতে থাকে। এই শর্করা যে সমস্ত কোষে প্রস্তুত হইতেছে সেই সমস্ত কোষ হইতে স্থানান্তরিত না হইলে স্থানাভাবের জন্য পুনরায় শর্করা প্রস্তুত হইতে পারে না, অর্থাৎ সালোক সংশ্লেষের প্রক্রিয়া হ্রাস পায়।

(১) নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে **সালোক সংশ্লেষের ফলে অক্সিজেন নির্গত হয়—**

পরীক্ষা ঃ

ডালপাতাসহ একটি হাইড্রিলা উদ্ভিদ্ লইয়া সেইটিকে একটি কাচের বিকারে রাখিতে হইবে। বিকারটি আংশিক ভাবে জলে পূর্ণ করিতে হইবে। এইবার একটি কাচের ফানেল লইয়া, সেইটিকে উপুড় করিয়া ঐ বিকারের ডালপাতাগুলিকে এমন ভাবে আবৃত করিতে হইবে যাহাতে ফানেলের দণ্ডটি জলের নীচে থাকে। এইবার একটি জলপূর্ণ টেস্ট টিউব দ্বারা ফানেলের দণ্ডটি আবৃত করিতে হইবে এবং তাহা এমন ভাবে উপুড় করিতে হইবে যাহাতে এক বিন্দু জলও টেস্ট টিউবের বাহিরে না আসে।



চিত্র—৬৬, সালোক সংশ্লেষের একটি পরীক্ষা

এইবার বিকারটিকে সূর্যালোকে কিছুক্ষণ রাখিলে দেখা যাইবে যে হাইড্রিলার ডালটি হইতে বুদ্বুদ্ বাহির হইয়া টেস্ট টিউবটির ভিতরে জমা হইতেছে। এইবার জলের সহিত পাইরোগ্যালেট অ্যাসিড মিশাইয়া দিলে দেখা যাইবে টেস্ট টিউবের বাতাস জলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, টেস্ট টিউবের ভিতরে বাতাস অর্থাৎ হাইড্রিলা হইতে নির্গত বুদ্বুদ্গুলি ছিল অক্সিজেন এবং পাইরোগ্যালেট অ্যাসিড তাহা শোষণ করিয়া লইয়াছে।

(২) নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় সালোক সংশ্লেষের সময় **কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করা হয়—**

পরীক্ষা ঃ একটি উদ্ভিদ্‌সমেত টবকে কয়েক দিন ধরিয়া অন্ধকারে রাখিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে ঐ উদ্ভিদের কোন পত্রেই আর শ্বেতসার না থাকে। পরে একটি বড়মুখের জারকে কাত করিয়া টেবিলের উপর রাখিতে হইবে। জারের মধ্যে থাকিবে কিছুটা কষ্টিক পটাসের দ্রবণ। জারের মুখের ছিপিটি মধ্যভাগে আড়াআড়ি ভাবে কাটিতে হইবে। এক্ষণে উল্লেখিত উদ্ভিদের একটি পত্র লইয়া তাহার অগ্রভাগ জারের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। বৃন্তসংলগ্ন অংশটি জারের বাহিরে থাকিবে এবং বৃন্তটিকে একটি জলপূর্ণ পেট্রিডিসের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে লইবে। পত্রসহ জারটিকে এমন স্থানে রাখিতে হইবে যাহাতে সূর্যালোক পায়।

ঘণ্টা কয়েক পরে পত্রটিকে লইয়া কোহলের সাহায্যে ইহাকে ক্লোরোফিল মুক্ত করিতে হইবে। তাহার পর আয়োডিন প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে, জারের ভিতরে (কষ্টিক পটাস থাকাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছিল না) পত্রের যে অংশ ছিল সেই স্থান সাদা রহিয়াছে, কিন্তু বাহিরের অংশ শ্বেতসার প্রস্তুত করার ফলে আয়োডিন সহযোগে নীল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে **কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যতীরেকে সালোক সংশ্লেষ হয় না।**

(৩) শেষোক্ত এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে আলোক ব্যতীত সালোক সংশ্লেষ হয় না—

পরীক্ষা ঃ পূর্বের পরীক্ষার ন্যায় একটি উদ্ভিদ্‌কে শ্বেতসার মুক্ত করিতে হইবে। পরে ঐ উদ্ভিদের একটি পত্রের মধ্যস্থানে একটি টিনের পাত এমনভাবে ক্লিপ দ্বারা আটকাইয়া রাখিতে হইবে যাহাতে পত্রের উভয়পৃষ্ঠেরই মধ্য স্থান সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসিতে না পারে। পাত দুইটির চারিপার্শ্বে ভেসলিন লাগাইয়া দিতে হইবে।

এইবার টবটিকে আলোকে রাখিতে হইবে। ঘণ্টা কয়েক পরে পত্রটিকে লইয়া কোহলের সাহায্যে ক্লোরোফিল মুক্ত করিয়া আয়োডিন প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে পত্রের যে স্থান আলোকের সংস্পর্শে আসে নাই তাহা সাদাই রহিয়াছে কিন্তু অপর অংশ নীল বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে **সূর্যালোক ব্যতীত সালোক সংশ্লেষ সম্ভব নহে।**

(গ) **শ্বাসকার্য** (Respiration)—পাতার অপর একটি প্রধান কার্য হইল শ্বাসকার্য। শ্বাসকার্যের সময় পাতা অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

সালোক সংশ্লেষের ফলে যে শ্বেতসার প্রস্তুত হইয়া থাকে, শ্বাসকার্যের সময় অক্সিজেনের সাহায্যে তাহার দহন হয়। ফলে, যে **স্থৈতিক শক্তি** (Potential energy) শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যে জমা থাকে তাহা **গতি-শক্তি** (Kinetic energy)-তে রূপান্তরিত হয় এবং এই গতিশক্তি উদ্ভিদের নানা কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অক্সিজেনের উপস্থিতিতে যে শ্বাসকার্য হয় তাহাকে **সবাত শ্বাসকার্য** (Aerobic respiration) বলে।

সবাত শ্বাসকার্যের ফলে শ্বেতসার ভাঙ্গিয়া গিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলে পরিণত হয়। ঐ কার্বন ডাই-অক্সাইড পত্ররন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয়।

সবাত শ্বাসকার্যের রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি এইরূপ—

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \xrightarrow{\text{উৎসেচক}} 6CO_2 + 6H_2O + 674 \text{ Kg. Cal}$$

এই প্রক্রিয়ায় দেখা যাইতেছে যে এক অণু দ্রাক্ষাশর্করা ছয় অণু অক্সিজেন সহযোগে উৎসেচকের সাহায্যে ছয় অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড, ছয় অণু জল ও বেশ কিছুটা তাপশক্তি ত্যাগ করে।

এই সবাত শ্বাস প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল, তবে এই প্রক্রিয়ার প্রথম অংশে অক্সিজেনের কোন প্রয়োজন হয় না—ইহাকে **গ্লাইকোলিসিস** (Glycolysis) বলে। ইহার ফলে **পাইরুভিক অম্ল** (Pyruvic acid) প্রস্তুত হয়। পরে এই পাইরুভিক অম্ল, অক্সিজেন, নানা প্রকার উৎসেচক ও অম্লের সংস্পর্শে আসিয়া এই প্রক্রিয়া সমাধা করে।

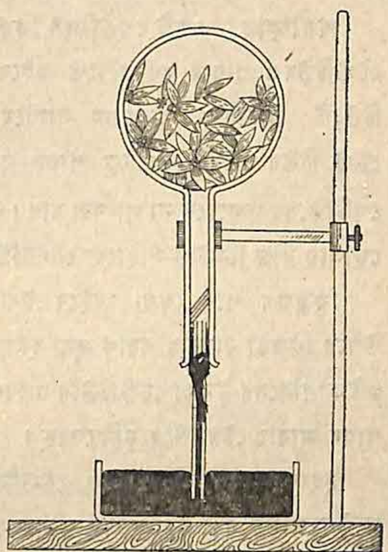
নিম্নলিখিত পরীক্ষাটির দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে **শ্বাসকার্যের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়—**

পরীক্ষা :

কিছু ফুলের পাপড়ি লইয়া সেইগুলিকে একটি কাচের ফ্লাস্কের মধ্যে রাখিতে হইবে এবং তাহার পর ফ্লাস্কের দণ্ডে কিছুটা তুলা প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। এইবার দুই এক খণ্ড কষ্টিক পটাস, একটি চিম্‌টার সাহায্যে তুলার উপরে ঐ দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ফ্লাস্কের মুখটিকে একটি ছিদ্রযুক্ত

রবার কর্ক লাগাইয়া বন্ধ করিতে হইবে। কর্কের ছিদ্রপথে একটি কাচের নল প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে।

এইবার একটি পারদপূর্ণ পেট্রিডিসের উপরে ঐ নলসহ ফ্লাস্কটিকে উপুড় করিয়া দিতে হইবে এবং স্ট্যাণ্ড ও ক্লাম্পের সাহায্যে এমন ভাবে আটকাইয়া রাখিতে হইবে যাহাতে নলটি পেট্রিডিসের তলদেশ স্পর্শ না করে। ফ্লাস্কটিকে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে ধীরে ধীরে পেট্রিডিসের পারদ নলটির মধ্য দিয়া উপরে উঠিতে থাকিবে।



চিত্র—৬৭, সবাত শ্বাসকার্যের একটি পরীক্ষা

কারণ, পাঁপড়িগুলির শ্বাস-কার্যের ফলে ফ্লাস্কের ভিতরের অক্সিজেনটুকু গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যাগ করিতেছে এবং কষ্টিক পটাসের খণ্ডগুলি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করিয়া লইবার ফলে ভিতরে শূন্যতা সৃষ্টি হইতেছে। ঐ শূন্যতা পূর্ণ করিবার জন্য পেট্রিডিসের পারদ নলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

ইহাই প্রমাণিত হইল যে শ্বাসকার্যের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়।

কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ্ অক্সিজেন ব্যতিরেকেই শ্বাসকার্য চালাইতে পারে এই প্রকার শ্বাস প্রক্রিয়াকে বলা হয় **অবাত শ্বাসকার্য** (Anærobic respiration)। ইহার প্রথম ভাগে গ্লাইকোলিসিস হইয়া থাকে এবং ফলে পাইরুভিক অম্ল প্রস্তুত হয়। কিন্তু পূর্বের ন্যায় পাইরুভিক অম্লের কোন অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। এই পাইরুভিক অম্ল ক্রমশঃ উৎসেচকের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া গিয়া **ইথিল অ্যালকোহল** (Ethyl alcohol) ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। ইহার রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিম্নরূপ—

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{উৎসেচক}} 2C_2H_5OH + 2CO_2 + 21\ K_c.\ cal.$$

অবাত শ্বাসকার্যে যে তাপশক্তি নির্গত হয় তাহা সবাত শ্বাসকার্যের তুলনায় অনেক কম।

নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে **অবাত শ্বাসকার্যের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়।**

পরীক্ষা: একটি পেট্রিডিসে কিছুটা পারদ লইতে হইবে এবং আর একটি টেস্টটিউবও পারদে পূর্ণ করিতে হইবে। এইবার পেট্রিডিসটির উপর টেস্ট-টিউবটি উল্টাইয়া স্ট্যাণ্ডের সাহায্যে এমন ভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে টেস্ট টিউব হইতে এতটুকু পারদ বাহিরে না আসে বা টেস্টটিউবের মুখটি পেট্রিডিসের তলদেশে না লাগিয়া যায়। এইবার কিছু সংখ্যক খোসা ছাড়ান ভিজা ছোলার বীজ চিমটার সাহায্যে টেস্টটিউবের ভিতর প্রবেশ করাইতে হইবে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে টেস্টটিউবের পারদ নামিয়া আসিয়াছে এবং উপরে কিছুটা বায়বীয় পদার্থ জমা হইয়াছে। পুনরায় চিমটার সাহায্যে একটি কষ্টিক পটাসের টুকরা টেস্টটিউবে প্রবেশ করাইলে দেখা যাইবে যে, পেট্রিডিসের পারদ আবার টেষ্টটিউবে ঢুকিতেছে।

ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইল টেস্টটিউবের বায়বীয় পদার্থটি হইতেছে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং ইহা অবাত শ্বাসকার্যে নির্গত হইয়াছে।

(ঘ) **জল ও খাদ্য চলাচল** (Conduction of water and food)

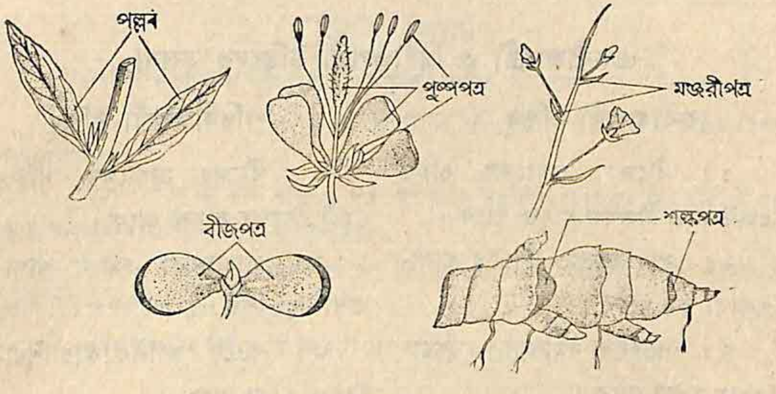
মূল রোমের দ্বারা যেই জল ও জলীয় লবণগুলি শোষিত হয় তাহা ক্রমে শিরাত্মক কলার মধ্য দিয়া মূল হইতে কাণ্ডে এবং কাণ্ড হইতে পাতায় গিয়া পৌছায়। পাতার মেসোফিল কোষগুলিতে জল পৌছাইবার পরে তাহা বাতাস হইতে শোষিত কার্বন ডাই-অক্সাইডের সহিত মিশিয়া শ্বেতসার প্রস্তুত করে। পরে এই শ্বেতসার পাতা হইতে বৃন্তের মধ্য দিয়া ফ্লোয়েম কলার সাহায্যে কাণ্ডে উপনীত হয় এবং কাণ্ড হইতে মূল বা ফলে গিয়া জমা হয়। এই ভাবে পাতার সাহায্যে জল ও খাদ্য চলাচল হইয়া থাকে।

কার্য ও অবস্থান অনুযায়ী পত্রের প্রকারভেদ (Kinds of leaves according to their function and position)—কার্য ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের পত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) **পল্লব** (Foliage leaf)—এই পর্যন্ত যে প্রকার পত্রের কথা আমরা বিশদ ভাবে আলোচনা করিলাম তাহাই হইতেছে পল্লব। এই পল্লব বায়বীয়

কাণ্ডের পর্বে অবস্থান করে এবং ইহার প্রধান কার্য হইতেছে—সালোক সংশ্লেষ, বাষ্পমোচন, শ্বাসকার্য ও জল চলাচল।

(২) **পুষ্পপত্র** (Floral leaf)—পুষ্পপত্রের উপর সজ্জিত **বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভপত্রগুলি** বিশেষ প্রকারে পরিবর্তিত পত্রমাত্র। ইহাদের কার্য হইতেছে জননকার্যে সহায়তা করা।



চিত্র ৬৮—বিভিন্ন প্রকারের পত্র

(৩) **মঞ্জরীপত্র** (Bracts)—মঞ্জরী দণ্ডের উপর যে পত্র থাকে তাহাকে মঞ্জরীপত্র বলা হয়। মোচা, কচু প্রভৃতি গাছে এই মঞ্জরীপত্র বৃহদাকারের হয়। ইহাদের কার্য হইল পুষ্পকে বাহিরের কোন প্রকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করা।

(৪) **বীজপত্র** (Cotyledon)—বীজের মধ্যে ভ্রূণের যে পত্র থাকে তাহাকে বীজপত্র বলে। ইহারা সাধারণতঃ সংখ্যায় একটি (একবীজপত্রী) বা দুইটি (দ্বিবীজপত্রী) হইতে পারে। প্রথমে ভ্রূণকে খাদ্য সরবরাহ করা এবং পরে পল্লবের আবির্ভাব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সালোক সংশ্লেষই ইহাদের কার্য।

(৫) **শল্কপত্র** (Scale leaf)—পল্লবের ন্যায় ইহাও কাণ্ডের পর্ব হইতে উৎপন্ন হয় তবে বায়বীয় হইতে মৃদগত কাণ্ডে ইহাদের আধিক্য বেশী। কাক্ষিক মুকুলকে রক্ষা করাই ইহাদের প্রধান কার্য। সাধারণতঃ অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া থাকে।

পাতার বিশেষ কার্য ও তাহাদের রূপান্তর (Special function of leaves and their modifications)—

কয়েকটি বিশেষ ধরনের উদ্ভিদের পাতা সাধারণ কার্য ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ ধরনের কার্য করিয়া থাকে। কতকগুলি মাংসাসী উদ্ভিদের পাতা কীট-

পতঙ্গ ধরিবার জন্য রূপান্তরিত হইয়া নানা প্রকার ফাঁদের সৃষ্টি করে। আবার কতকগুলি উদ্ভিদের পাতায় খাদ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। আত্মরক্ষার জন্য আবার কতকগুলি গাছের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। পাতাগুলি আবার আকর্ষে রূপান্তরিত হয় সেই সকল উদ্ভিদে যাহাদের কাণ্ড দুর্বল এবং আকর্ষের সাহায্যে কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া এই উদ্ভিদ্গুলি উপরে আরোহণ করে।

একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের তুলনা

একবীজপত্রী উদ্ভিদ্	দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ্
১। বীজের ভ্রূণাক্ষের সহিত একটি মাত্র বীজপত্র সংযুক্ত থাকে।	১। বীজের ভ্রূণাক্ষের সহিত দুইটি বীজপত্র সংযুক্ত থাকে।
২। সাধারণতঃ কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা কম থাকে।	২। সাধারণতঃ কাণ্ড শাখা-প্রশাখাযুক্ত হয়।
৩। পত্রের সমান্তরাল শিরা-বিন্যাস হইয়া থাকে।	৩। পত্রের জালিকাকার শিরা-বিন্যাস হইয়া থাকে।
৪। পুষ্পাক্ষের উপর প্রতি আবর্তে সাধারণতঃ তিনটি করিয়া পুষ্পপত্র সজ্জিত থাকে।	৪। এমন কোন নির্দিষ্ট বিন্যাস নাই।
৫। কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে দেখা যায় যে শিরাত্মক কলাসমষ্টি অবিন্যস্তভাবে রহিয়াছে।	৫। কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে দেখা যায় যে শিরাত্মক কলাসমষ্টিগুলি একই পরিধির উপর বিন্যস্ত।
৬। শিরাত্মক কলাসমষ্টি সংযুক্ত ও বদ্ধ।	৬। শিরাত্মক কলাসমষ্টি সংযুক্ত ও মুক্ত।
৭। সাধারণতঃ শিফামূল দেখা যায়।	৭। সাধারণতঃ স্থানিক মূল দেখা যায়।
৮। মূলের প্রস্থচ্ছেদে অরীয় বিন্যাস দেখা যায় এবং সংখ্যায় ইহারা সাধারণতঃ পাঁচের অধিক।	৮। মূলের প্রস্থচ্ছেদে অরীয় বিন্যাস দেখা যায় এবং সংখ্যায় সাধারণতঃ ইহারা পাঁচের কম।

(পৃষ্ঠা 31-এর চিত্র দ্রষ্টব্য)

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। চিত্র সহযোগে একটি সপুষ্পক গাছের বিভিন্ন অংশের বিবরণ দাও।

Questions to be discussed

1. Describe with sketches the different parts of a typical flowering plant.

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। একটি সাধারণ মূলের অংশ ও তাহার কার্যাবলী সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

২। মূলের প্রধান কার্য কি কি? মূল কি উপায়ে মাটি হইতে জল গ্রহণ করে তাহার বিশদ বিবরণ দাও।

৩। বিশেষ প্রকারের কার্য সাধনের জন্য প্রধান ও অস্থানিক মূলের যে সকল পরিবর্তন হয় তাহা উদাহরণ ও চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৪। উদ্ভিদ্‌কে অতিরিক্ত বলদানের জন্য অস্থানিক মূলের কি কি পরিবর্তন হয়? পরিবর্তনগুলি চিত্র ও উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা কর।

৫। একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ্-মূলের প্রস্থচ্ছেদের তুলনামূলক বর্ণনা দাও।

Questions to be discussed

1. Describe the different parts of a typical normal root and briefly describe its functions.

2. What are the principal functions of roots? Describe the process of absorption of water from the soil.

3, Describe, with the help of example and sketches, the modifications of normal and adventitious roots for the performence of special functions.

4. What are the modifications of adventitious roots for the performence of additional mechanical support to the plants? Describe the modifications with sketches and examples.

5. Give a comperative account of a dicotyledonous and a monocotyledonous root in transverse sections.

তৃতীয় অধ্যায়

১। মুকুল কাহাকে বলে? চিত্র দ্বারা বিভিন্ন প্রকার মুকুলের বর্ণনা দাও।

২। কি উপায়ে কাণ্ডকে মূল হইতে পৃথক্ করা যায়?

৩। একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের তুলনামূলক বর্ণনা দাও।

৪। শাখাবিন্যাস কি? বিভিন্ন প্রকারের শাখাবিন্যাসের বিবরণ দাও।

৫। সংক্ষেপে রূপান্তরিত কাণ্ডের সচিত্র বিবরণ দাও ও তাহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৬। কাণ্ড প্রধানতঃ যে সকল কার্য করিয়া থাকে তাহার একটি বিশদ বিবরণ দাও।

Questions to be discussed

1. What is a bud? Describe with neat sketches the different types of buds you have studied.

2. How to distinguish stems from roots?

3. Give a comparative account of dicotyledonous and monocotyledonous stems in cross sections.

4. What is branching? Describe all the types of branching you have studied.

5. Give a short and illustrated account of modified stem and mention their functions.

6. Describe in detail the normal and principle functions of stem.

চতুর্থ অধ্যায়

১। একটি সাধারণ পত্রের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

২। উপপত্র কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের উপপত্র সম্বন্ধে যাহা জান তাহার সচিত্র বর্ণনা লিখ।

৩। শিরাবিন্যাস কাহাকে বলে? উদাহরণ ও চিত্র সহযোগে বিভিন্ন ধরনের শিরাবিন্যাসের বিবরণ দাও।

৪। একক ও যৌগিক পত্র কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের একক ও যৌগিক পত্রের বর্ণনা দাও।

৫। পত্রবিন্যাস বলিতে কি বুঝায়? কয় প্রকারের পত্রবিন্যাস আছে—তাহাদের বিবরণ দাও।

৬। একটি বিষমপৃষ্ঠ পত্রের কলা ও কলাতন্ত্র বিন্যাস প্রস্থচ্ছেদের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৭। একটি সাধারণ পত্র কি কি কার্য করিয়া থাকে? এই সকল কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

Questions to be discussed

1. Give an illustrated account of the different parts of a typical foliage leaf.

2. What are stipules? Describe, with sketches, the different types of stipules you have studied.

3. What is venation? Describe with examples and sketches the different types of venations you have studied.

4. What are simple and compound leaves? Describe different types of simple and compound leaves.

5. What is phyllotaxy? How many types of phyllotaxes are present? Give their brief description.

6. Describe the arrangements of tissue and tissue-systems of a dorsiventral leaf in transverse section.

7. Enumerate the fnnctions of a typical leaf.

শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ পদ্ধতি ঃ

বিশাল এই পৃথিবীতে অজস্র রকমের পরিচিত-অপরিচিত প্রাণী রহিয়াছে। কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ ; কেহ মানুষের পক্ষে হিতকর, কেহ অনিষ্টকর ; কেহ দিবাচর, কেহ নিশাচর ; কেহ স্বাধীন, কেহ পরাধীন। আকার-প্রকারে, স্বভাব-বৈচিত্র্যে, বাসস্থানের বিভিন্নতায়, দলগতভাবে ইহাদের বৈশিষ্ট্য আছে। ক্ষুদ্র এককোষী বা অ্যামিবা জাতীয় প্রাণী হইতে শুরু করিয়া প্রায় ৯৯ লক্ষ প্রকার প্রাণীর সন্ধান আজ অবধি পাওয়া গিয়াছে। বিপুল এই প্রাণিজগৎকে জানিতে হইলে বা ইহাদের লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া মানুষের প্রয়োজনে ইহাদিগকে নিয়োজিত করিতে হইলে অথবা কোন্ প্রাণী মানুষের পক্ষে উপকারী অথবা অপকারী তাহা জানিতে হইলে, এই প্রাণিজগৎকে সঠিকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা দরকার। স্বভাবতঃই, বৈচিত্র্যপূর্ণ এই প্রাণিজগতের দিকে দেখিলে সহসা মনে হয়, ওই যে ফড়িং উড়িয়া গেল, পৃথিবীতে ওই ফড়িং কত দিন আছে,—পাখীর চেয়েও আগে থেকে কি ? ব্যাঙ্ আগে আসিয়াছে এ পৃথিবীতে, না কুমীর ? মানুষের বাস এই পৃথিবীতে কতদিন থেকে ? —ইত্যাদি।—এই সব প্রশ্নের মীমাংসার জন্যও দরকার প্রাণিজগৎকে তার বিবর্তন অনুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ করা। এই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শ্রেণীবিভাগ করার প্রণালী-বিজ্ঞানের নাম টেক্সোনমি (Taxonomy)। আপাতদৃষ্টিতে অনেক প্রাণীর মধ্যে বিভিন্নতা দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয় যে, এক প্রাণীর বুঝি-বা অপর প্রাণীর সহিত কোন সম্পর্ক নাই ; অপর পক্ষে, আচার-ব্যবহারে সাদৃশ্য থাকিলেই ইহাও মনে হইতে পারে যে, দুইটি প্রাণীর মধ্যে হয়তো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যেমন, মনে কর, তিমি, চিংড়ি, মাছ প্রভৃতি যাহারা জলে থাকে বা বাদুড়, পাখী ও ফড়িং, ইত্যাদি যাহারা উড়িয়া বেড়ায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে হয়তো নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু, বস্তুতঃ, আচারে-ব্যবহারে উপরে উল্লিখিত প্রাণীদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও ইহারা মোটেই নিকট-আত্মীয় নহে। বরং মানুষের সঙ্গে তিমি বা বাদুড়ের, এবং কাঁকড়া বা ফড়িং-এর সঙ্গে চিংড়ির ঘনিষ্ঠতা অনেক বেশী। কিংবা, যে-সকল প্রাণী মাংস খায়, তাহারা বুঝি একই দলভুক্ত বা

যে-সকল প্রাণী নিরামিষাশী তাহারা হয়তো একই দলভুক্ত, এই ধারণাও ভ্রান্ত। এইরূপ বাহ্যিক আচার-আচরণের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ করিলে স্বভাবতঃই তাহা ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ হয়, তাই এই ধরনের শ্রেণীবিভাগকে **কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ** বলে।



অ্যারিষ্টটল (Aristotle)

কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগের এই অসারতা উপলব্ধি করিয়া সর্বকালের শ্রদ্ধেয় গ্রীক মনীষী **অ্যারিস্টটল** (384—322 B.C.) সর্বপ্রথম প্রাণীদের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন-বৈষম্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রাণিজগতের বৈজ্ঞানিক **শ্রেণীবিভাগ** করিতে চেষ্টিত হন। শ্রেণীবিভাগের কয়েকটি মূল নীতি নির্ধারণ করিয়া তিনি প্রভূত উপকার করেন। এই প্রসঙ্গেই ইংরাজ প্রাণী-তত্ত্ববিদ্ **জন রে'র** (1628—1705 A. D.) নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম একটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের ক্রম-পরিবর্তন সম্ভব বলিয়া জানান। পরবর্তী কালে সুইডেনের সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী **ক্যারলাস লিনিয়াস** (1707—1778 A. D.) আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত **দ্বি-নামকরণ** প্রণালীতে প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ শুরু করেন। তাঁর শ্রেণীবিভাগ প্রণালী (ক) সাধারণ আকৃতি ও দৈহিক সাম্য, (খ) আচার-ব্যবহারের সাদৃশ্য, (গ) দেহের প্রতিসাম্য, (ঘ) প্রজনন ও জন্মের সমতা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রায় চারিহাজারের উপর প্রাণীর



লিনিয়াস (Linnæus)

এইভাবে নামকরণ করিয়াছিলেন। এই প্রণালীতে প্রাণীদের নামকরণ করার প্রভূত সার্থকতা আছে। ইহাতে প্রত্যেক প্রাণীর নাম দুইটি বাক্যে ব্যক্ত হয় এবং **ল্যাটিন** (Latin) ভাষায় এইরূপ নামকরণ করা হয়। ইহার ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী নানা দেশের মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ প্রাণী বিজ্ঞানীমহলে শুধুমাত্র ল্যাটিন ভাষার নামেই পরিচিত থাকে। মানুষের মধ্যে যেমন বিভিন্ন জাতের এবং গোষ্ঠীর মানুষকে নামের সাহায্যে চেনা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, সেইভাবে প্রাণিমহলে অংশতঃ এই চেষ্টা করা হইয়াছে। আঞ্চলিক ভাষায় এই নামকরণ করা সম্ভব নয়, কারণ, আমরা যাহাকে বাঘ বলি, ইংরাজেরা তাহাকেই টাইগার (Tiger) বলে, হিন্দুস্থানীরা তাহাকেই আবার শের বলে। সুতরাং, একটি বিশেষ প্রাণীকে চিনিবার পক্ষে প্রাণীর একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক নাম থাকাই বাঞ্ছনীয়; বিজ্ঞানীর নিকট উহাই তাহার একমাত্র পরিচিতি, উহা আঞ্চলিক ভাষার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। লিনিয়াস-প্রদর্শিত পথে প্রাণীর দ্বি-নামকরণপদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার ফলে **একপদ** (Mono-) ও **বহুপদ** (Polynomial) পদ্ধতি ব্যবহারের অবসান ঘটে।

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই **দ্বি-নামকরণ** (Binomial nomenclature) পদ্ধতিতে নামের **দুইটি** ভাগ বা পদ থাকে। নামের প্রথম অংশটিকে বলে **গণনাম** (Generic name) অর্থাৎ প্রাণিকুলের কোন্ গণের (Genus) ইহা অন্তর্ভুক্ত তাহারই পরিচায়ক এবং অপরটি **প্রজাতিনাম** (Specific name) অর্থাৎ কোন্ ক্ষুদ্রতম প্রাণিগোষ্ঠীর ইহা সদস্য, ইহা তাহারই পরিচায়ক। যেমন, কুকুরের বৈজ্ঞানিক নাম Canis familiaris, রুই মাছের নাম Labeo rohita এবং কুনো ব্যাং-এর নাম Bufo melanostictus। উল্লেখযোগ্য যে, গণনামের আদ্য অক্ষরটি **বড়** হরফের (Capital · Letter) এবং প্রজাতিনামের আদ্য অক্ষরটি **ছোট** হরফের (Small Letter) হয়। যদিও একই প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে আবাসস্থল, লিঙ্গভেদ ও ঋতুভেদে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভেদ দেখা যায়, তথাপি, ইহা অতি সামান্য। এক প্রজাতির প্রাণীর সহিত অপর প্রজাতির প্রাণীর মিলনে সাধারণভাবে সন্তান উৎপাদন সম্ভব নহে। যে-বিজ্ঞানী বিশেষ একটি প্রাণীর সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সেই বিজ্ঞানীর নাম প্রাণীটির নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়। যেমন, Felis bengalensis (Kerr); অর্থাৎ **কার** নামে কোন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম বাংলা দেশের বিড়ালের নামকরণ

করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে, বনে এক ধরনের বিড়াল থাকে, তাহার নাম **Felis chans** (Guldenstadt), কারণ Guldenstadt নামক কোন ব্যক্তি এই বন্যবিড়ালের সর্বপ্রথম নামকরণ করেন। যখন কোন প্রজাতি কোন কারণে অধঃপ্রজাতিতে (sub-sp.) বিভক্ত হয়, তখন নামের তিনটি ভাগ হয়। ইউরোপীয় চড়ুই পাখী (Passer domesticus) দুইটি অধঃপ্রজাতিতে বিভক্ত :—যথা Passer domesticus domesticus (ইউরোপের সাধারণ বাসিন্দা) এবং Passer domesticus niloticus (নাইল উপত্যকায় বাস।)

বর্তমানে যে কোন প্রাণীর নূতন নামকরণ আন্তর্জাতিক নিয়মাবলীর (১৯০১) নিয়ন্ত্রিত। কোন একটি প্রাণীর একটি নামকরণ হইয়া গেলে পরবর্তী কালে নতুন কোন প্রাণীর নামকরণ করিতে গেলে বিজ্ঞানীদের নিয়ম এই যে ঠিক সেই নাম অন্য প্রাণীর দিলে চলিবে না। প্রথমে যার যে নাম হইয়াছে সেই নাম বজায় রাখিয়া নামকরণের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা যাইতে পারে।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে **কুভিয়ার** (Cuvier, ফরাসী বিজ্ঞানী ; ১৭৬৯-১৮৩২) প্রাণিজগৎকে চারিটি ভাগে ভাগ করেন। যথা : (১) (মৎস্য হইতে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত) "মেরুদণ্ডী", (২) "মলাস্কা" (শম্বুক ও "বারনাকল্‌স"), (৩) "আর্টিকিউলাটা" (অঙ্গুরীমাল, খোলকী, পতঙ্গ, মাকড়সা প্রভৃতি), (৪) "রেডিয়াটা" (কণ্টকত্বক্, গোলকৃমি, একনালীদেহী প্রভৃতি)।

পরিশেষে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে **রে ল্যাঙ্কাস্টার** (Ray Lankaster) প্রাণিজগতের শ্রেণীবিন্যাসের যে আধুনিক পদ্ধতিটি বর্তমানে চালু আছে, তাহার প্রবর্তন করেন।

শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি ঃ

শ্রেণীবিভাগ করিবার সময় প্রাণীর বহিঃ ও অন্তঃগঠনের বৈষম্য ব্যতীতও দৈহিক সাম্য (symmetry), দেহের বিভিন্ন খণ্ড (segment), উপাঙ্গ (appendage), অস্থি-সংস্থান (skeleton), সংবহনতন্ত্র (circulatory system), জননতন্ত্র (reproductive system) প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ইটের উপর ইট গাঁথিয়া যেমন বাড়ি তৈয়ারী হয়, তেমনই জীবদেহও কতকগুলি কোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষের ভিতর কিছু পরিমাণ জীবপঙ্ক বা প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm : বর্ণহীন জেলীর ন্যায় দেখিতে) এবং সাধারণতঃ একটি নিউক্লিয়াস থাকে। নানা আকারের এবং প্রকৃতির কোষ জীবদেহে পাওয়া যায়। সৃষ্টির শুরুতে জীবপঙ্ক কোন কোষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না বা নির্দিষ্ট কোন নিউক্লিয়াসও ছিল না। কিন্তু, ক্রমশঃ ইহারা এক-

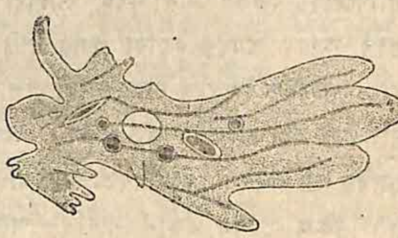
একটি কোষের মধ্যে আবদ্ধ হয় এবং শতশত বর্ষ ধরিয়া অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এককোষী প্রাণী হইতে বহুকোষী প্রাণীর উৎপত্তি হয়।

যে প্রাণিদেহ একটিমাত্র কোষ লইয়া গঠিত, তাহাকে বলে **এককোষী প্রাণী** বা **আত্মপ্রাণী**। সামান্য কয়েকটি বাদে, ইহাদের সাধারণ চোখে দেখা যায় না; কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাণী হিসাবে ইহারা সুপরিচিত। এককোষী প্রাণী হইতে অতি ধীরে ধীরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত দৃশ্য-জগতের যে বহুতর প্রাণী আমাদের চোখে পড়ে, তাহাদের নাম **বহুকোষী প্রাণী**; কারণ, একাধিক কোষ লইয়া তাহাদের দেহ গঠিত।

শ্রেণীবিভাগের মূলনীতি অনুযায়ী এইভাবে সাধারণতঃ **দশটি পর্বে** (Phylum) প্রাণীদের ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পর্বকে আবার আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠতার উপর নির্ভর করিয়া কতকগুলি **উপ-পর্ব** (Sub-phylum), **শ্রেণী** (class), **বর্গ** (order) এবং **গোত্রে** (family) ভাগ করা হইয়াছে; প্রতিটি গোত্র কয়েকটি **গণ** (Genus) লইয়া গঠিত। উল্লেখযোগ্য যে, **প্রজাতি** (Species) প্রাণিজগতের ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী, ইহা প্রায়-সদৃশ কতকগুলি প্রাণী লইয়া গঠিত। নিম্নে বর্ণিত প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, কিভাবে ক্রমশঃ অতি সাধারণ ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে বিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে জটিলতর প্রাণীর উদ্ভব ঘটিয়াছে।

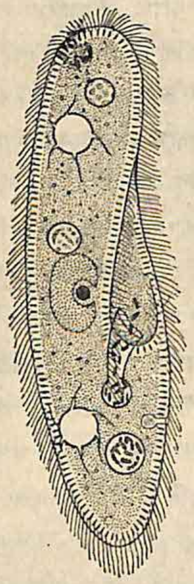
(ক) এককোষী প্রাণী ঃ

(১) **পর্ব আত্মপ্রাণী** (Protozoa : Proto = আদিম ; Zoon = প্রাণী)—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, **এককোষী** প্রাণী (acellular) একটিমাত্র কোষ লইয়া গঠিত। অন্যান্য **বহুকোষী** প্রাণীদের ন্যায় ইহারাও একটিমাত্র কোষের সাহায্যেই চলাফিরা, খাওয়া, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি জীবনের সকল প্রয়োজনীয় কার্যই সমাধা করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত ইহাদের অধিকাংশকেই খালি চোখে দেখা যায় না। যেমন, **অ্যামিবা** (Amœba)—ইহার আকার ¼ মিলিমিটার। সামান্য ইহাদের জীবনের প্রয়োজন, তাই জীবনের প্রক্রিয়াও অপেক্ষাকৃত সাধারণ। একটি অ্যামিবা কালক্রমে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া

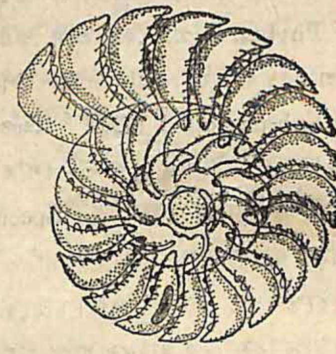


অ্যামিবা (Amœba)

দুইটি অ্যামিবার সৃষ্টি করে। আদ্যপ্রাণীদের মধ্যে সাধারণভাবে এই প্রকারেই বংশবৃদ্ধি হয়। আবার প্যারামেসিয়াম (Paramæcium) নামক আদ্যপ্রাণীর ক্ষেত্রে দুইটি প্রাণীর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ (Conjugation) হওয়ার ফলে **যৌন-প্রক্রিয়ার** সাহায্যে বংশবৃদ্ধি হয়। এই ক্ষেত্রে দুইটি প্রাণীর মিলনের ফলে অনেকগুলি ছোট ছোট প্রাণীর উদ্ভব হয়। আবার কোন কোন প্রাণীর দেহ হইতে জনন-কোষের (গ্যামিট ; Gamete) উৎপন্ন হয়।



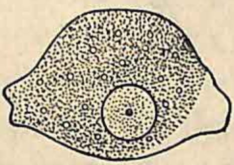
প্যারামেসিয়াম (Paramæceum)



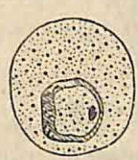
পলিস্টোমেলা (Polystomella)

দুইটি ভিন্ন প্রাণিদেহ হইতে উৎপন্ন দুইটি গ্যামিটের মিলনের ফলে নূতন প্রাণীর জন্ম হয়। ইহাকে যৌন-পদ্ধতি (Sexual method) বলে। যথা :— পলিস্টোমেলা (Polystomella)। আদ্যপ্রাণীদের কিছু কিছু স্থলে, বেশ কিছু সংখ্যক প্রাণিদেহের ভিতর এবং অধিকাংশই জলে বাস করে। যাহারা প্রাণিদেহের ভিতর বাস করে, তাহারা সেই প্রাণীর দেহ হইতেই আহার্য গ্রহণ করে। যেহতু ইহারা অপর প্রাণী হইতে আহার্য অর্থাৎ ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করে, সেইহেতু ইহাদের **পরভোজী** বলে। ইহাদের বংশবৃদ্ধি পদ্ধতি স্বাধীন আদ্যপ্রাণী হইতে অপেক্ষাকৃত জটিল। অনেক সময় ইহারা সেই প্রাণীদের দেহে ব্যাধির সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ আদ্যপ্রাণীর দেহে কোন কঠিন আবরণ থাকে না। কিন্তু কোন কোন সামুদ্রিক আদ্যপ্রাণী কঠিন আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। যেমন, পলিস্টোমেলা (polystomella)। কোটি কোটি এই ধরনের প্রাণীর দেহ-কঙ্কাল জমিয়া কালে সমুদ্রগর্ভে একটি স্তরের (চা-খড়ি) সৃষ্টি হয়।

এই পর্বভুক্ত প্রাণীদের সদস্য-সংখ্যা প্রচুর এবং বৈচিত্র্য অভিনব। প্রধানতঃ চলাফিরা করার পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া ইহাদের **৪টি শ্রেণীতে** ভাগ করা হইয়াছে। যথা—(১) **সারকোডিনা** (Gk. Sarcod = মাংস)—এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীরাও যেহেতু এককোষী প্রাণী, তাই ইহাদের মাংস নাই। মাংসের বদলে দেহের সাইটোপ্লাজম অভিক্ষেপ করিয়া ক্ষণপাদের সাহায্যে চলাফেরা করে। যেমন, অ্যামিবা, পলিস্টোমেলা (**Polystomella**) প্রভৃতি। পালিস্টো-মেলা সমুদ্রের জলে থাকে। ইহাদের দেহে চুনজাতীয় পদার্থের দ্বারা তৈরী শক্ত আবরণী আছে (অনেকটা শামুকের খোলার মত।) এইসব আবরণী প্রাণিদেহ হইতে খসিয়া পড়িয়া কালক্রমে সমুদ্রগর্ভে একটি চা-খড়ির স্তরের সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীবদ্ধ প্রায় ষাটহাজার প্রাণীর মধ্যে অধিকাংশই স্বাধীনজীবী। কেবল, পূর্বে বর্ণিত এ্যাণ্টামিবা, প্লাসমোডিয়াম প্রভৃতি (চিত্র দেখ) নামক কতকগুলি প্রাণী পরজীবী। এ্যাণ্টামিবা (**Entamœba**) আমাশয় এবং প্লাসমোডিয়াম (ইহারা মানুষের দেহে লোহিতরক্ত কণিকার মধ্যে বাস করে) ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে।



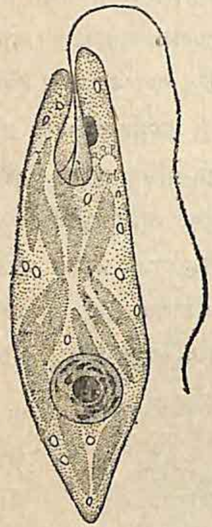
এ্যাণ্ট্যামিবা (Entamœba)



প্লাসমোডিয়াম (Plasmodium)

(২) **ম্যাসটিগোফোরা** (Gk. Mastix = চাবুক ; Phoros = বহনকারী) —এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের সকলেরই সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় ফ্লাজেলা (**Flagella**) আছে। ইহাদের সাহাযো ইহারা চলাফিরা করিতে পারে। বিভিন্ন প্রাণীতে এই ফ্লাজেলার সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। ইহাদের অনেকেই স্বাধীনজীবী, যেমন, ইউগ্লিনা (**Euglena**)। ইহার একটি মাত্র ফ্লাজেলা আছে। সাধারণতঃ, পুকুরের জলে সবুজবর্ণের অতি ক্ষুদ্র ইউগ্লিনা প্রচুর পাওয়া যায়। আবার কেহ কেহ পরজীবী হিসাবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিদেহে মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করে। যেমন,—লিস্‌ম্যানিয়া (Leishmania), ট্রাইপ্যানোসোম (Trypano-some) প্রভৃতি। প্রথমোক্ত প্রাণী কালাজ্বর, চর্মক্ষত এবং দ্বিতীয়োক্ত প্রাণী ঘুমরোগ (Sleeping sickness)-এর জন্য দায়ী। এই রোগে আফ্রিকায়

অনেক লোক মারা যায়। ট্রাইপ্যানোসোম মানুষের দেহের রক্ত রসে থাকে। আবার কাগজ বা কাঠখেকো উইপোকার অন্ত্রের ভিতর এক ধরনের ম্যাসটিগোফোরা প্রাণী থাকে। যথা,—ট্রাইকোনিম্ফা (Trichonympha) প্রভৃতি। এদের দেহে অনেকগুলি ফ্লাজেলা থাকে।

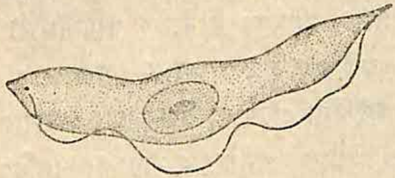


ইউগ্লিনা (Euglena)



ভর্টিসেলা (Vorticella)

(৩) **সিলিয়েট** (L. Cilium=নেত্রপল্লব)—এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীরা নেত্রপল্লবের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম কতকগুলি বস্তু নাড়িয়া জল বা জলীয় বস্তুর মধ্যে চলাফিরা করে। শুধু তাহাই নহে, খাদ্যগ্রহণ ব্যাপারেও ইহারা জলের মধ্যে সঞ্চালিত হওয়ার জন্য স্থানীয় বিশেষ প্রকারের জলস্রোতের সৃষ্টি করে এবং তাহারই সহিত খাদ্যবস্তু মুখের ভিতর প্রবেশ করে। ইহাদের অধিকাংশই স্বাধীনজীবী ; যেমন—প্যারামেসিয়াম (Paramæceum), কলপোডা (Colpoda), ভর্টিসেলা (Vorticella) প্রভৃতি। ইহাদের কিছু সংখ্যক পরজীবী। যেমন,—নিক্টোথেরাস (Nyctotherus), ওপেলিনা (Opalina) প্রভৃতি (ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীর অন্ত্রে বাস করে), এণ্টোডিনিয়াম



ট্রাইপ্যানোসোম (Trypanosome)

(Entodinium) (ছাগল-প্রভৃতি প্রাণীর পাকস্থলীতে বাস করে), মানুষের অন্ত্রের মধ্যেও সিলিয়েট শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর বাস করিবার খবর কখনো কখনো পাওয়া যায়। যেমন,—ব্যালানটিডিয়াম কোলাই (Balantidium coli)।

(৪) **স্পোরোজোয়া** (Gk. spora = বীজ ; zoon = প্রাণী)—এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের অধিকাংশই পরজীবী এবং ইহাদের জীবনচক্র অনির্দিষ্ট ও জটিল। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু প্লাস্‌মোডিয়ামও (Plasmodium) এই শ্রেণীভুক্ত (চিত্র পৃ. 95)। অপর একটি সাধারণ উদাহরণ হিসাবে গ্রিগারিনা (Gregarina) উপদলভুক্ত মনোসিষ্টিস্ (Monocystis)-এর নাম করা যায়। ইহারা কেঁচোর শুক্র-সংক্রান্ত থলির (Seminal vesicle) ভিতরে বাস করে।

(৫) **সাক্‌টোরিয়া** (Suctoria)—ইহাদের শৈশবে সিলিয়া (Cilia) এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় কর্শিকা (Tentacle) থাকে। ইহারা জলে বাস করে। যথা—এ্যাসিনেটা (Acineta)।

(খ) বহুকোষী প্রাণী ঃ

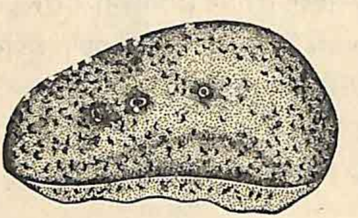
উপরিউক্ত বিরাট-পর্ব প্রটোজোয়াকে যদিও একটি পর্ব বলিয়া গণ্য করা হয়, তথাপি, ইহার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। যাহা হউক, প্রটোজোয়া ব্যতীত সকল প্রাণীই বহুকোষী অর্থাৎ ইহাদের দেহ শুধুমাত্র যে একাধিক কোষ লইয়াই গঠিত তাহাই নহে, এই কোষগুলি ক্রমশঃ স্তর-বিভক্ত হইয়াছে। (২টি হইতে ৩টি স্তরে)।

ইহাদের প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। (i) **অ-কর্ডাটা** (Non-chordata) ও (ii) **কর্ডাটা** (Chordata)। যাহাদের জীবনের কোন-না-কোন পর্যায়ে পিঠের দিকে লম্বালম্বিভাবে শক্ত কাঠির মত নটোকর্ড (Notochord) থাকে তাহাদের কর্ডাটা ও যাহাদের ইহা নাই তাহাদের অ-কর্ডাটা বলে।

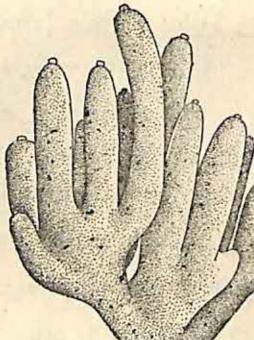
(i) অ-কর্ডাটা (অমেরুদণ্ডী) প্রাণী ঃ

(২) **পর্ব ছিদ্রাল প্রাণী** বা **পরিফেরা** (**Porifera ঃ porus = ছিদ্রাল ; ferre = বহন করা**)—ইহারা বহুকোষী প্রাণীদের প্রথম স্তরে পড়ে। ছিদ্রাল প্রাণী হইতে শুরু করিয়া দৃশ্যজগতের সমস্ত প্রাণীর দেহ একাধিকস্তর কোষদ্বারা গঠিত। ছিদ্রাল প্রাণীর দেহ **দুই স্তর** কোষদ্বারা গঠিত। সাধারণতঃ, দেহের বাহিরের দিক যে কোষসমষ্টি (কোষস্তর) লইয়া গঠিত তাহাকে বহিঃত্বক বা এক্টোডার্ম (ECTO = বাহির ; DERMIS = চামড়া) ও দেহের ভিতরের

দিক যে কোষসমষ্টি (কোষস্তর) লইয়া গঠিত, তাহাকে অন্তঃত্বক বা এণ্ডোডার্ম (ENDO = ভিতর ; DERMIS = চামড়া) বলে। এই দুইটি স্তরের মধ্যবর্তী অংশে নির্দিষ্ট আকারবিহীন থল্‌থলে জেলীর ন্যায় একটি কোষবিহীন স্তর আছে। বাহিরের কোষস্তরকে বলে বহিঃত্বক(ECTODERM)এবং ভিতরের কোষস্তরকে বলে অন্তঃত্বক(ENDODERM)। ইহারা প্রধানতঃ সমুদ্রে বাস করে, তবে স্পঞ্জিলা (Spongilla) জাতীয় প্রাণী পুষ্করিণীতে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহটি অরীয়ভাবে প্রতিসম এবং নলের মতো দেহের অগ্রভাগে একটি অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্র থাকে। ইহার নাম অস্‌কিউলাম (Osculum)। ইহাদের নড়াচড়া করার বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। ছিদ্রাল—এই কথাটির মধ্যেই ইহাদের বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়।


স্পঞ্জ (Sponge)

কারণ, ইহাদের সর্বাঙ্গে প্রচুর **ছিদ্র** আছে। এই সকল ছিদ্র দিয়া দেহের মধ্যে জল এবং জলের সহিত খাদ্য প্রবেশ করে, আবার সেই জলের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ মিশ্রিত হইয়া অস্‌কিউলাম পথে বাহির হইয়া আসে। স্নান করিবার সময় গা রগড়াইবার জন্য আরাম-দায়ক যে স্পঞ্জ ব্যবহার করা হয়, তাহা এই প্রাণিদেহ হইতেই প্রস্তুত। জলীয় পদার্থ শোষণের কাজে বিভিন্ন স্থানে (Laboratory প্রভৃতি) স্পঞ্জ ব্যবহার করা হয়। ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) জাতীয় বা স্পঞ্জিন (Spongin) বা সিলিকা (Silica) নামক জৈব-রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা ইহাদের দেহ কঠিনভাবে গঠিত। বস্তুতঃ, দেহের বিভিন্ন কোষগুলিকে ইহারাই শক্তভাবে বাঁধিয়া (আট্‌কাইয়া) রাখিয়া দেহের নির্দিষ্ট আকৃতি গঠন করে। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল স্পঞ্জের জন্য বিখ্যাত।


সাইকন (Sycon)

এই পর্বটিকে **৩টি শ্রেণীতে** ভাগ করা হইয়াছে। যথা : (১) **ক্যালকেরিয়া** (Calcarius = চুণ) ঃ এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের দেহে স্পিকিউল (Spicule)

নামক নানা ধরনের কাঁটা থাকে। উদাহরণ—সাইকন (Sycon) প্রভৃতি প্রাণী। (২) **ডিমোস্পঞ্জি** (Gk. Demos = লোক) ঃ এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের দেহ সাধারণতঃ কখনো কখনো স্পঞ্জিন দ্বারা এবং কখনো কখনো স্পিকিউল ও স্পঞ্জিন একত্রিত হইয়া গঠিত হয়। যথা—স্পঞ্জিলা (Spongilla), ক্লিওনা (Cliona) প্রভৃতি। (৩) **হেক্সাঅ্যাকৃটিনেলিডা** (Gk. Hexa = ছয়) ঃ এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের দেহ শুধুমাত্র সিলিকাদ্বারা নির্মিত ৬টি বাহুবিশিষ্ট ও কাঁটা বা স্পিকিউল লইয়া গঠিত। যথা,—ইউপ্লেক্‌টেলা বা ভেনাসের ফুলের সাজি। উল্লেখযোগ্য যে, ইহাদের দেহে বাহিরের কোষস্তর (surface epithelium) থাকে না।



পৃথিবীর তিনটি বৃহত্তম স্পঞ্জ

গ্লাসের ন্যায়, ফুলদানীর ন্যায় বা ফোঁদলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এই প্রাণীগুলি দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ প্রায় ৩ ফুট পর্যন্ত হয়। সমুদ্রে ইহাদের বাস। সমুদ্রের গভীরে ৩০০ ফুট হইতে ৩ মাইল পর্যন্ত ইহাদের পাওয়া যায়।

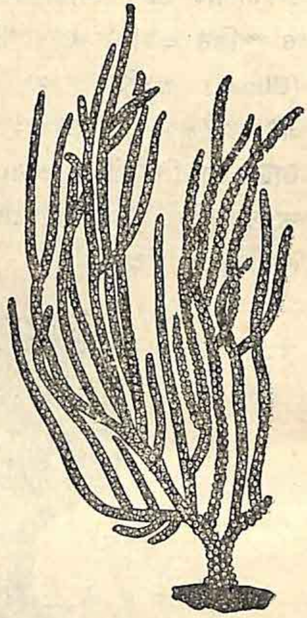
বহু কোষ দ্বারা ছিদ্রাল প্রাণীদের দেহ গঠিত হইলেও ইহাদের অন্যান্য বহুকোষী প্রাণীদের মত একই মর্যাদা দেওয়া যায় না। কারণ, ইহাদের দেহে কোষের সমন্বয়ে কোন নির্দিষ্ট কলা বা অংগ গড়িয়া ওঠে নাই যথা, স্নায়ু কলা। তাই, ইহাদের প্যারাজোয়া (Parazoa) বলে।

(৩) **পর্ব একনালীদেহী প্রাণী বা সিলেনটারাটা** (Cœlenterata : Koilos = ফাঁপা ; enteron = অন্ত্র) ঃ ইহারাই নিম্নতম স্তরের প্রাণী যাহাদের মধ্যে যথার্থ কলা (Definite tissue) দেখা যায়। ইহাদের দেহের ভিতরে একটি মাত্র নালী বা গহ্বর আছে ; তাই, ইহাদের নাম একনালীদেহী প্রাণী।

একনালীদেহী প্রাণীদের স্বাধীনভাবে (এককভাবে) অথবা উপনিবেশ (Colony) গঠন করিয়া বাস করিতে দেখা যায়। ইহারা দুই রকমের হয়,—



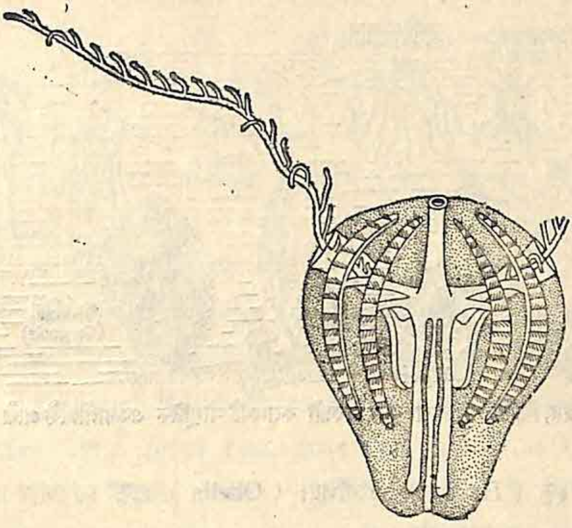
কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের প্রবাল



রাজপ্রবাল

যথা, পলিপ্ (Polyp) এবং মিডিউসা (Medusa)। পলিপ্‌দের দেহ নলাকৃতি, দেহের একদিক বন্ধ এবং অপরদিকে একটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রকে ঘিরিয়া কয়েকটি কর্শিকা (Tentacle) থাকে। মিডিউসা স্বাধীনভাবে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। ইহাদের খোলা ছাতার মত দেখিতে; ধারে ধারে কর্শিকা আছে। ভিতরে মধ্যস্থানে মুখ। জলজ খাদ্য জলের সহিত সেই ছিদ্রপথে নালীর ভিতর প্রবেশ করে এবং সেই একই ছিদ্র দিয়া জলের সহিত খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ বাহির হয়। ইহাদের কেহ কেহ মিষ্ট জলে অর্থাৎ পুষ্করিণী প্রভৃতিতে বাস করে, যেমন হাইড্রা (Hydra); আবার, কেহ কেহ লোনা জলে বা সমুদ্রে বাস করে, যেমন সাগরকুসুম (Sea-anemone)। এই জাতীয় কোন কোন প্রাণীদের মধ্যে অদ্ভুত রকমের দেহ-বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে আংটি প্রভৃতিতে যে প্রবাল ধারণ করেন, তাহা এই জাতীয় প্রাণীর দেহ হইতে পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক প্রবালদ্বীপ আছে।

শাখা-প্রশাখাসমন্বিত প্রবাল দেখিতে নানা রকমের হয়। এই পর্বে প্রায় দশ হাজার প্রাণীর নাম পাওয়া যায়।

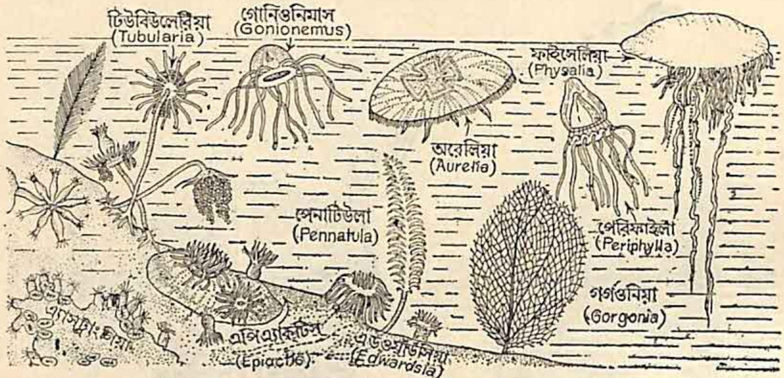


একধরনের টেনোফোরা (Ctenophora) : হর্মিফোরা

এই পর্বটি **অ্যাক্‌নিডেরিয়া** (Acnidaria) এবং **নিডেরিয়া** (Cnidaria) নামক দুইটি **উপ-পর্বে** (Sub-phylum) বিভক্ত। কর্শিকা থাকিলে ইহার সংখ্যা ২-এর বেশী হয় না। কর্শিকার গোড়া সংকোচনশীল থলির মধ্যে থাকে। পূর্বোক্ত পর্বে নিমাটোসিস্ট না থাকায় এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। অ্যাক্‌নিডেরিয়াকে **টেনোফোরাও** (Ctenophora) বলা হয়। ইহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি এতই প্রকট যে, এই উপ-পর্বটি অনেকে পর্ব হিসাবে গণ্য করেন। প্রায় ১০০ প্রাণীবিশিষ্ট এই উপ-পর্বে শুধু **মেডিউসা কুঁড়ি জন্মায় ও পলিপ্ দেখা যায় না**। ইহাদের দেহে অরীয় সাম্য (Radial symmetry) আছে। লার্ভা দশা নাই। প্রজনন, যৌন ও অযৌন উভয় প্রকারেই হইয়া থাকে। কখনও কখনও অযৌন ও যৌন পদ্ধতি একে অপরের পরিপূরক হয় (Alternation of generation) ফলে যৌন (Polyp) ও অযৌন (Medusa) পদ্ধতি জীবনচক্রে পরপর অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদের দেহের চারিদিকে চুলের ন্যায় সিলিয়ার (Cilia) দ্বারা গঠিত সরু চিরুণির ন্যায় বস্তু (Comb-plate) দেখা যায়। যথা,—হর্মিফোরা (Hormiphora)।

এই পর্বটি ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা : (১) হাইড্রোজোয়া (Gk. Hydro = জল ; Zoon = প্রাণী)। এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের দেহ গাছের ন্যায়

প্রশাখাবিশিষ্ট। নানা আকারসমন্বিত এই শ্রেণীর সদস্যরা পলিপ্ (Polyp) এবং মেডিউসা (Medusa) এই দুইটি অবস্থায় সাধারণতঃ থাকে। উদাহরণ



নিজস্ব, নির্দিষ্ট পরিবেশে বসবাসকারী কয়েকটি সামুদ্রিক একনালীদেহী প্রাণী

হিসাবে, হাইড্রা (Hydra), ওবেলিয়া (Obelia) প্রভৃতির নাম করা যায়। (২) স্কাইফোজোয়া (Gk. Skuphas = পেয়ালা) : এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীরা অধিকাংশই সামুদ্রিক এবং ২০০ অপেক্ষা অধিক দলে বিদ্যমান। ইহাদের মেডিউসার মুখের চারিপাশে চারিটি ফিতার ন্যায় অংশ সংযুক্ত থাকে। ইহাদের প্রান্ত সরু ঘোড়ার খুরের ন্যায় চারিটি জননেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট। এই প্রাণীরা যৌন-প্রক্রিয়া অনুযায়ী বংশবৃদ্ধিকালে দৈহিক



সাগর কুসুম

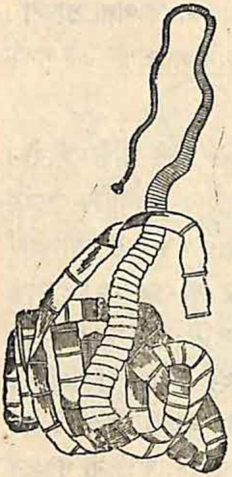
রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণাংগ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অরেলিয়া (Aurelia) নামক প্রাণী এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য সদস্য। (৩) অ্যান্থোজোয়া (Gk. Anthes = ফুল) : নাম হইতেই বুঝা যায় যে, আকৃতিতে ইহারা অনেকটা ফুলের ন্যায়। ইহারা একক ভাবে বা উপনিবেশ গঠন করিয়া দলবদ্ধভাবে বাস করে। ইহাদের কেহই **মেডিউসা অবস্থায় থাকে না, ইহাদের দেহ হইতে শুধু পলিপ্ কুঁড়ি জন্মায়।** পূর্বে বর্ণিত সাগরকুসুম, প্রবাল এই শ্রেণীভুক্ত।

(৪) **পর্ব চ্যাপ্টা কৃমি** বা **প্লাটিহেলমিনথিস্** (Platyhelminthes) (GK. Platy = চ্যাপ্টা, helminthes = কৃমি) : ইহাদের দেহ চ্যাপ্টা, অনেক সময়ে লম্বা-ফিতার মতো হয়। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই **পরভোজী**। প্রায় সাড়ে ছয় হাজারের মত নানা ধরনের চ্যাপ্টা কৃমি আছে। এই পর্বটি **তিনটি** শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা :—

(১) **টারবিলেরিয়া** (Turbellaria)—ইহারা অধিকাংশই স্বাধীনজীবী। কেহ কেহ অন্য প্রাণীর দেহের উপরে এবং অপর কয়েকটি, অন্য প্রাণীর দেহের ভিতরে বাস করে। ইহাদের চ্যাপ্টা লম্বা দেহের অগ্রভাগের অঙ্কদেশে মুখছিদ্রটি অবস্থিত। ইহাদের আকৃতি খুব ক্ষুদ্র (অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিতে হয়) হইতে ৩০০ মি.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। সাধারণ ভাবে ইহারা ৫০ মি.মি.-র কম লম্বা হয়। যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতে ইহাদের বংশবিস্তার হয়। ইহারা পুষ্করিণী, খাল, বিল প্রভৃতি যেসব মিষ্ট জলের জলাশয়ে ১২ মাস জল থাকে, সেই সব স্থানে ইহাদের বাস। দিনের বেলা জলের ভিতরের উদ্ভিদ, কাঠ বা পাথরে আট্‌কাইয়া থাকে দিনের আলো এড়াইবার জন্য। ইহারা মাংসাশী, অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণী ইহাদের খাদ্য। দেহ হইতে নিঃসৃত এক প্রকার রসে (Mucous) ইহারা ইহাদের শিকার আট্‌কাইয়া খাইয়া ফেলে। যথা, প্ল্যানেরিয়া।

(২) **ট্রিমাটোডা** (Trematoda)—ইহারা সম্পূর্ণরূপে পরজীবী। বেশীর ভাগই মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের ভিতরে থাকে। ইহাদের পৌষ্টিক নালীর দ্বি-বিভাগ উল্লেখযোগ্য। যকৃৎ-কৃমি, সিস্টোসোমা প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য সদস্য। পরজীবী জীবনের সঙ্গে মানাইয়া লইবার জন্য ইহাদের দেহের প্রচুর রূপান্তর হইয়াছে। সাধারণতঃ মুখের কাছে একটি এবং ধারে-কাছে আরও কয়েকটি চোষক আছে। আশ্রয়দাতা প্রাণীর কোষসমূহ অথবা দেহরস মাংসল গলবিলের (Pharynx) সাহায্যে ইহারা টানিয়া লয়। কেহ কেহ বহিঃপরজীবী, যেমন, গাইরোডাকটাইলাস (Gyrodactylus) (ইহারা পোনা মাছের পাখনায়, চামড়ায় এবং ফুলকায় বাস করে)। মাছের মহামারী সৃষ্টি করে ইহারা কখনও কখনও। তাই ইহারা মাছের মহাশত্রু **যকৃৎ-কৃমি** (Liver-fluke), **সিস্টোসোম্** (Schistosome) প্রভৃতি। **অন্ত্রকৃমি** (Intestinal fluke) চীন, ভারতবর্ষ এবং সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জের মানুষের দেহে বাস করে, বিশেষ করে চীন দেশে, কুকুর ও শূকরের দেহেও ইহাদের পাওয়া যায়।

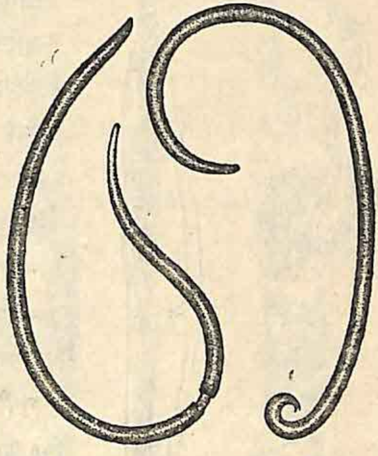
(৩) **সেস্টোয়ডিয়া** (Cestoidea)—ইহারা সকলেই অন্য প্রাণীর দেহের ভিতরে বাস করায় ইহাদের আভ্যন্তরীণ পরজীবী বলা হয়। আকারে ইহারা সরু এবং লম্বা ও চ্যাপ্টাদেহী প্রাণী। ইহাদের আকৃতি অন্যান্য চ্যাপ্টা কৃমিদের আকৃতি হইতে ভিন্ন হইলেও দেহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ইত্যাদিতে ইহারা প্রায় অন্যান্য হইতে অভিন্ন। ইহাদের মুখ ও পৌষ্টিক নালী নাই। সমগ্র দেহ দিয়া ইহারা প্রাণীদের হজম হওয়া খাদ্যরস শোষণ করে। বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ইহাদের দেহ। দেহের প্রতি খণ্ডকে প্রগ্‌লোটিড (Proglottid) বলে। যথা, ফিতাকৃমি প্রভৃতি। মানুষ হইতে শুরু করিয়া অসংখ্য (গৃহপালিত) জন্তুর দেহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইহারা ব্যাধির সৃষ্টি করে। এক প্রাণীর দেহ হইতে অন্য প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিবার পন্থা ইহাদের অভিনব। চ্যাপ্টা কৃমিদের অধিকাংশই **উভলিঙ্গ** (Hermaphrodite)। ফিতার মত চেহারা যাহাদের, তাহাদের নাম ফিতা-কৃমি (Tape worm)। ইন্দুর, কুকুর, ভেড়া, শৃগাল, ঘোড়া এমন কি মানুষের অন্ত্রের মধ্যে নানান ধরনের (প্রজাতির) ফিতাকৃমি বাস করে।


ফিতা-কৃমি

যথা—টিনিয়া সোলিয়াম (Taenea solium) [মানুষ], টিনিয়া পিসিফরমিস্ (Taenea pisiformis) [কুকুর-বিড়াল], একাইনোকক্কাস্ গ্রানুলোসাস্ (Echinococcus granulosus) [পূর্ণাঙ্গ, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতিতে এবং লার্ভা মানুষে] প্রভৃতি।

(৫) **পর্ব গোল** বা **সূতা-কৃমি** বা **নিমাথেলমিন্‌থিস** (Gk. Nematos =সূতা, helminthes=কৃমি)—ইহাদের দেহ নলের মত গোল এবং সূতার মত সরু ও লম্বা। সাধারণতঃ ইহারা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, তবে কখনও কখনও এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। দেহে পুরু অথচ স্বচ্ছ একটি আবরণ আছে। ইহাদের অধিকাংশেরই স্ত্রী-পুরুষ লিঙ্গ-ভেদ আছে ; অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন। এমনকি, অনেকের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীর আকৃতিতে তারতম্য দেখা যায়। ইহাদের আহার্য গ্রহণ করিবার জন্য সুগঠিত পৌষ্টিকনালীর অগ্রভাগে খাদ্য গ্রহণের জন্য মুখছিদ্র এবং বিপরীত দিকে মল-নিষ্কাশনের জন্য পায়ু আছে। এই

পর্বের মাত্র একটি শ্রেণী আছে ; ইহাকে **নিমাটোডা** (*Nematoda) বলা হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাণিদেহে অন্ত্র, রক্ত, এবং অন্যান্য অংশে ও উদ্ভিদের মূলে, গমের বীজের মধ্যে পরভোজী হিসাবে বাস করে। অনেকে আবার মানবদেহে মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করে। কেহ কেহ সমুদ্রে অথবা মিষ্ট জলেও বাস করে।

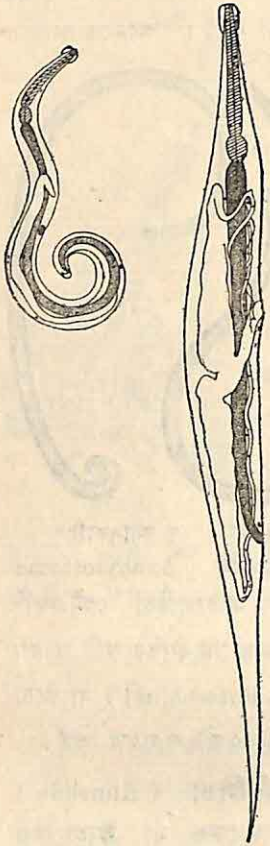

স্ত্রী অ্যাস্কানিস্ পুং অ্যাস্কারিস্

এই পর্বে প্রায় ১০ হাজারের মত প্রাণী আছে। প্রায় ৫০ রকমের (প্রজাতির) গোলকৃমি মানুষের দেহে পরজীবী হইতে পারে। অ্যাস্কারিস্ (Ascarislu mbricoides) সাধারণতঃ মানবদেহে বৃহদন্ত্রের মধ্যে ও শূকরের দেহের ভিতর বাস করিয়া অশেষ দুর্গতি ঘটায়। ইহা কেঁচো কৃমি নামে পরিচিত। ক্ষুদ্র অন্ত্রে এ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডিউওডেনেল (Anchylostoma dueodenale), (হুক-কৃমি) রক্তশূন্যতা ঘটায়। ফাইলেরিয়া বেনক্রফটি (Filaria bancrofti) মানুষের দেহে গোদ (শ্লী-পদ) ইত্যাদি ব্যধির সৃষ্টি করে। অক্সিউরিস্ (Oxyuris vermicularis [বর্তমান নাম Fnterobius]) বা কুচো কৃমি, শিশুদের মলদ্বারের নিম্নদেশে বাস করে। ইহাদের স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন।

(৬) পর্ব অঙ্গুরীমাল প্রাণী বা **অ্যানিলিডা** (Annelida) (Gk. Annulus=ছোট অঙ্গুরী)—ইহাদের কাহাকেও না কাহাকেও তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি প্রাণীকে এই পর্বের উদারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইহাদের দেহ সাধারণভাবে দেখিলে মনে হইবে যেন সত্যই কয়েকটি অঙ্গুরী পর পর সাজানো আছে। এই পর্বের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম সমগ্র দেহটি কয়েকটি খণ্ডক-এ (Segment) বিভক্ত। ইহাদের দেহ নলের মত লম্বা ও সরু। দেহের অগ্রভাগ ও পশ্চাৎভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়া শেষ হইয়াছে। নরম মাংসল দেহটি একটি প্রায়স্বচ্ছ আবরণী দ্বারা আবৃত। সাধারণতঃ দেহের নরম চামড়াটি অনেকেরই শ্বাসকার্য চালাইবার একমাত্র অঙ্গ, অবশ্য কিছু কিছু গর্তবাসী অঙ্গুরীমাল প্রাণীর ক্ষেত্রে এক

* নিাটোডাকে নিমাথেলমিনথিস্ (Nemathelminthes) নামে পৃথক পর্বেও পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়।

ধরনের ফুলকা (Gill) আছে। এই পর্ব প্রায় সাত সহস্রাধিক সদস্য-অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কেহ স্বাধীনজীবী, কেহ পরজীবী, কেহ গর্তের মধ্যে নলের ভিতর, কেহ বা অপর প্রাণীর সঙ্গে একসঙ্গে এমনভাবে বাস করে যাতে সে প্রাণীর কোন ক্ষতি হয় না অথচ, নিজে উপকৃত হয়। কেহ স্থলে, কেহ মিষ্ট জলে আবার কেহ বা লোনা জলে বাস করে। তাই, ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহারাও সাধারণত **উভলিঙ্গ**। সাধারণতঃ যৌন পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধি হয়, যদিও কখনও কখনও অযৌন পদ্ধতিতেও (অঙ্কুরোদ্গম) প্রজনন হয়। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পথে ট্রকোফোর লার্ভার (Trocophore Larva) মাধ্যমে দৈহিক রূপান্তর হয় কাহারও। আবার কাহারও সোজাসুজি ডিম হইতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী হয় (দৈহিক রূপান্তর হয় না)। আকৃতিতে অঙ্গুরীমাল প্রাণী 1 মি.মি-র কম থেকে কয়েক ফুট পর্যন্ত হয়।



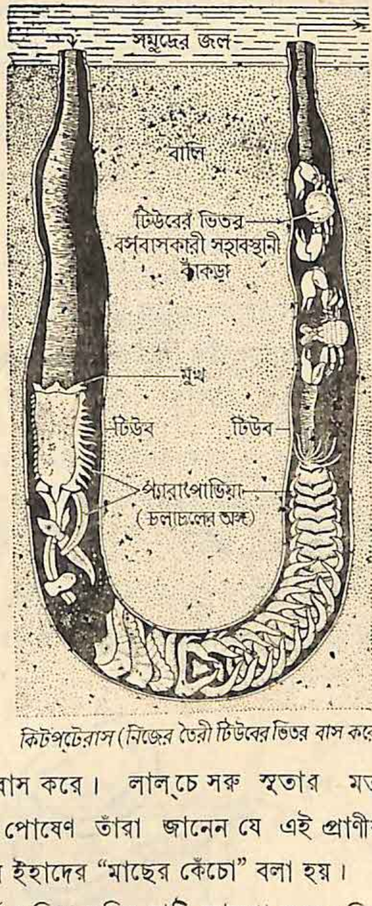
অক্সিউরিস্ (কুঁচো কৃমি)

ইহারা **৭টি** শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা :

(১) **পলিকিটা** (Poly = অনেক ; chaeta = কিটা) ইহাদের লম্বক দেহের প্রতিখণ্ডে একজোড়া করিয়া উপপদ বা প্যারাপোডিয়া (Parapodia) থাকে এবং এই-গুলিতে সিটা (Seta) বা কিটা নামক শক্ত চুলের ন্যায় বস্তু থাকে। ইহাদের সিটাগুলি সংখ্যায় প্রচুর বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে এই সকল প্রাণী চলাফিরা করে। ইহাদের দেহ, মস্তক ও ধড়ে বিভক্ত। ইহাদের দেহের শীর্ষে (মস্তকে) কতকগুলি কর্ণিকা (Tentacle) থাকে। ইহাদের দেহে স্থায়ী জনন-অঙ্গ (Reproductive organ) নাই। দৈহিক রূপান্তরের মাধ্যমে লার্ভা (Trocophore Larva) পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রের বেলাভূমিতে এই সকল প্রাণী প্রচুর পাওয়া যায়। যথা :—নেরিস্ (Nereis = সমুদ্রের কেঁচো)।

এ্যাফ্রোডাইট (Aphrodite) (সামুদ্রিক ইঁদুর), টেরিবেলা (টিউবের [Tube] ভিতর বাস করে) ; কিটপ্‌টেরাস (Chaetopterus) ; [terebella অপর একটি টিউববাসী) প্রভৃতি এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য সদস্য।

(২) **অ লি গো কি টা** (Oligos = অল্প ; chaeta = কিটা)—উভলিঙ্গ এই প্রাণীদের চামড়ার প্রতি খণ্ডক-এ কিটাগুলি প্রায় গোলাকারে দেহটিকে বেষ্টন করিয়া রাখে। ইহাদের কিটার সংখ্যা কম। এই শ্রেণীতে প্রায় 2400 সদস্য আছে। কেঁচো এই শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য সদস্য। সাধারণতঃ ইহারা নরম মাটিতে বাস করে, কেহ জলে, কেহ পাহাড়ের (কাশ্মীর) ১২,৫০০ ফুট উপরে, আবার কেহ-বা তুষার অঞ্চলের বাসিন্দা। নোংরা নর্দমার জলে টিউবিফেক্স্ (Tubifex) বাস করে। লাল্‌চে সরু সুতার মত ইহাদের চেহারা। যাঁরা শখের মাছ পোষেণ তাঁরা জানেন যে এই প্রাণীরা মাছের প্রিয় খাদ্য। তাই, চলতি কথায় ইহাদের "মাছের কেঁচো" বলা হয়।

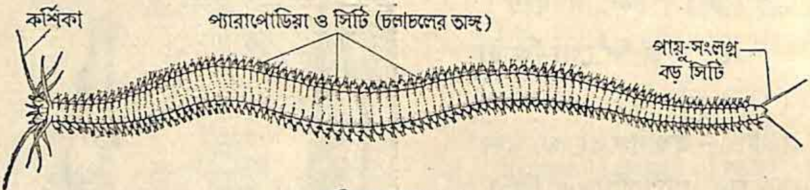


কিটপ্‌টেরাস (নিজের তৈরী টিউবের ভিতর বাস করে)

মাটির কেঁচো চাষের জমিতে গর্ত করিয়া জমির মাটি আল্‌গা করে বলিয়া ইহাদের "কৃষকের বন্ধু" বলে। অবশ্য কিছু কিছু প্রাণীর দেহে রোগবিস্তারে কোন কোন কেঁচো সাহায্য করিতে পারে।

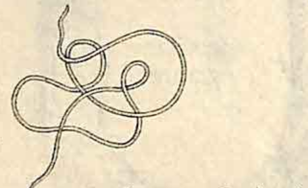
(৩) **হিরুডিনিয়া** (Hirudo = জোঁক)। ইহাদের দেহের প্রতিখণ্ডকের বাহিরের চামড়া ৫টি রেখা দ্বারা পূর্ণবিভক্ত। এই ভাগগুলিকে অ্যানিউলি (Annulus = আংটি) বলা হয়। এই শ্রেণীর সদস্যরা জলে ও স্থলে বাস করে। প্রাণিদেহে পরজীবী হিসাবে বাস করিয়া রক্তশোষণের দ্বারা জীবনধারণ করাই এই ধরনের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ইহাদের দেহে কোন

সিটা বা ঐ ধরনের চলাফেরা করার কোন অংশ নাই। এই শ্রেণীর প্রাণীদের জীবনে জন্মের সময় কোন দৈহিক রূপান্তর (ট্রকোফোর লার্ভা পর্যায় নাই) হয় না। ইহাদের চলাফেরা করার জন্য বা অন্য প্রাণী বা কোন বস্তুতে দেহ আট্‌কাইবার

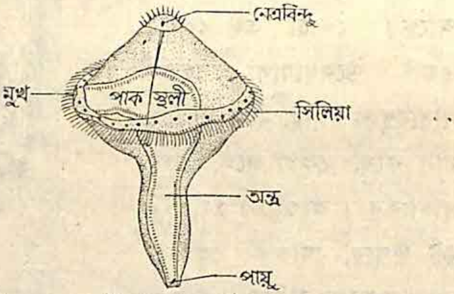


নেরিস (NEREIS)

জন্য ইহাদের দেহের প্রান্তে **চোষক** (Sucker) আছে। উভলিঙ্গ এই প্রাণীদের পুং-জনন ছিদ্রের ঠিক্ নিম্নে স্ত্রী-জনন ছিদ্র দেহের লম্বরেখা বরাবর অবস্থিত। উদাহরণস্বরূপ, সচরাচর চোখে দেখা জোঁকের* নাম উল্লেখ করা যায়।



পলিগর্ডিয়াস (স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য)



ট্রোকোফোর লার্ভা



পলিগর্ডিয়াস (বড় করিয়া দেখান)

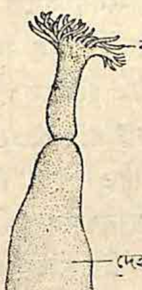
ইহারা গরু হইতে শুরু করিয়া মানুষ পর্যন্ত অনেক প্রাণীর রক্ত শোষণ করিয়া

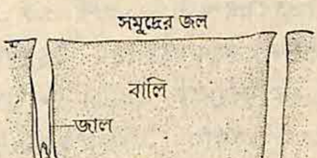
* প্রাচীন যুগে বিজ্ঞান যখন অনগ্রসর ছিল, তখন মানুষের দেহের রক্ত চাপ হ্রাস করিবার জন্য কাণে জোঁক লাগাইয়া ইহার সাহায্যে রক্ত শোষণ করাইয়া চিকিৎসা করা হইত। জোঁক সাধারণতঃ মিষ্ট জলেই (Fresh water) বাস করে, কেহ কেহ সামুদ্রিক মাছে বহিঃপরজীবী হিসাবে এবং অল্প কিছু নরম মাটিতে বাস করে। জোঁক নিজের শরীরের ওজনের অনেকগুণ বেশী রক্ত একবারে পান করিতে পারে। মাছ ধরার টোপ হিসাবে জোঁকের ব্যবহার আছে। পুরাকালে অলংকার হিসাবে কাণে জোঁক লাগাইবার প্রথা ছিল।

জীবন ধারণ করে। অ্যাকান্থব্‌ডেলা (Acanthobdella) নামে এক ধরনের জোঁক মাছের দেহে এবং গ্লসিফোনিয়া (Glossiphonia) নামক জোঁক পুকুরের ঝিনুকের দেহে পরজীবী হিসাবে বাস করে। হিমাডিপ্‌সা (Haemadipsa) স্থলের জোঁক।

(৪) **আর্কিঅ্যানিলিডা** (Gk Archae=শুরু ; Annulus=আংটি) আকারে ছোট নলের ন্যায় প্রাণীগুলি অ্যানিলিডা পর্বের প্রাচীন সদস্য। ইহাদের অধিকাংশই সামুদ্রিক এবং দেহটি বাহ্যতঃ যথার্থ খণ্ডকে বিভক্ত নহে। ইহাদের দেহের অগ্র ও পশ্চাৎ প্রান্তে একজোড়া করিয়া শুঁড় থাকে। একলিঙ্গ এই প্রাণীদের জীবনচক্রে ট্রকোফোর লার্ভা (Trocophore larva) মাধ্যমে রূপান্তর আছে। উদাহরণস্বরূপ, পলিগোর্ডিয়াস (Polygordius)-এর নাম করা যায়।

(৫) **ইকিউরোয়ডিয়া** (Echiuroidea) – ইহাদের দেহে খণ্ডক-বিভক্তির প্রায় কোন চিহ্নই নাই এবং দেহের অংকীয়ভাগে একজোড়া সিটা আছে। প্রায় ৭টি প্রজাতি এই শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়। একলিংগ এই প্রাণীদের উল্লেখযোগ্য সদস্য **বোনেলিয়ার** (Bonellia) স্ত্রী ও পুং-এর মধ্যে আকৃতিগত বৈষম্য আছে। পুরুষ বোনেলিয়া স্ত্রীর দেহের মধ্যে বাস করে। বাদামী,





ইকিউরাস (Echiurus)

বালির গর্তের ভিতর ইকিউরাস মিউকাসের তৈরী খাবার ধরার জাল পেতে বসে আছে.

সাইপ্যানকিউলাস (Sipunculus)

লাল্‌চে অথবা হল্‌দে রং-এর অদ্ভুত এই প্রাণীদলে প্রায় ৬০টি প্রজাতি (species) আছে। সমুদ্রের ধারে কাদায় বা বালীতে এরা বাস করে। 25 মিমি. হইতে শুরু করে প্রায় 450 মি.মি. পর্যন্ত বিভিন্ন মাপের এই প্রাণীদের পাওয়া যায়।

(৬) **সাইপানকিউলোয়ডিয়া** (Sipunculoidea)—খণ্ডকহীন এই প্রাণীদের মধ্যে দেহের পৃষ্ঠভাগে পায়ুছিদ্র এবং মাত্র এক জোড়া রেচন অংগ আছে। বালি, মাটি বা প্রাণিদেহের শূন্য খোলকের ভিতর ইহারা বাস করে। ইহাদের দেহে সিটা নাই। দেহে স্থায়ী কোন জননেন্দ্রিয়ও নাই। ইহাদের জীবনেও দৈহিক রূপান্তর আছে। উদাহরণস্বরূপ, সাইপান্‌কিউলাস (Sipunculus)-এর নাম করা যায়। ফ্যাস্‌কোলিয়ন (Phascolion) নামে এক প্রকার সাইপানকিউলাস্ সমুদ্রের জলের 6000 ফুট গভীরে বাস করে।

(৭) **প্রায়াপুলিডা** (Priapulida)—সামুদ্রিক এই প্রাণীদের দেহের অগ্রভাগ বাহ্যিক দেহখণ্ডক-এ বিভক্ত। ইহাদের রেচনছিদ্র এবং জননছিদ্র পৃথক্। দেহটি মোটামুটিভাবে অগ্রভাগ এবং ধড়ে বিভক্ত। প্রায়াপিউলাস (Priapulus) নামক এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য সদস্যদের দেহের পশ্চাৎ প্রান্তে একজোড়া উপাংগ থাকে। ইহাদের জীবন-চক্রেও দৈহিক রূপান্তর আছে।

(৮) **পর্ব সন্ধিপদ প্রাণী** বা **আর্থ্রোপোডা** (Gk. Arthron=যুক্ত ; podos=পদ)—এই পর্বভুক্ত প্রাণীরা সকল প্রাণীদলের মধ্যে সংখ্যায় সর্ববৃহৎ। প্রায় ৭৪০,০০০ প্রজাতির প্রাণী এই দলভুক্ত। পাহাড়ের ২০,০০০ ফুট উপরে এবং ১৮,০০০ হাজার ফুট সমুদ্রগর্ভের নিম্নে পর্যন্ত ইহাদের বাস। মাটিতে, জলে, শূন্যে ইহাদের বাস। ইহাদের অনেকেই মানুষের অনেক কাজে লাগে। আবার অপকারও করে অনেকেই। ইহাদের পদগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে, কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ যুক্ত হইয়া এক একটি পদ গঠিত হইয়াছে। তাই, ইহাদের সন্ধিপদ নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের দেহ কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত এবং শক্ত পাত্‌লা এক **কৃত্তিকা** (Cutiole)* দ্বারা দেহটি আবৃত। ইহা নির্জীব। ইহাই ইহাদের বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton)। দেহ গঠনকালে যখন দেহ বৃদ্ধি পায়, তখন মাঝে মাঝে এই আবরণী বা খোলস ফাটিয়া যায় এবং পরে, আবার নিম্নের কোষ-স্তর (বহিঃকোষ স্তর) হইতে নূতন খোলস তৈয়ারী হয়। প্রথম অবস্থায় এই খোলস নরম থাকে, (বর্ষাকালের চিংড়িতে লক্ষণীয়) পরে ক্রমশঃ শক্ত হইয়া যায়। খোলস ছাড়ার (এবং তৈয়ারী হওয়ার) এই পদ্ধতিকে খোলস ত্যাগ বা এক্‌ডাইসিস্ (Ecdysis) বলে। প্রত্যেক খণ্ডে এক জোড়া

* দেহের চর্মের উপর কাইটিন (Chitin) নামক এক ধরনের জৈব (Organic substance) পদার্থ জমা হইয়া ইহা তৈয়ারী হয়। চিংড়ি প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে ইহাতে $CaCO_3$ জমা হইয়া শক্ত হয়।

উপাঙ্গ (Appendage) আছে। ইহাদের সাধারণতঃ মুখ-সংলগ্ন দুই পাশের উপাঙ্গ থাকে—তাহারা সংবেদনে সাহায্য করে। উপাঙ্গগুলি দেহের সহিত অংকভাগের দিকে যুক্ত থাকে। প্রাণিজগতের এই পর্বটি বিরাট। ইহাদের দেহের গঠন এইরূপ যে, দেহের মধ্যভাগ লম্বালম্বিভাবে কাটিলে তাহা দুইটি **সমান** অংশে বিভক্ত হইবে। পূর্বের পর্বগুলি অপেক্ষা এই পর্বভুক্ত প্রাণীদের তন্ত্রগুলি বিশেষভাবে সুগঠিত। ইহাদের দুই ধরনের চক্ষু দেখা যায়, **পুঞ্জাক্ষী** এবং **সরলাক্ষী**। জলজ প্রাণীরা সাধারণভাবে ফুল্‌কা ও স্থলচর প্রাণীরা বায়ুনল (Trachea) ও ফুসফুস-থলি (Pulmonary-sac) বা পুস্তকের ন্যায়-ফুসফুস (Book-lung) দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। দেহের গঠন ও বৈচিত্র্য অনুযায়ী ইহাদের **পাঁচটি** শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। যথা—

(১) **খোলকী** বা **ক্রাস্‌টেসিয়া** (Crustacea ; Crusta=শক্ত খোলা) :—

এই শ্রেণীর প্রাণীদের মাথায় দুইপাশে একটি করিয়া দুইটি শুঁড় (Antenna) থাকে। উপাংগগুলি **দ্বি-বাহুবিশিষ্ট** (Biramous) এবং দেহটি মস্তক ও বক্ষ লইয়া শিরোবক্ষ (Cephalothorax) অংশ এবং অপর একটি অংশ উদর, এই দুইটি অংশে বিভক্ত। শিরোবক্ষ অংশ একটি বৃহদাকার কৃত্তিকা দ্বারা আবৃত। ইহার নাম কারাপেস (Carapace) বা কৃত্তিকাবর্ম। পুষ্করিণী, নদী ও সমুদ্রে ইহাদের বাস। যথা—চিংড়ি, কাঁকড়া, সাইক্লোপস্‌, মাইসিস্‌ (Mysis), ব্যালেনাস (Balanus), স্কুইলা (Squilla) ইত্যাদি।

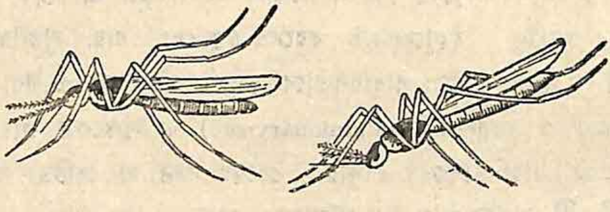
ইহাদের বেশীর ভাগই স্বাধীনজীবী। অবশ্য দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে অন্যপ্রাণীর সংগে সহাবস্থান করে কেহ-কেহ। আবার কিছু প্রাণী পরজীবী হিসাবে অনেক জলজপ্রাণীর দেহে বাস করে। তিমির (whale) দেহেও পরজীবী আছে কিছু খোলকী প্রাণী।

ফুল্‌কা দ্বারা ইহারা শ্বাসকার্য চালায়। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে।

ইহাদের জীবন-চক্রে বিভিন্ন ধরনের লার্ভার মাধ্যমে দৈহিক রূপান্তর হয়। চিংড়ি (গল্‌দা)-তে এই ধরনের কোন দৈহিক রূপান্তর নাই।

(২) **পতঙ্গ** বা **ষট্‌পদী** বা **ইন্‌সেক্টা** (Insecta ; incised—নির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত)—এই পর্বভুক্ত প্রাণীরা সংখ্যায় প্রায় 675,000। স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে ইহারাই সংখ্যায় সর্বাধিক। এই প্রাণীকুলটি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। ইহাদের দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর, এই তিনটি অংশে বিভক্ত।

বায়ুনল (Trachea) দ্বারা শ্বাসকার্য এবং মেলপিঘিয়ান (malpighian) নালীর দ্বারা রেচনকার্য সম্পন্ন করা ইহাদের বৈশিষ্ট্য। ইহাদের জোড়া ডানা থাকে। বক্ষ-সংলগ্ন তিনজোড়া সন্ধিল-পদ ইহাদের বৈশিষ্ট্য। ইহাদের পৌষ্টিক নালী অগ্র-মধ্য-পশ্চাৎ; এই তিনভাগে বিভক্ত। ইহাদের লালাগ্রন্থি আছে।



এনোফিলিস মশা কিউলেক্স

ইহারাও দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খোলস ছাড়ে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। সাধারণভাবে ডিম হইতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী সোজাসুজি জন্মায় অথবা আংশিক বা সম্পূর্ণ দৈহিক রূপান্তর হইতে পারে। যথা—পিপীলিকা, মশা, মাছি, প্রজাপতি, উইপোকা, ছারপোকা, ফড়িং, মৌমাছি, রেশম-মথ প্রভৃতি।

(৩) **বহুপদী** বা **মিরিয়াপোডা** (Myriapcda)—ইহাদের লম্বা, নলাকৃতি দেহটি পরিষ্কারভাবে কয়েকটি খণ্ডক বিভক্ত। 'শতপদী' (তেঁতুলে-বিছা) ও 'সহস্রপদী' (কেন্নো) জাতীয় প্রাণীদের লইয়া এই শ্রেণী গঠিত। তেঁতুলেবিছা (Scolopendra) প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বাসিন্দা এবং নিশাচর। ইহাদের জীবন-চক্রে দৈহিক রূপান্তর নাই। আমাদের দেশের তেঁতুলেবিছা সাধারণতঃ ৪ ইঞ্চি লম্বা হয়।



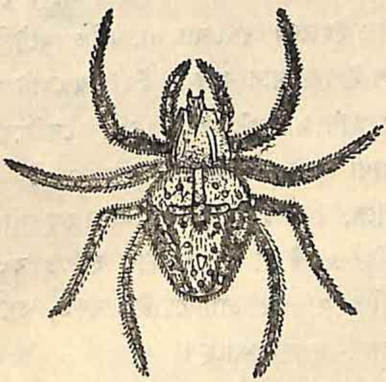
কেন্নো

কেন্নো (Julus)-এর পদ আরো বেশী, তাই ইহাদের সহস্রপদী বলে। ইহাদের খাদ্য সাধারণতঃ মৃত উদ্ভিদ্, অবশ্য ইহারা মধ্যে মধ্যে প্রাণীও খায়। আলো ইহারা পছন্দ করে না। ইহাদের দেহ হইতে একপ্রকার রস বাহির হইয়া ইহাদের শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে।

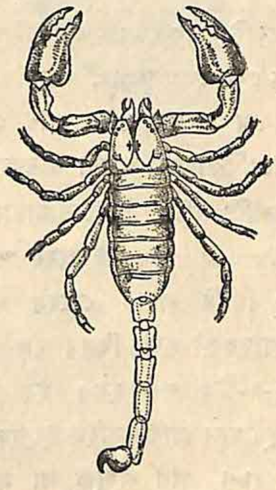
প্রায় ৩৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭০ পর্যন্ত পদ সংখ্যা এবং অনুরূপ খণ্ডক-এ ইহাদের দেহ বিভক্ত। মস্তক-সংলগ্ন এক জোড়া বহু-গাঁইটযুক্ত শুঁড় এবং

মস্তকের পরবর্তী খণ্ডক ও দেহের পশ্চাৎতম দুই খণ্ডক-এ কোন পদ না-থাকাই ইহাদের বৈশিষ্ট্য। যথা—কেন্নো প্রভৃতি।

(৪) **মাকড় বা অ্যারাক্‌নোয়ডিয়া** (Arachnoidea)—এই দলে বহু বিচিত্র প্রাণী আছে। ইহাদের বেশীর ভাগই স্বাধীনজীবী। ইহাদের অনেকেই কাঁকড়া-বিছা প্রভৃতি স্থলচর প্রাণী এবং বেশীরভাগই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের শুষ্ক আবহাওয়ায় বাস করে। অনেকেরই বিষগ্রন্থি ও বিষ-নখর আছে; ইহার সাহায্যে পতঙ্গ বা অন্যান্য খাদ্য-প্রাণীকে বধ করিয়া তাহাদের দেহ-রস (Body-fluid) ইহারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। মাকড়সা প্রভৃতি প্রাণীর জাল-বুনন্ গ্রন্থি আছে। ইহারা এই গ্রন্থি-রসের সাহায্যে রেশমের মিহি জাল বোনে।



মাকড়সা

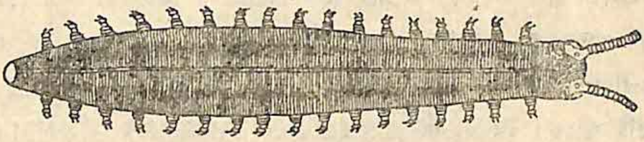


কাঁকড়াবিছা

ইহাদের মস্তকে কোন শুঁড় নাই। দেহ সাধারণতঃ শিরোবক্ষ ও উদর, এই দুই অংশে বিভক্ত। ইহাদের ছয় (৬) জোড়া উপাঙ্গ আছে। মাথার দুই পাশে এক জোড়া বড় দাড়া পেডিপাল্পি (pedipalpi) ও চেলিসরি (cheliceræ) নামে আর এক জোড়া, এই দুইজোড়া এবং চার (৪) জোড়া পদ (মোট ছয় জোড়া) উপাঙ্গ থাকে। ইহাদের পুরুষ ও স্ত্রী পৃথক্ এবং ১টি জননছিদ্র থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্বাসনালী, ফুসফুস-থলি ও ফুল্‌কা দ্বারা ইহাদের শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয়। ম্যালপিঘিয়ান নল ও কক্সাল গ্রন্থি-র (Coxal gland) সাহায্যে ইহারা রেচনকার্য চালায়। কখনও কখনও ইহাদের লেজের শেষ

খণ্ডকটি বিষাক্ত গ্রন্থিতে পরিণত হয়। যথা—মাকড়সা, কাঁকড়া-বিছা, ইত্যাদি। উল্লেখ করা যায় যে, কাঁকড়া বিছা কামড়ায় না, লেজের প্রান্তের হুল ফুটাইয়া দেয়। ইহাতে বিষ থাকে।

(৫) **ওনাইকোফোরা** (Onychophora ; Onychus=নখর ; Phorus=বহনকারী)—আদিম এই প্রাণিকুলের সদস্যগুলি লম্বায় প্রায়

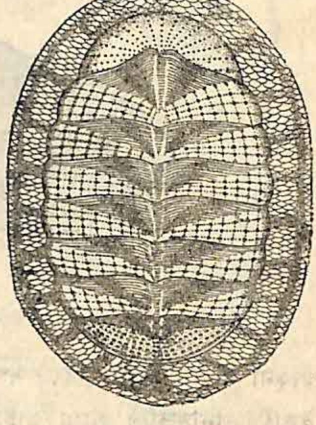


পেরিপেটাস (peripatus)

৫ সেন্টিমিটার হয়। স্বভাবে নিশাচর এই প্রাণীরা পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বা গাছের শুষ্ক খোলকের তলায়, নরম মাটিতে, অন্ধকারে বাস করে। আমাদের দেশে আসাম প্রদেশ ছাড়া আর কোথাও ইহাদের দেখা যায় না, যদিও অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং আরো অনেক দেশে ইহারা বাস করে। ইহাদের মোট ৭০টি প্রজাতি আছে। ইহাদের মাথায় একজোড়া মাত্র শুঁড় থাকে। যথা—পেরিপেটাস্ (Peripatus)। ইহাদের স্পষ্ট মাথা নাই। লম্বা নলাকৃতি দেহটি প্রায় 50 মি.মি লম্বা। দেহের অগ্রভাগে, পিঠের দিকে একজোড়া চক্ষু আছে। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন। বড় আকৃতির একটি স্ত্রী পেরিপেটাস হইতে বৎসরে ৩০-৪০টির জন্ম হয়। ইহারা যদিও সন্ধিপদ প্রাণিগোষ্ঠীর সদস্য, তথাপি, অঙ্গুরীমাল প্রাণীর সহিত ইহাদের বেশ কিছু মিল আছে।

(৮) **পর্ব শম্বুক বা মলাস্কা** (Mollis=নরম)—এই পর্বের প্রাণীর প্রজাতি-সংখ্যা প্রায় ৪৫,০০০ হাজারের মত। ইহারা সাধারণতঃ সামুদ্রিক প্রাণী, যদিও মিষ্টি জলেও কিছু সংখ্যক (ঝিনুক, গুগ্‌লী ইত্যাদি) পাওয়া যায়। কিছু কিছু সদস্য (বাগানের শামুক প্রভৃতি) মাটিতেও বাস করে। এই পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহের প্রতিসাম্য আছে, ইহাদের দেহ খণ্ডে-খণ্ডে বিভক্ত নয় বা দেহে কোন উপাঙ্গ নাই। সাধারণতঃ, ইহাদের দেহের আবরণ শক্ত এবং চূণ-জাতীয় পদার্থ জমিয়া গঠিত। ইহাদের গতি ধীর। পেশীবহুল-পদ ইহাদের বৈশিষ্ট্য। ইহাদের এইরূপ কোন কোন প্রাণীর অন্তঃকঙ্কাল (Endoskeleton) আছে। ইহাদের কেহ কেহ জলে (লোনা এবং মিষ্ট), আবার কেহ কেহ ডাঙ্গায় বাস করে। এই জাতীয় প্রাণীর দেহের কঠিন আবরণ (Exoskeleton)

হইতে শঙ্খ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, শামুক, ঝিনুক, গুগ্‌লী, অক্টোপাস, সিপিয়া প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ (শম্বুক প্রভৃতি) নিজেদের দেহ-নিঃসৃত রসদ্বারা তৈয়ারী খোলকের ভিতর আবদ্ধ থাকে। খোলকের ভিতরেই একটি পাত্‌লা পর্দার সাহায্যে দেহটি আবৃত থাকে। এই পর্দাটির নাম ম্যাণ্টেল্ (Mantle) পর্দা। ইহাদের পদটি অসাধারণভাবে রূপান্তরিত হইয়া জীবনের প্রয়োজনীয় নানা কার্য সমাধা করে। ইহাদের অন্ত্র সাধারণতঃ পাকানো হয়, ফুস্‌ফুস্ কিংবা ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাসকার্য চলে। ইহাদের হৃৎপিণ্ড দুই বা তিনভাগে বিভক্ত। গ্রন্থিময় একটি বা এক-জোড়া নল অথবা থলির সাহায্যে রেচনকার্য সম্পন্ন হয়। ইহাদের সাধারণতঃ পুরুষ ও স্ত্রী বর্তমান। কেহ কেহ উভলিঙ্গ। এই পর্বটি **পাঁচটি** শ্রেণীতে বিভক্ত।



কাইটন (Chiton)

(১) অ্যাম্ফিনিউরা (Gr. Amphi=উভয়, Neuron=স্নায়ু)।

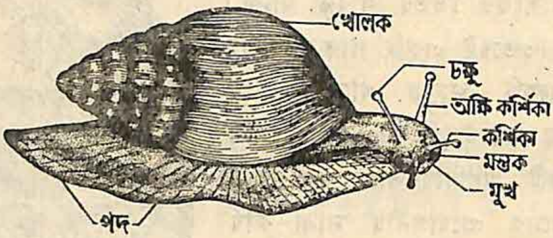
কিটোডার্মা, কাইটন প্রভৃতি প্রাণিগণ এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের দেহেও ক্ষয়প্রাপ্ত পদ আছে। উল্লেখযোগ্য যে, কিটোডার্মা প্রায় ২৫ মিলিমিটার লম্বা এবং খোলক-বিহীন ; অপরপক্ষে, কাইটনের দেহের উপর আটটি পৃথক্ খোলক সন্নিবিষ্ট। সমুদ্রের ধারে, প্রবালের উপর, পাথরের আড়ালে, অগভীর জলে ইহারা বাস করে।

(২) স্ক্যাফোপোডা (Skaphe=নৌকা ; Podos=পদ)।

সামুদ্রিক এই প্রাণীদের দেহটি লম্বালম্বিভাবে খোলক দ্বারা আবৃত এবং ইহার দুইপ্রান্ত দেখিতে উন্মুক্ত নলের মত। ইহারা আংশিকভাবে দেহটিকে কাদা অথবা বালির মধ্যে ঢুকাইয়া রাখে। ইহার মস্তকটি স্পষ্ট নহে, চক্ষু নাই এবং নলের ন্যায় পদটির সাহায্যে ইহারা মাটি খুঁড়িতে পারে। মুখের চারিধারে কয়েকটি কর্শিকা (Tentacle) সাজান থাকে। আকৃতিতে খোলকগুলিকে অনেকটা হাতীর দাঁতের মতো দেখিতে ; অবশ্য আকারে ১"-র মত। সমুদ্রের জলে প্রায় ১৫ হাজার ফুট নীচে পর্যন্ত ইহারা বাস করে। ডেণ্টেলিয়াম (Dentalium) এই শ্রেণীর অন্যতম সর্বাধিক পরিচিত প্রাণী।

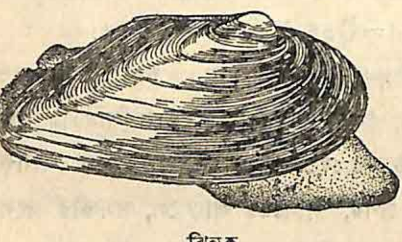
(৩) গ্যাসট্রোপোডা (Gk. Gaster=উদর ; Podos=পদ)।

নাম হইতেই বোঝা যায় যে, ইহাদের অন্ত্র পদের মধ্যে অবস্থিত। অন্ত্রটি প্যাঁচানো এবং পদটি মাংসল, চ্যাপ্টা ও স্থূল। খোলকবর্মাবৃত দেহটি একটি



স্থলচর শামুক

ঢাক্‌না দ্বারা বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিছিন্ন থাকে। দেহের খোলক একটি। ইহাই নানান্‌ভাবে প্যাঁচ খাইয়া নানারকমের হয়। ইহাদের মাথাটি স্পষ্ট। ইহাদের দুই পার্শ্বে মোট দুইটি কর্শিকা থাকে। একটি করিয়া চোখ অক্ষিকর্শিকায় বসান ও একটি করিয়া সাধারণ কর্শিকা থাকে। আমাদের সচরাচর চোখে-দেখা মিষ্টি জলের গেঁড়ী, গুগ্‌লী, শামুক প্রভৃতি প্রাণী হইতে শুরু করিয়া সামুদ্রিক নানা প্রাণী এই শ্রেণীভুক্ত।

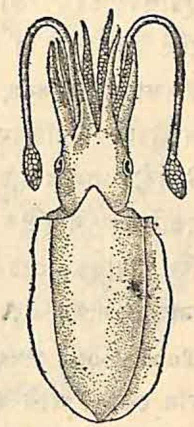


ঝিনুক

(৪) পেলিসাইপোডা (Gr. Pelekys=টাঙ্গি ; Podos=পদ)

ইহারা সকলেই জলে বাস করে, বেশীর ভাগই সামুদ্রিক এবং প্রধানতঃ জলের তলায় থাকে। মানুষ একধরনের ঝিনুক খাইয়া থাকে। মুক্তা, এক মূল্যবান রত্ন ; বিশেষ ধরনের ঝিনুকের দেহের মধ্যে জন্মায়। সাধারণভাবে ইহারা সকলেই স্বাধীনজীবী, তবে এণ্টোভাল্‌ভা (Enntovalva) নামে এক ধরনের এই জাতের প্রাণী কণ্টকত্বক্ (সমুদ্র শশা) প্রাণিদেহে পরজীবী প্রাণী হিসাবে বাস করে। দুইটি সমান খোলকের মধ্যে নরম-দেহী এই প্রাণীগুলি আবদ্ধ। খোলকটির দুইপার্শ্ব চাপা, ইহাদের দেহটি দুইধার হইতে চ্যাপ্টা হওয়ার ফলে পদটি অনেকটা উপরের দিকে উঠিয়া আসিয়াছে। ইহাদের

মস্তক, কর্শিকা, এবং চোয়াল স্পষ্ট নাই। কতকগুলি, লম্বা আকারের ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। মিষ্টজলের পুষ্করিণী প্রভৃতিতে আমাদের পরিচিত ঝিনুক (Unio), সামুদ্রিক টেরিডো (Teredo) ও মাইটিলাস (Mytilus) প্রভৃতি এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য সদস্য।

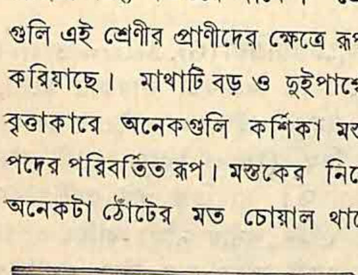


সিপিয়া (Sepia)

(৪) **কেফালোপোডা** (Gr. Kephale= মস্তক ; podos=পদ)।

শম্বুক পর্বের সকল শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে ইহারাই সর্বাপেক্ষা উন্নত। ইহারাও সকলেই সামুদ্রিক প্রাণী। এই শ্রেণীর কোন কোন প্রাণীকে (ললিগো) কোন কোন দেশের মানুষ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। অক্টোপাস (Octopus) 2 ইঞ্চি থেকে 24 ফুট পর্যন্ত হয়। এই পর্বের প্রাণীদের স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন।

এই শ্রেণীর প্রাণীদের দেহে সাধারণতঃ খোলক থাকে না ; আর থাকিলেও বাহিরে নহে, ভিতরে থাকে। শ্রেণীর নাম হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পদগুলি এই শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়া মস্তকের সন্নিকটে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। মাথাটি বড় ও দুইপার্শ্বে একটি করিয়া দুইটি বড় বড় চক্ষু বিদ্যমান। বৃত্তাকারে অনেকগুলি কর্শিকা মস্তকের চতুর্দিকে আছে এবং এই কর্শিকাগুলি পদের পরিবর্তিত রূপ। মস্তকের নিম্নে একটি গোলাকার নল ও মুখছিদ্রের ভিতর অনেকটা ঠোঁটের মত চোয়াল থাকে। সিপিয়া, ললিগো ও অক্টোপাস এই শ্রেণীরই কয়েকটি প্রাণী। উল্লেখযোগ্য যে, অকর্ডাটা প্রাণিকূলের ভিতর অক্টোপাসই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাণী। পুরী, দীঘা ও মাদ্রাজ প্রভৃতির সমুদ্রের উপকূলে এই শ্রেণীর অনেক প্রাণী দেখা যায়।

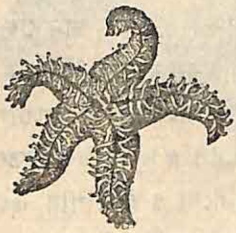


অক্টোপাস

(৯) **পর্ব অ্যাকাইনোডার্মাটা** (Gk. Echinos=গুটিযুক্ত ; Dermis =চামড়া)।

ইহারা সামুদ্রিক প্রাণী। এই পর্বের প্রাণীদের দেহ ½ ইঞ্চি হইতে প্রায় 3 ফুট পর্যন্ত হয়। ক্যালসিয়াম কার্বনেট জাতীয় পদার্থের দ্বারা আচ্ছাদিত দেহের উপর কাঁটা বা গুটি দেখা যায়। ইহাদের দেহ কঠিন এবং পূর্ণাংগ বয়সে অরীয়ভাবে প্রতিসম, কিন্তু গঠনপথে, (লার্ভা অবস্থায়) অপরিণত-দেহ দ্বিপার্শ্বীয়রূপে প্রতিসম থাকে। ইহাদের অনেকেরই মাথা ও পদহীন দেহটি ৫টি অরীয় নালীর দ্বারা বিভক্ত হইয়া ৫টি অরীয় এবং ৫টি অন্তরীয় অঞ্চলে বিভেদিত। সামুদ্রিক এই প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড নাই, সংবহনতন্ত্র ক্ষয়প্রাপ্ত বা অতি সাধারণ; রেচন প্রক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন অংগ নাই। শ্বাসকার্য নানাভাবে সম্পন্ন করে নানা ধরনের প্রাণী। ফুল্‌কা (খুব ছোট); টিউব পদ (Tube foot) অথবা এমনকি অবসারণীর মধ্যে অবস্থিত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যেও কোন কোন প্রাণী (সমুদ্র-শশা) শ্বাসকার্য চালায়। খণ্ডিত অবস্থা হইতে ইহারা অতি সহজেই পূর্ণাংগ অবস্থায় পরিণত হইতে পারে। এই (কণ্টকত্বক্) পর্বকে দুইটি অধঃ-পর্বে ও **পাঁচটি** শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

(ক) অধঃপর্ব **এলুথেরোজোয়া** (Elutherozoa)—এই সকল কণ্টকত্বক্ প্রাণীর দেহে কোন বোঁটা (Stalk) বা দেহকাণ্ড নাই। ইহার অধীনে চারিটি শ্রেণী আছে। যথা:—



তারামাছ

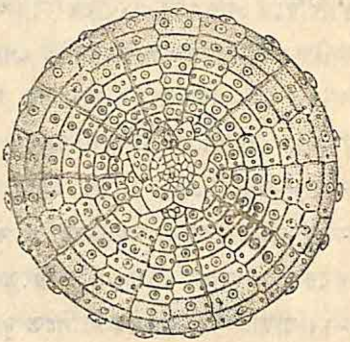
(১) **অ্যাস্‌টেরয়ডিয়া** (Gr. Aster=তারা)। এই প্রাণীরা দেখিতে অনেকটা তারকার মতো, তাই, তারামাছ নাম। এই সকল প্রাণীদের দেহের একটি কেন্দ্রীয় ডিস্ক্ (Disc) হইতে পাচটি বাহু অরীয়ভাবে প্রসারিত। সামুদ্রিক এই প্রাণীগুলির মুখগহ্বর হইতে **৫টি*** অরীয় নালী বাহির হইয়া প্রত্যেকটি এক একটি বাহুর মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়াছে। নালীর দুই পার্শ্বে সারিসারি অনেক তথাকথিত পদ বিদ্যমান। এই পাচটি বাহু অরীয়ভাবে পাঁচদিকে চলিয়া গিয়াছে। উদাহরণ, 'তারামাছ'। তারামাছ দিনের বেলায় বেশীর ভাগ সময় শান্ত ভাবে কঠিন কোন বস্তুতে নিজের দেহ আট্‌কাইয়া রাখে।

ইহারা শম্বুকজাতীয়, খোলকী, প্রভৃতি অনেক অ-মেরুদণ্ডী প্রাণী খায়। যাহারা গভীর জলে বাস করে তাহারা নরম মাটি ও কাদা খাইয়া থাকে। ক্ষুদ্র অন্ত্রের সাহায্যে ইহারা প্রধানতঃ রেচন কার্য সম্পন্ন করে।

* কখনও কখনও ৬টি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০টি পর্যন্ত বাহু-বিশিষ্ট তারামাছ দেখা যায়।

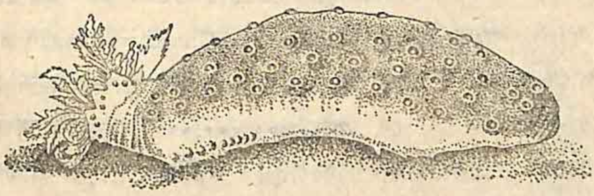
অফিউরয়ডিয়া (Gr. Ophis=সর্প)—সরু, পাত্‌লা এবং অনেকগুলি গাঁইটযুক্ত এই প্রাণীর বাহুর সংখ্যা পাঁচটি। ইহার কেন্দ্র অঞ্চল সুস্পষ্ট, কখনো কখনো বাহুগুলি পুনরায় বিভক্ত হইয়াছে। উদাহরণ—ব্রিটল্‌স্টার (Brittle-star)।

(৩) **একাইনয়ডিয়া** (Gr. Echinus=কাঁটাযুক্ত)। ইহারা দেখিতে অনেকটা গোলাকার বা চ্যাপ্টা চাক্‌তির মতো। এই প্রাণীগুলির কোন বাহু নাই। ইহাদের পৌষ্টিক নালী পাকানো, এবং করোনার (corona) ত্বক্ হইতে অনেকগুলি কাঁটা জন্মায় এবং এইগুলি নানাদিকে নড়াচড়া করে। সি-আরচিন (sea-urchin) এই ধরনের প্রাণীর উদাহরণ।



সি-আরচিন (Sea-urchin)-এর করোনা (Corona) [উপর হইতে দেখা]

(৪) **হলোথুরয়ডিয়া** (Gr. Holothurion=সমুদ্র-শশা)—আকারে লম্বা, বাহুহীন, এই প্রাণীদের দেহের অগ্রভাগে মুখছিদ্র বর্তমান এবং ইহাকে ঘিরিয়া কতকগুলি কর্শিকা (tentacles) বাহির হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়। ইহাদের পায়ুছিদ্র দেহের পশ্চাৎভাগে। কাঁটা বা ঐ জাতীয় কোন অংগ ইহাদের নাই।

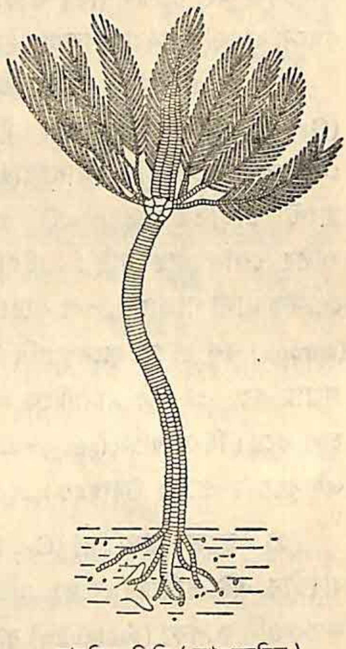


সমুদ্র-শশা

চামড়া নরম ও মাংসল। চামড়ার ভিতর স্পিকিউল (Spicule) নামক একপ্রকার কঠিন বস্তু থাকে। ইহাদের অবসারণীর ভিতরে শ্বাসযন্ত্র বিদ্যমান। সমুদ্র-শশা (Sea-cucumber) এই শ্রেণীর প্রাণী।

(খ) **অধঃপর্ব পেলমেটোজোয়া** (Pelmatozoa)—যে সকল কণ্টকত্বক্ প্রাণীদের দেহে বোঁটা (stalk) বা দেহকাণ্ড আছে তাহারা ইহার অন্তর্গত। ইহার অধীনে একটিমাত্র শ্রেণী আছে। যথা :—

(৫) **ক্রাইনয়ডিয়া** (Gr. Krinon=পদ্ম)—পুষ্প-সদৃশ এই সকল প্রাণী-দেহ আকারে নলের মতো ও গোলাকার। অগ্রভাগে অবস্থিত মুখছিদ্রের চারিদিকে বাহুগুলি অরীয়ভাবে আছে। অধিকসংখ্যায় বিভক্ত বাহুগুলির শেষপ্রান্ত আরও বেশী বিভক্ত। লম্বা, বহু গাঁইট-বিশিষ্ট দেহকাণ্ডের পিছন হইতে অতি সূক্ষ্ম সিরি (Cirri) বাহির হইয়া কোন বস্তুর সহিত ইহাকে আটকাইতে সাহায্য করে। ইহারা চলাফিরা করিতে পারে না। সারাজীবন সমুদ্রের বালিতে দৃঢ়ভাবে নিজেদের আট্‌কাইয়া রাখে। ইহারা দেখিতে খুব সুন্দর। সামুদ্রিক লিলি এই শ্রেণীর অন্যতম উদাহরণ।



সামুদ্রিক-লিলি (কাণ্ডসমন্বিত)
[Sea-lily, (Stalked)]

এ্যান্টিডন (Antidon) [Feather-star] দীর্ঘ বাহুর সাহায্যে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়।

এই শ্রেণীর বর্তমানে প্রায় ৮০০টি প্রজাতি জীবিত আছে। ইহারা সমুদ্র-গর্ভে প্রায় ১২০০ ফুট পর্যন্ত বাস করে।

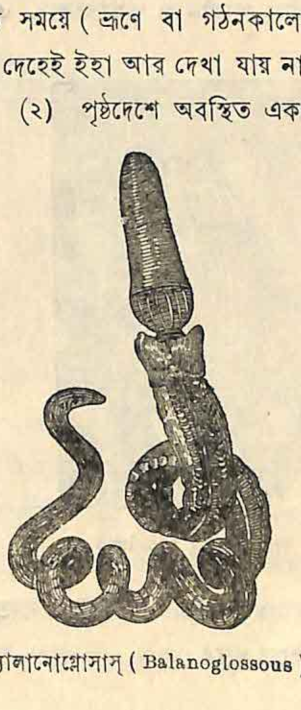
(ii) **পর্ব কর্ডাটা** [(Chordata) ; Chord=(sting) দণ্ড]—ঠিক কতদিন আগে অ-কর্ডাটা প্রাণী হইতে কর্ডাটা প্রাণী পৃথিবীতে আসে, তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে, প্রায় ৬০০,০০০,০০০ বছর আগেও কর্ডাটা প্রাণীর অস্তিত্বের কথা নাকি জানা গিয়াছে। কর্ডাটা শ্রেণীভুক্ত প্রাণীরা চারিটি উপ-পর্বে বিভক্ত। নিম্নস্তরের কর্ডাটা প্রাণীগুলি ও মেরুদণ্ডী সকল প্রাণী লইয়া কর্ডাটা পর্ব গঠিত। বিভিন্ন আকৃতি ও চরিত্রের কর্ডাটা প্রাণী বিচিত্র ও বিভিন্ন পরিবেশসমূহে বাস করা সত্ত্বেও ইহারা সকলেই একটিমাত্র পর্ব (কর্ডাটা) মধ্যে আবদ্ধ শুধুমাত্র এই কারণে যে, নোটোকর্ড-শীর্ষক কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ইহারা আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। নিম্নে সাধারণভাবে ইহাদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে সকল প্রাণীর **মেরুদণ্ড** আছে অর্থাৎ দেহের ভিতরে পিঠের দিকে লম্বালম্বিভাবে একটি অপেক্ষাকৃত শক্ত হাড়ের কাঠির মত

একটি **শিরদাঁড়া** আছে, তাহাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। শিরদাঁড়া শক্ত হাড় দ্বারা তৈয়ারী। কিন্তু দেহ-গঠনের শুরুতে ইহার স্থানে একটি নরম কাঠির মতো বস্তু থাকে, তাহাকে **নোটোকর্ড** (Notochord) বলে। শরীর গঠনের কালে ক্রমশঃ একটি শক্ত হাড় গড়িয়া উঠে এবং নোটোকর্ডের স্থলাভিষিক্ত হয়, তখন তাহাকে বলে **মেরুদণ্ড** (Vertebral column)। ইহা কয়েকটি **কশেরুকা** (Vertebra) দ্বারা গঠিত। অমেরুদণ্ডী প্রাণী হইতে মেরুদণ্ডী প্রাণী গঠিত হইলেও কয়েকটি প্রাণী আছে, যাহাদের এই নোটোকর্ড জীবনে কোন স্তরেই অপসারিত হইয়া মেরুদণ্ড গঠিত হয় না। এই ধরনের প্রাণীকে নিম্নস্তরের কর্ডাটা প্রাণী বা **লোয়ার কর্ডাটা** (Lower chordata) বলে। ইহারা সকলেই সামুদ্রিক প্রাণী। সমুদ্রের জলে, উপকূলে এবং বেলাভূমিতে ইহাদের বাস। বলাবাহুল্য, লোয়ার কর্ডাটা (সারাজীবন নোটোকর্ড-বিশিষ্ট) এবং মেরুদণ্ডী প্রাণী (পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট) উভয়েই কর্ডাটা (chordata) নামে অভিহিত ও একই পর্বভুক্ত। কর্ডাটা প্রাণীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে (১) গলদেশে **গলবিলের** (pharynx) **ছিদ্রসমূহ** উল্লেখযোগ্য। শ্বাস-কার্যের জন্য এই ছিদ্র থাকে। পূর্ণাবয়ব সকল মেরুদণ্ডীর দেহে এই ছিদ্রের দেখা না মিলিলেও জীবনের কোন-না-কোন সময়ে (ভ্রূণে বা গঠনকালে) ইহারা বর্তমান থাকে। জন্মের পর অনেকের দেহেই ইহা আর দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মাছে ও ব্যাঙাচিতে ইহা স্পষ্ট। (২) পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত একটি মাত্র **ফাঁপা নার্ভরজ্জু** কর্ডাটা প্রাণীর অন্যতম বিশেষত্ব। (৩) দেহের মধ্যস্থ গহ্বর (**দেহ-গহ্বর**—Body-cavity) ইহাদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। (৪) পায়ুছিদ্রের পরবর্তী অংশ **লেজরূপে** বিদ্যমান।

প্রায় ৩ লক্ষ ২ হাজারের মত প্রাণী এই পর্বে আছে। নিম্নলিখিত **চারিটি** উপ-পর্বে কর্ডাটা বিভক্ত।

(ক) উপ-পর্ব **হেমিকর্ডাটা** (Hemichordata ; Hemi=অর্ধ বা অসম্পূর্ণ) ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন।


ব্যালানোগ্লোসাস্ (Balanoglossous)

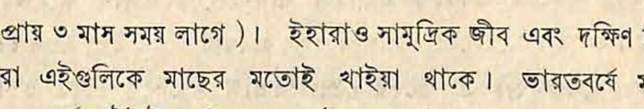
কোন কোন প্রাণীর জীবনে গঠনের পথে দৈহিক রূপান্তর আছে। টরনেরিয়া লার্ভার (Tornaria Larva) মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী এই সব ক্ষেত্রে গঠিত হয়। ইহাদের শরীরের অভ্যন্তরে দেহের অগ্রভাগে একটি স্থানে নোটোকর্ড সীমাবদ্ধ; যথা—ব্যালানোগ্লোসাস্। ভারতবর্ষের মান্নার উপসাগরে ও ক্রুসেডাই দ্বীপে ইহাদের কিছু কিছু পাওয়া যায়। ইহাদের দেখিতে অনেকটা কেঁচোর মতো। দেহটি মোটামুটিভাবে ৩টি ভাগে বিভক্ত। প্রায় ৭০টি প্রাণী এই উপ-পর্বভুক্ত। ইহাদের অনেকের দেহ হইতে (আয়োডিনের ন্যায়) গন্ধ বাহির হয়।

(খ) উপ-পর্ব **ইউরোকর্ডাটা** (Urochordata)—এই প্রাণীরা মেরু অঞ্চল হইতে সুরু করিয়া উষ্ণমণ্ডল পর্যন্ত সর্বত্রই সমুদ্রে বাস করে। অনেকেই সমুদ্রের জলের উপরে তীরের কাছাকাছি বাস করে, আবার কেহ কেহ সমুদ্রের মধ্যে তিন (৩) মাইল গভীরে পর্যন্ত বাস করে। ইহাদের কেহ কেহ স্বাধীনজীবী, আবার কেহ কেহ পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় চলাফিরা করিতে পারে না; কোন বস্তুতে আট্‌কাইয়া থাকে। কখনও কখনও কয়েকটি প্রাণী একসঙ্গে একটি সাধারণ কৃত্তিকা (Tunic) দ্বারা আবৃত থাকে। ইহারা যৌগিকপ্রাণী; যৌন, অযৌন ও অঙ্কুরোদগম, এই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইহাদের প্রজনন হয়। ইহাদের জন্মের শুরুতে লার্ভা (larva) অবস্থায় শরীরের অভ্যন্তরে পিঠের দিকে লম্বালম্বিভাবে একটি নোটোকর্ড থাকে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহা দেহের মধ্যে মিলাইয়া যায়। যথা—অ্যাসিডিয়া (Ascidia), ডলিওলাম (Doliolum) প্রভৃতি। ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরেও ইহাদের পাওয়া যায়। ইহাদের দেহ কৃত্তিকার (টিউনিক =Tunic) দ্বারা আবৃত বলিয়া ইহাদের টিউনিকাটা (Tunicata) বলা হয়। এই কৃত্তিকা ইহাদের দেহ-নিঃসৃত রস দ্বারা তৈরী একটি থলি বিশেষ। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দীঘার সমুদ্র-উপকূলে কিছু কিছু অ্যাসিডিয়া পাওয়া যাইতে পারে।



অ্যাসিডিয়া (Ascidia)

(গ) **কেফালোকর্ডাটা** (Cephalochordata ; Cephalon = মস্তক)—ইহাদের জীবনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একটি নরম কাঠির মতো নোটোকর্ড **মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত বিভ্যমান** থাকে। ইহাদের দেহে যদিও মাথা, ধড় ও লেজ এই তিনটি অংশই সুস্পষ্ট, তথাপি, যথার্থ সুস্পষ্ট মস্তক ইহাদের নাই এবং সমস্ত দেহটি অংশতঃ স্বচ্ছ। বিশেষ ধরনের পেশীস্তরের সাহায্যে দেহটি গঠিত। দেহে পৃষ্ঠ-পাখনা, লেজ-সংলগ্ন পাখনা ও অংকীয় পাখনা আছে। মুখকে ঘিরিয়া একটি অর্ধ-স্বচ্ছ ঢাক্না এবং তাহাকে ঘিরিয়া কর্শিকার মতো সিরি (cirri) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় তিরিশটি (৩০) প্রজাতি লইয়া এই উপ-পর্ব গঠিত। উষ্ণমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্র উপকূলে ইহাদের বাস। সমুদ্র উপকূলের বালুকামধ্যে ইহারা সাধারণ অবস্থায় দেহের কিছুটা (পশ্চাৎ অংশ) ঢুকাইয়া রাখিয়া মুখ-সমেত দেহের অগ্রভাগ বাহির করিয়া খাদ্যবস্তু সংগ্রহের আশায় অপেক্ষা করে। এই খাদ্যবস্তু সমুদ্রের জলের সহিত আসে। এই উপ-পর্বের মধ্যে ব্র্যাংকিওস্টোমা (Branchiostoma) বা অ্যামফিয়ক্সাস (Amphioxus) সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ পৃথক্ (ডিম হইতে লার্ভা এবং লার্ভা রূপান্তরিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ প্রাণী গঠিত



অ্যাম্ফিয়কসাস্

হইতে প্রায় ৩ মাস সময় লাগে)। ইহারাও সামুদ্রিক জীব এবং দক্ষিণ চীনের লোকেরা এইগুলিকে মাছের মতোই খাইয়া থাকে। ভারতবর্ষে মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত টিউটিকোরিনের সমুদ্র উপকূলেও ইহাদের পাওয়া যায়।

(ঘ) যে সকল কর্ডাটা প্রাণীদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক শক্ত হাড়ের একটি করোটির (skull) ভিতর বিশেষ একটি বাক্সের (cranium or brain-box) মধ্যে রক্ষিত এবং সুষুম্না কাণ্ডটি (spinal column) একটি শক্ত হাড়ের মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত, তাহারা সকলেই **মেরুদণ্ডী প্রাণী**। এই মেরুদণ্ডটি কয়েকটি খণ্ডকে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ডক এক-একটি পৃথক্ পৃথক্ শক্ত হাড়ের **কশেরুকা** (vertebra), পরপর জোড়া লাগাইয়া গঠিত। প্রত্যেক মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহ অবশ্যই (১) মাথা, (২) ঘাড়, (৩) ধড় এবং (৪) লেজ—এই চারিটি

ভাগে বিভক্ত। উপ-পর্ব **মেরুদণ্ডী** (Vertebrate) প্রাণীদের প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

(ক) **চোয়ালবিহীন** (Jawless) বা **অ্যাগ্‌নাথা** (Agnatha) এবং (খ) **চোয়ালযুক্ত** বা **ন্যাথোস্‌টোমাটা** (Gnathostomata)। অর্থাৎ শক্ত হাড়ের চোয়াল থাকা বা না-থাকার উপর ভিত্তি করিয়া এই ভাগ করা হইয়াছে।

(ক) অ্যাগ্‌নাথা-দলভুক্ত প্রাণীদের ভিতর সাইক্লোসটোম (cyclostome) [cyklos=গোল ; stoma=মুখ] প্রভৃতি প্রাণীরা আছে। ইহাদের মুখ গোলাকৃতি। যথা—হ্যাগ ফিস (Hag fish), ল্যামপ্রে (Lamprey) প্রভৃতি।

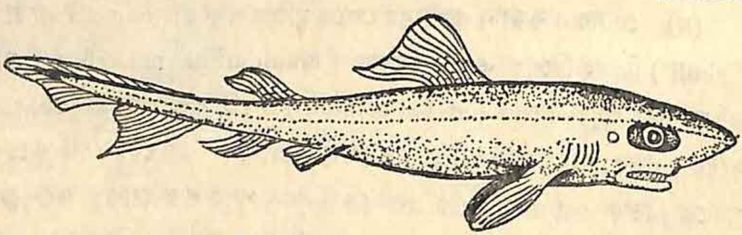
(খ) ন্যাথোস্‌টোমাটার মধ্যে দৃশ্যজগতের যাবতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণী অন্তর্ভুক্ত। যথা—

(১) মৎস্য, (২) উভচর, (৩) সরীসৃপ, (৪) পক্ষী এবং (৫) স্তন্যপায়ী।

ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি দলভুক্ত প্রাণীদের দেহে **শীতল** রক্ত প্রবাহিত হয় ; তাই, ইহাদের শীতল-রক্ত-বিশিষ্ট প্রাণী (Poikilothermus) বলে। শীতল রক্ত-প্রবাহিত প্রাণিদেহে **উত্তাপ সংরক্ষণের** কোনো ব্যবস্থা নাই।

পরবর্তী দুইটি দলভুক্ত প্রাণিদেহে **উষ্ণ-রক্ত** প্রবাহিত হওয়ায় তাহাদের উষ্ণ-রক্ত-বিশিষ্ট প্রাণী (Homœothermus) বলা হয়। সুতরাং, শীতল-রক্ত-প্রবাহিত প্রাণীদের ন্যায় আবহাওয়ার উষ্ণতার তারতম্যের ফলে ইহাদের দেহের উত্তাপের বিশেষ কোনো পার্থক্য ঘটে না। তুষার অঞ্চলের এবং মরুর নিকটবর্তী অঞ্চলের উষ্ণ-রক্ত-প্রবাহিত প্রাণিদেহের উত্তাপ অনেকটা একই প্রকার। বলাবাহুল্য, দেহের উত্তাপ-সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

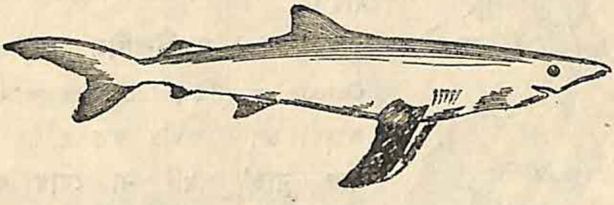
নিম্নে **মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ** সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল। শ্রেণী (১) **সাইক্লোস্‌টোমাটা বা অ্যাগ্নাথা** (Cyclostomata or Agnatha ;



আদিম মেরুদণ্ডী মৎস্যের জীবাশ্ম

A=ব্যতীত ; Gk. Gnathos—চোয়াল)—ইহারা আঁইশবিহীন, কিন্তু, মাছের

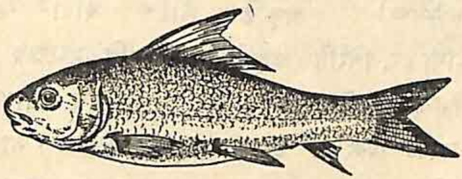
ন্যায় গোলাকার লম্বা দেহবিশিষ্ট। মুখছিদ্রটি গোলাকার এবং চোয়াল-বিহীন। ইহাদের লম্বা দেহটি অনেকটা পাঁকাল মাছের মত। অগ্রপ্রান্তে গোলাকার মুখটি



হাঙর

একটি চোষকের ন্যায়, ইহার চারিধারে মাংসল (চুলের মত) সূক্ষ্ম, ছোট ছোট কর্শিকা আছে। শুধুমাত্র দেহের মধ্যরেখার উপর পাখ্না থাকে। পাখ্নাতে ফিন-রে (Fin-ray) নাই। দেহের দুইপাশে ফুল্কা-ছিদ্র থাকে, কিন্তু নাসারন্ধ্র মাত্র একটি। সামুদ্রিক এই প্রাণীগুলির মধ্যে হ্যাগ্ফিস্ (Hag-fish) ও ল্যামপ্রে (Lamprey) সমধিক পরিচিত।

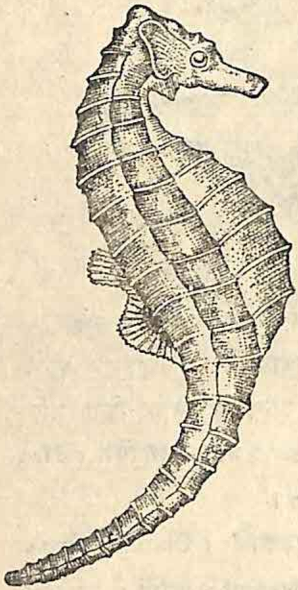
শ্রেণী (২) **কনড্রিক্থিস্ বা ইলাসমোব্রাংকাই** (Chondricthyes ; Chondros = কোমলাস্থি ; icthys = মাছ, or Elasmobranchii ; Elasmos



রুইমাছ

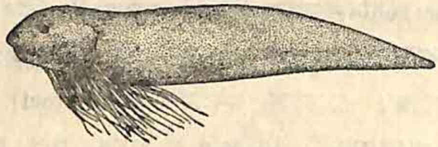
= ধাতব প্লেট ; Branchia = ফুলকা)—ইহারা তরুণাস্থি-বিশিষ্ট এক ধরনের মাছ। ইহাদের দেহে ফিন-রে যুক্ত পাখ্না আছে এবং মুখছিদ্রটি দুইটি শক্ত চোয়াল দ্বারা আবদ্ধ। চোয়ালে এনামেলের (Enamel) আস্তরণ দেওয়া দাঁত বসান। প্লাকোয়েড (Placoid) নামক ক্ষুদ্র **কণ্টক আঁইশ** দ্বারা ইহাদের দেহ আবৃত। ইহাদের পাঁচ জোড়া ফুল্কাছিদ্র থাকে। সামুদ্রিক এই প্রাণীদের মধ্যে বহু বিচিত্র দেহাকৃতি দেখা যায়। সাধারণ উদাহরণ হিসাবে হাঙরের নাম উল্লেখযোগ্য। হাঙর (shark) সাধারণতঃ লম্বায় ৩ ফুট হয়। কিন্তু, আরো বড় নানান্ মাপের হাঙর আছে। ইহাদের মধ্যে তিমি হাঙর (Whale Shark) লম্বায় ৫০ ফুট

পর্যন্ত হয়। তিমি ছাড়া ইহারাই বর্তমান দিনের সর্ববৃহৎ মেরুদণ্ডী প্রাণী। উল্লেখযোগ্য যে, হাঙরও একধরণের মাছ।



ঘোড়া মাছ (sea-horse)

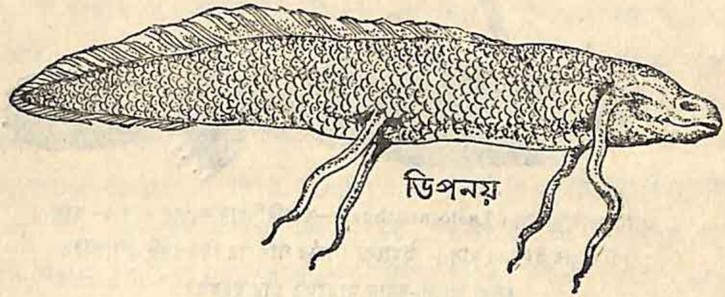
শ্রেণী (৩) **অস্‌টিক্‌থিস্‌** (Osteicthyes; Osteon = অস্থি ; Ichthyes = মৎস্য)—আমরা চল্‌তি কথায় কত প্রাণীর নামের সঙ্গে 'মাছ' শব্দটি না যোগ করেছি। 'রূপালীমাছ', (Silver fish) (এক ধরনের সন্ধিপদী প্রাণী) 'তারা মাছ', (কণ্টক-ত্বক্‌ প্রাণী), 'তিমি মাছ' (স্তন্যপায়ী প্রাণী) ইত্যাদি। বস্তুতঃ, ইহারা কেহ-ই মাছ নহে। যাহা হউক, আমাদের সচরাচর চোখে-দেখা সকল মৎস্যই এই শ্রেণীভুক্ত। অস্থিদ্বারা ইহাদের দেহকংকাল গঠিত এবং টিনয়েড্‌ বা সাইক্লোয়েড বা গ্যানোয়েড্‌ প্রভৃতি আঁইশ দ্বারা ইহাদের দেহ আবৃত। উল্লেখযোগ্য যে, শিংগি প্রভৃতি কতকগুলি মৎস্যের দেহে কোনো আঁইশ নাই। ফিন-রে নির্মিত জোড় এবং বিজোড় পাখনার সাহায্যে ইহারা সাঁতার কাটে এবং 4 জোড়া ফুল্‌কার (gill) সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। ফুল্‌কাগুলি কান্‌কুয়া (operculum) দ্বারা ঢাকা। সমুদ্রে ও



প্যারালিপেরিস (Paraliparis) প্রশান্ত মহাসাগরে
১২ হাজার ফুট জলের তলায় ইহাদের বাস।

মিষ্টজলে নানাধরনের দেহবৈচিত্র্য-বিশিষ্ট মৎস্য দেখা যায়। ডিপ্‌নয় (Dipnoi)-জাতীয় মৎস্যের ফুলকা ত' আছেই, তাহাছাড়াও, ফুস্‌ফুস্‌ আছে। তাই, ইহাদের লাংফিস্‌ (Lung-fish) বলে।*

রুই-কাত্‌লা হইতে শুরু করিয়া গভীর সমুদ্রের সামুদ্রিক ঘোড়ামাছ (বা সামুদ্রিক অশ্ব), ল্যাসিওগ্‌ন্যাথাস্ (Lasiognathus), প্যারালিপেরিস (Paraliparis) প্রভৃতি নানাধরনের বিচিত্র আকৃতির মৎস্য দেখা যায়। পারিপার্শ্বিকের সহিত মানাইয়া লওয়ার জন্য ইহাদের দেহগুলি নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। উরুক্কুমাছ **এক্সোসিটাস** (Exocoetus) জাতীয় মৎস্য উড়িতে পারে। ইহা আমাদের দেশে পাওয়া যায়।



প্রোটোপ্‌টেরাস (Protopterus)

অমেরুদণ্ডী প্রাণিদলের মধ্যে যেমন পতংগ সংখ্যায় সর্বাধিক, তেমনি মেরুদণ্ডী প্রাণিদলের মধ্যে মৎস্যের সংখ্যাই সর্বোচ্চ। পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহাদের শ্বাসকার্যের জন্য নানা ধরনের ফুল্‌কা-ছিদ্র হাড়ের কানকুয়া দ্বারা ঢাকা

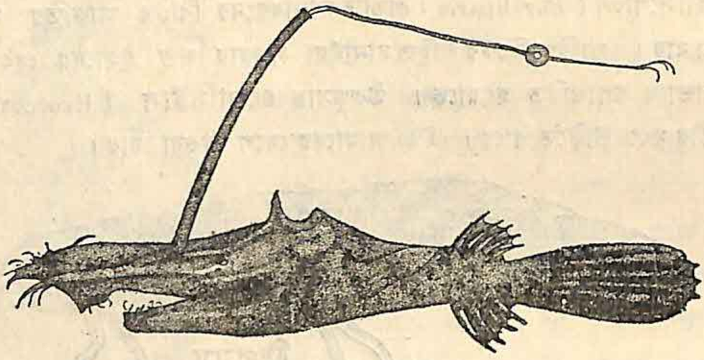
* আমাদের দেশের কয়েকটি সাধারণ মাছের উদাহরণ ও তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম :—

GENUS	SPECIES
রুই—Labio	rohita
কাত্‌লা—Catla	catla
ভেট্‌কী—Lates	calcarifer
ইলিশ—Hilsa	ilisha
মৃগেল—Cirrhina	mrigala
কালবোস—Labeo	calbasu
তিঁতে পুঁটি—Barbus	ticto
সরল পুঁটি—Barbus	swarna

জিয়ল মাছ (অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে) ঃ

কৈ—Anabaus	testudineus
মাগুর—Clarius	batrachus
শিঙ্গি—Heteropneustes	fossilis
ল্যাঠা—Chana	punctatus

থাকে। বলাবাহুল্য, ইহারা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন (O_2) শ্বাসকার্যের জন্য গ্রহণ করে।

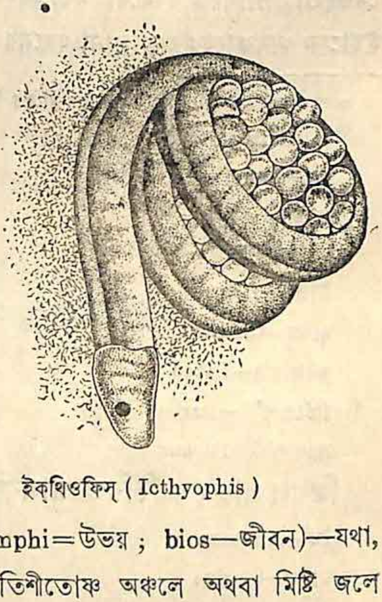


ল্যাসিয়োগন্যাথাস (Lasioganathus)—ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রায় ১০ হাজার ফুট তলায় ইহাদের বাস। ইহাদের পিঠের পাখনার ফিন্-রেটি রূপান্তরিত হইয়া আলো-বসান মাস্তুলের ন্যায় হইয়াছে।

10 সি. সি. মাপ হইতে স্থরু করিয়া $12\frac{1}{2}$ ফুট মাপের পর্যন্ত প্রায় 16 মণ ওজনের মাছ মিষ্টি জলে পাওয়া যায়।



কুনো ব্যাং



ইক্‌থিওফিস্ (Icthyophis)

শ্রেণী (৪) **উভচর** (Amphibia ; amphi=উভয় ; bios—জীবন)—যথা, ব্যাঙ প্রভৃতি। ভিজা, স্যাঁতসেঁতে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অথবা মিষ্টি জলে উভচর প্রাণীরা বাস করে,—কখনও সমুদ্র বা লোনা জলে ইহারা বাস করে না।

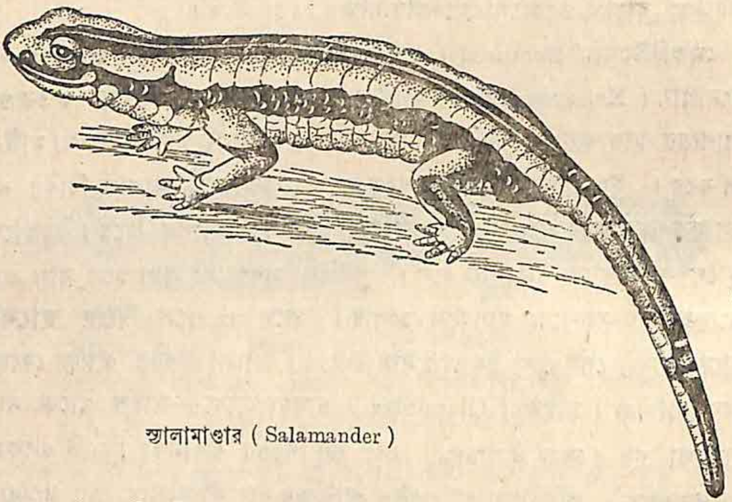
বেশী উচ্চতায় ইহারা সাধারণতঃ বাস করে না,—যদিও একধরনের গেছো ব্যাঙ 12,000 ফুট উপরে বাস করে। যে সকল স্থানের আবহাওয়া শুষ্ক, কখনও কখনও সেই সকল স্থানের উভচর অধিবাসীরা মাটির তলায় দিনের বেলা কাটাইয়া রাত্রের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সক্রিয় হইয়া উঠে।

নেকটিউরাস (Necturus), সাইরেন (Siren), পাইপা (Pipa), এবং জেনোপাস (Xenopus) প্রভৃতি প্রাণীরা জলেই থাকে ; আবার কতকগুলি জলাশয়ের কাছাকাছি। উড ফ্রগ (Wood frog) আবার জঙ্গলের ভিজা মাটিতে বাস করে। ইহারা সাধারণতঃ শৈশবকালে মৎস্যের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট হয়, জলে জন্মগ্রহণ করে এবং ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। ইহাদের এই শৈশব-অবস্থাকে **ব্যাঙাচি** বলে। পূর্ণাংগ অবস্থায় ইহারা স্থলে বাস করে এবং ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। জলে ও স্থলে **উভয় স্থানেই** ইহাদের বাস ; সেই হেতু ইহাদের নাম উভচর। সকল উভচর প্রাণীর দেহেই ভিজা (Moist) গ্রন্থিময় (Glandular) চামড়া থাকে,—আঁইশ থাকে না। দুইজোড়া পদ (অগ্র ও পশ্চাৎ) এবং হৃদ্‌পিণ্ডের প্রধানতঃ তিনটি প্রকোষ্ঠ ইহাদের থাকে। পৃথিবীতে এই শ্রেণীর প্রাণীদের বাস দীর্ঘদিনের, প্রায় 2500টি প্রজাতি বর্তমান আছে। যৌন পদ্ধতিতে ইহাদের প্রজনন হয়। এই শ্রেণীটিকে তিনটি অধঃ-শ্রেণী এবং কয়েকটি বর্গে (order) ভাগ করা হইয়াছে।

অধঃশ্রেণী—**স্টেগোকেফালিয়া** (Stegocephalia)—ইহার অধীনে বর্তমান —বর্গ জিম্‌নোফাওনা (Gymnophiona or Apoda) মাত্র জীবিত আছে। ইহাদের দেহটি, লম্বা ও সরু। চামড়া মসৃণ, ইহাতে আড়াআড়িভাবে খাঁজ আছে। চক্ষু এবং নাসিকামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্শিকা দেখা যায়। লেজটি হ্রস্ব এবং ইহার প্রায় শেষ প্রান্তে পায়ুছিদ্র অবস্থিত। বর্তমানে ইহাদের 55টি প্রজাতি পাওয়া যায়। সাপের মতো ইহাদের অনেকটা দেখিতে এবং ইহাদের কোনো উপাংগ নাই। অনেকে অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে বাস ক্ষরে। তাই, ইক্‌থিওফিস নামক এই জাতীয় প্রাণী দেখিতে পায় না। কারণ, পূর্ণবয়স্ক ইক্‌থিওফিসের চক্ষু চামড়া দ্বারা ঢাকা থাকে। আমাদের দেশে হিমালয় অঞ্চলে ইহাদের কিছু কিছু দেখা যায়।

অধঃশ্রেণী **ইউরোডেলা** (Urodela or Caudata) দলভুক্ত প্রাণিদের দীর্ঘ লেজ থাকে। ইহাদের উভয় চোয়ালেই দাঁত আছে। যথা—স্যালামাণ্ডার।

ইহাদের মুখ গহ্বরের তালুতে দাঁত থাকে, চক্ষুর পর্দা আছে, ফুসফুস আছে,—ফুল্‌কা নাই। কাহারো বা পরিণত বয়সে বহিঃফুলকা থাকে; ইহারা প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা। যথা—নেকৃটিউরাস। ১২ হইতে ১৭ ইঞ্চি লম্বা লোহাটে বাদামী



স্যালামাণ্ডার (Salamander)

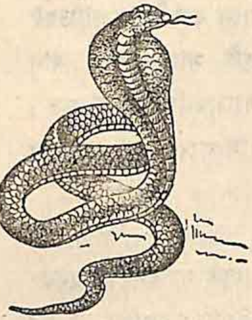
রং-এর এই প্রাণীগুলির দেহে কালো কালো দাগ আছে। ইহারা মাছ, পোকা-মাকড় ইত্যাদি খায়। ইহাদের ডিম ফুটিতে প্রায় ৫ হইতে ৯ সপ্তাহ সময় লাগে। অধঃ শ্রেণী **আনুরা** (Anura) জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে ব্যাঙ্-এর সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। গেছো ব্যাঙ্ গাছে চড়িতে পারে এবং উড়ো ব্যাঙ্ উড়িয়া বেড়ায়।

(৫) **সরীসৃপ** (Reptilia, rep. = creeping) যথা—সর্প, কচ্ছপ, টিকৃটিকি, বহুরূপী প্রভৃতি। ইহারাই প্রাণিজগতের সর্বপ্রথম যাহারা নিশ্চিতভাবে জল ব্যাতিরেকেও সারাজীবন স্থলে বসবাস করিতে পারে। কতকগুলি প্রাণী অবশ্য অভিযোজন (Adaptation)-এর নিমিত্ত পুনরায় স্থল ত্যাগ করিয়া জলে বসবাস করিতে সুরু করিয়াছে এবং ইহার নিমিত্ত ইহাদের দেহও সেইভাবে পুনর্গঠিত হইয়াছে। ইহাদের দেহ আঁইশ দ্বারা আবৃত থাকে এবং ইহারা আমাদের মতো শৈশবকাল হইতেই ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। ইহারা স্থলে ডিম পাড়ে। একটি শক্ত খোলা দ্বারা ইহাদের ডিম আবদ্ধ।

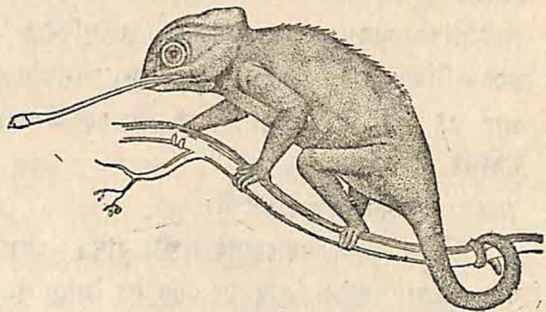
ইহারা সকলেই বুকে ভর দিয়া চলাফিরা করে। তাই এই শ্রেণীর প্রাণীর নাম সরীসৃপ*। ইহাদের কাহারো কাহারো কামড়ে **বিষ** আছে।

*আজকের দিনের সাধারণ আকৃতির সরীসৃপকে দেখিলে সহজে বোঝা যায় না যে, কত বিরাট দেহ লইয়া বিপুল সংখ্যায় এই শ্রেণীর প্রাণী জলে, স্থলে, আকাশে প্রভুত্ব করিয়াছিল প্রাগৈতিহাসিক

যেমন—সমস্ত সামুদ্রিক সাপ; এবং গোখুরা, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড় ইত্যাদি ডাঙ্গার সাপ। বিষহীন সাপের উদাহরণ হিসাবে ঢোঁড়া, লাউডগা, হেলে ইত্যাদির নাম করা যায়। সমুদ্রের সাপ বিষাক্ত হইলেও ফণা নাই।



সর্প

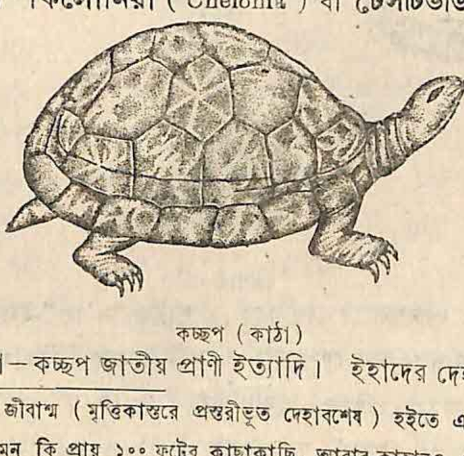


বহুরূপী (Chamalaeon)

গিরগিটির মধ্যে বেশীর ভাগই বিষহীন। হেলোডার্মা (**Heloderma**) —জাতীয় 2টি প্রজাতির গিরগিটির যথা—গিলামনস্টারের (Gila **monster**) বিষ আছে।

কচ্ছপের মধ্যে কিছু ডাঙ্গায় বাস করে, যথা, মেঠো কচ্ছপ, কিন্তু বেশীর ভাগ কচ্ছপই জলে বাস করে।

আদিম সরীসৃপ স্ফেনোডনের বাস নিউজিল্যাণ্ডে। সরীসৃপ 8টি বর্গে বিভক্ত। (১) **কিলোনিয়া** (Chelonia) বা **টেসটিউডিনাটা** (Testu-



কচ্ছপ (কাঠা)

dinata), যথা—কচ্ছপ জাতীয় প্রাণী ইত্যাদি। ইহাদের দেহ শক্ত খোলায়

কালে। ইহাদের জীবাশ্ম (মৃত্তিকাস্তরে প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ) হইতে এই তথ্য জানা যায়। কাহারও দৈর্ঘ্য এমন কি প্রায় ১০০ ফুটের কাছাকাছি, আবার কাহারও দেহের দৈর্ঘ্য ৪৭ ফুট পর্যন্ত ছিল (ডানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত)। প্রাগৈতিহাসিক একটি যুগের তাই নাম, "সরীসৃপ যুগ"।

ঢাকা থাকে ; দাঁত নাই। (২) **স্কোয়ামাটা** (Squamata), যথা—গিরগিটি, টিক্‌টিকি, সাপ, বহুরূপী প্রভৃতি। (৩) **ক্রোকোডিলিয়া** (Crocodilia), যথা—কুমীর প্রভৃতি এবং (৪) **রিংকোকেফালিয়া** (Rhyncocephalia), যথা—স্ফেনোডন। শেষোক্ত শ্রেণীর বর্তমানে একটি প্রজাতিরই প্রাণী পাওয়া যায়—নাম স্ফেনোডন এবং পৃথিবীর একটি মাত্র দেশেই বাস করে—নিউজিল্যাণ্ডে। ইহাদের দেখিতে অনেকটা বাগানের গিরগিটির মত ; প্রায় $2\frac{1}{2}$ ফুট লম্বা। স্থলে, জলে এবং গর্তে ইহারা বাস করে ; মাছ, পোকা ইত্যাদি খায়।

(৪) **পক্ষী** (Aves=পক্ষী)

পৃথিবীর সকল মহাদেশেই পক্ষীর বাস। সমুদ্র পাড়ের সমতলভূমি হইতে স্থরু করিয়া পর্বতের প্রায় 20,000 ফুট উপরে পর্যন্ত ইহাদের পাওয়া যায়।



উটপাখী

ইহারা সাধারণতঃ দলবদ্ধভাবে বাস করে। পাখীর "ঝাঁক" ইতস্ততঃ আকাশে উড্ডীন অবস্থায় বা শস্যক্ষেত্রে দেখা যায়। কলিকাতার চিড়িয়াখানার ঝিলেতে শীতকালে হাঁসের ঝাঁক দেখিলেও অবাক হইতে হয়।

'অন্তহীন সমুদ্রের বুকে'—অ্যালবাট্রস (Albatross) প্রভৃতি, বৃক্ষের কোটরে কাঠঠোকরা (Woodpecker) প্রভৃতি, অধিকাংশ সাধারণ পক্ষী বৃক্ষশাখায় ; জলে পেঙ্গুইন (Penguin) প্রভৃতি, এবং স্থলে দৌড়পাখী,

যথা, উটপাখী (Ostrich) প্রভৃতি বাস করে। কিন্তু মাটীর নীচে কেহই থাকে না।

কাক, চিল, রীয়া, এমু, টিয়া ইত্যাদি পক্ষীর কয়েকটি উদাহরণ। ইহাদের দেহ **পালক** দ্বারা আবৃত এবং উড়িবার জন্য অধিকাংশের **ডানা** আছে। ইহাদের অধিকাংশই আকাশচারী। এমন পক্ষীও আছে, যাহারা অতি দ্রুতবেগে ছুটিতে পারে, কিন্তু উড়িতে পারে না; যেমন—উটপাখী (Ostrich) প্রভৃতি। ময়না, টিয়া প্রভৃতি পাখী শিক্ষা দিলে মানুষের মত কথা বলিতে পারে। পক্ষীর বর্তমানে 8600টি প্রজাতি আছে।

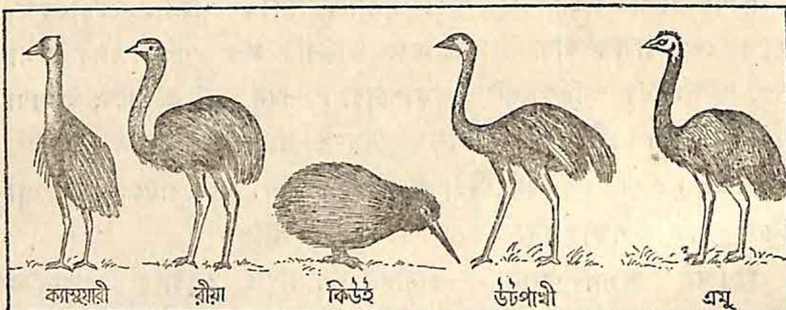
ইহাদের অগ্রপদ-জোড়া ডানায় রূপান্তরিত হইয়াছে প্রধানতঃ উড়িবার জন্য, অপরপক্ষে পশ্চাদ্‌পদ-জোড়া চলিবার, আঁকড়াইয়া ধরিবার, অথবা সাঁতার কাটিবার নিমিত্ত রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাদের পায়ের আঙ্গুল কখনো 4-টির বেশী হয় না। ইহাদের মুখছিদ্রটি লম্বিত হইয়া চঞ্চুতে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে কোন পক্ষীর দাঁত নাই। পরিবেশের তাপের তারতম্যের জন্য ইহাদের দেহের তাপের কোন তারতম্য হয় না; তাই ইহারা সমোষ্ণশোণিত (Homoeothermous) প্রাণী। ইহারা ডাঙ্গায় ডিম পাড়ে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাখী আরকিওপটেরিক্‌স্ (Archaeopteryx)-এর দাঁত ও লম্বা লেজ ছিল। (১ম ভাগ, পৃঃ 78 চিত্র দেখ)

সাধারণভাবে পাখীরা **দুইটি** ভাগে বিভক্ত। **উড়োপাখী** বা ক্যারিনেটি (Carinate) এবং **দৌড়পাখী** বা র‍্যাটিটি (Ratitae)। প্রথমোক্ত পাখীরা উড়িতে পারে এবং ইহাদের ডানায় উন্নত ধরনের পালকবিন্যাস দেখা যায় এবং দ্বিতীয়োক্ত পাখী উড়িতে পারে না; কেননা, ইহাদের দেহ ভারী এবং ডানা মজবুত নহে। পূর্বে বর্ণিত রীয়া, কিউই, উটপাখী প্রভৃতি পাখী উড়িতে পারে না। অনেকে আবার জলে সাঁতার দিতে পারে। যেমন—পেঙ্গুইন। (পরের পৃষ্ঠায় ইহাদের ছবিগুলি দেখ।)

(৫) **স্তন্যপায়ী**—যথা, কুকুর, বিড়াল, গরু, ক্যাঙারু, তিমি, বাদুড় এবং মানুষ প্রভৃতি। ইহারাই প্রাণিজগতের সর্বাপেক্ষা উন্নত প্রাণী। ইহারা পূর্ণাবয়ব হইয়াই জন্মগ্রহণ করে এবং শৈশবে **মাতৃস্তন**-দুগ্ধে জীবনধারণ করে। ইহাদের দেহের সর্বত্র ছোট বড় **কেশ** আছে। ইহাদের বিভিন্ন রকমের দাঁত ও বহিঃকর্ণ (Pinna) থাকে।

এই স্তন্যপায়ী জীবদের আবার **তিনটি** উপদল আছে। সর্বনিম্ন উপদলের প্রাণীরা **প্রটোথিরিরা** (Prototheria) নামে পরিচিত। এই জাতীয়



প্রকৃতির অবাধ্য এঁরা-নিয়মের রাজত্বে এঁদের ঔদ্ধত্য লক্ষ্যকর! পাখী,-কিন্তু উড়েনা!



এ পাখী কিন্তু উড়তে পটু

কারণ এঁদের ডানা খুব ছোট, আর দেহ ভীষণ ভারী। কিন্তু, তাহলে কি হয়! এঁরা কিন্তু সকলেই এক এক বিষয়ে পটু, যেমন উট-পাখী ভীষণ জোরে ছুটতে পারে। আর নীচে ডানদিকের পেঙ্গুইন যেমন ডুবুরী, তেমনি শিকারী। দক্ষিণমেরুর হিমশীতল সমুদ্রের জলে সাঁতার দিয়ে মাছ ধরে খায় এঁরা,- দলবেঁধে থাকে। এঁরা দক্ষিণ মেরুর বারোমাসের স্থায়ী বাসিন্দা।



পেঙ্গুইন

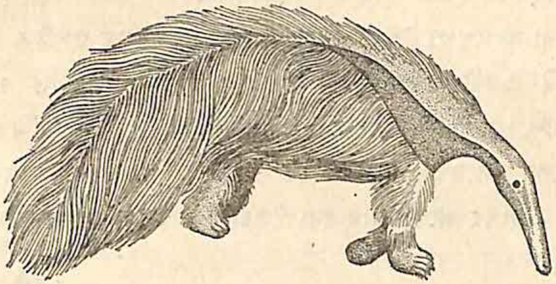
কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের পাখী : উপরে—দৌড়পাখী, বামে—উড়োপাখী, ডাহিনে—ডুবুরীপাখী

স্তন্যপায়ীরা অত্যন্ত নিম্নস্তরের। মনোট্রিম, পিপীলিকাভুক্, প্রভৃতি প্রাণীরা ইহাদের উদাহরণ। স্তন্যপায়ী হইয়াও পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদের ন্যায় ইহারাও

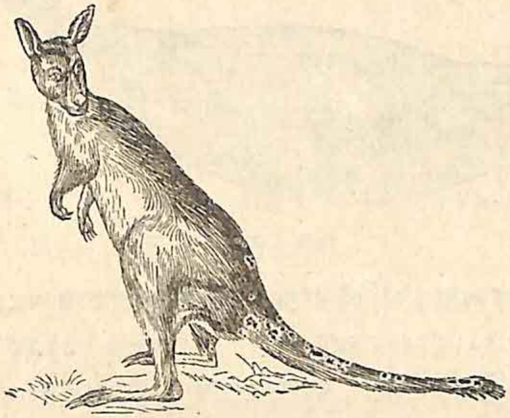


মনোট্রিম

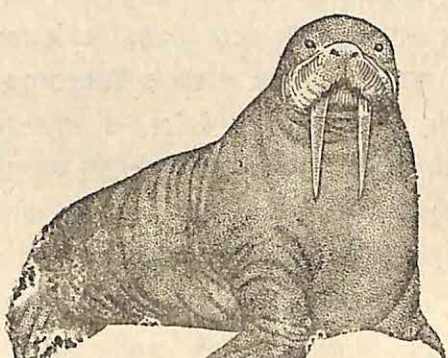
ডিম পাড়ে। **মেটাথিরিয়া** (Metatheria) জাতীয় প্রাণীরা যদিও একবারেই বাচ্চা প্রসব করে, তথাপি, নবজাতকের দেহ সুপুষ্ট হইবার আগেই মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসে। সেই কারণে, মাতার উদর-সংলগ্ন একটি **থলিতে**



পিপীলিকাভুক্ (Ant-Eater) ঃ প্রটোথিরিয়া।



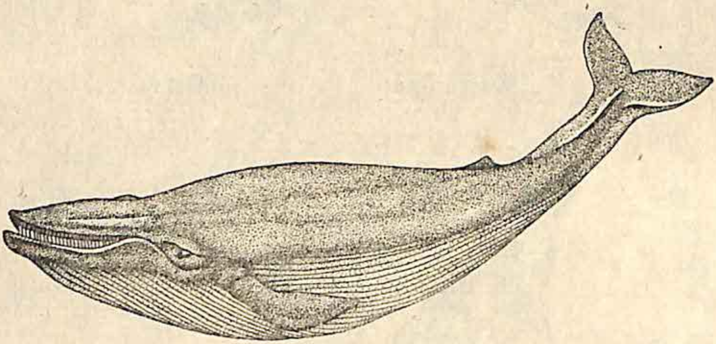
কাঙারু (Kangaroo) ঃ মেটাথিরিয়া।



ওয়ালরাস (Walrus) ঃ ইউথিরিয়া।

[স্তন্যপায়ী শ্রেণীর তিনটি উপদল-ভুক্ত তিনটি প্রাণী দেখানো হইল।]

অশক্ত দেহ সবল না হওয়া পর্যন্ত ইহারা বাস করে। ইউথেরিয়া (Eutheria) জাতীয় প্রাণীরা সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরনের এবং মাতা পূর্ণাংগ সুগঠিত শিশু প্রসব করে। তিমি একটি স্তন্যপায়ী জীব, জলে থাকে। জীবিত প্রাণীর মধ্যে তিমিই সর্ববৃহৎ। সমুদ্রের জলে বিরাটকায় (40-50 ফুট) তিমি প্রায় 3600 ফুট পর্যন্ত জলের তলায় ডুব দিয়া যাইতে পারে। ইহাদের শরীরের কোন কোন অংশ হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈয়ারী হয়। স্থলের স্তন্যপায়ী প্রাণী



তিমি (Whale)

(সকল প্রাণীদের মধ্যে) হাতিই সর্ববৃহৎ। ইহাদের গজদন্ত আছে। উচ্চতায় ইহারা প্রায় 10 ফুট হয়। বাচ্চার ওজন (প্রসবের পর) $2\frac{1}{2}$ মণ। ওয়ালরাসও জলে বাস করে কিন্তু স্তন্যপায়ী ; ইহাদের দাঁত সাঁতার কাটায় সাহায্য করে। বাদুড় পাখীর ন্যায় আকাশে উড়িতে পাড়িলেও ইহারাও স্তন্যপায়ী প্রাণী। হিংস্র ও মাংসাশী স্তন্যপায়ী. বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলের "রয়েল বেংগল টাইগার" নামক বাঘ, পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ও সবচেয়ে বলবান বাঘ। সৌরাষ্ট্রের "গির" অরণ্যে সিংহ এবং আসাম ও উত্তরবঙ্গের হাতি উল্লেখযোগ্য। আসামের জঙ্গলের গণ্ডার ভীষণ একগুঁয়ে ও শক্তিশালী, ইহারা কিন্তু তৃণভোজী। গিনিপিগ হইতে মানুষ পর্যন্ত বহু প্রাণীই স্তন্যপায়ীদের উদাহরণ।

সর্বাপেক্ষা উন্নত এই প্রাণীকূলের বিভিন্ন ধরনের প্রাণী নানান্ পরিবেশে বাস করে। যথা, **জলে,**—শুশুক, তিমি, সীল, ওয়ালরাস্ প্রভৃতি। **ডাঙ্গায় বা স্থলে**—কুকুর, বাঘ ইত্যাদি হইতে সুরু করিয়া মানুষ পর্যন্ত অসংখ্য প্রাণী ; —**আকাশে**—বাদুড়, চামচিকা ইত্যাদি, **মাটির তলায়** (গর্তে)—ছুঁচো প্রভৃতি।

বৃক্ষে—একধরনের স্লথ্ (Sloth ; Bradypus), লেমুর, বাঁদর, ইত্যাদি।

মরুভূমিতে—উট প্রভৃতি।

পর্বতে—নানান্ ধরনের স্তন্যপায়ীর বাস।

প্রাণিজগতের শ্রেণী বিভাগের একটি মোটামুটি ছক নিম্নে দেওয়া হইল :—

পর্ব প্রটোজোয়া (এককোষী)—সমগ্র প্রাণিদেহ একটি মাত্র কোষ লইয়া গঠিত।

শ্রেণী—(মোট ৫টি) (ক) সারকোডিনা—যথা, অ্যামিবা, (খ) ম্যাসটিগোফোরা—যথা, ইউগ্লিনা, (গ) সিলিয়াটা—যথা, প্যারামাসিয়াম, (ঘ) স্পোরোজোয়া—যথা, মনোসিষ্টিস্, (ঙ) সাক্টোরিয়া—যথা, অ্যাসিনেটা।

পর্ব পরিফেরা (বা ছিদ্রাল প্রাণী)—বহুকোষী প্রাণিদেহ দুই-কোষস্তর-বিশিষ্ট।

শ্রেণী—(মোট তিনটি) (ক) ক্যালকেরিয়া—যথা, সাইকন। (খ) ডিমোস্পঞ্জি—যথা, স্পঞ্জিলা। (গ) হেক্সাঅ্যাক্টিনেলিডা—যথা, ইউপ্লেক্টেলা।

পর্ব সিলেনটারেটা (বা একনালী দেহী)—দুই-কোষস্তরবিশিষ্ট দেহে একটি মাত্র দেহগহ্বর ও একটি মাত্র ছিদ্র।

অধঃপর্ব (ii) অ্যাক্নিডেরিয়া (Acnidaria) ; নিমাটোসিস্ট কোষ নাই। —যথা, হর্মিফোরা।

অধপর্ব (ii) নিডেরিয়া (Cnidaria) ; নিমোটোসিস্ট-বিশিষ্ট কোষ আছে।

শ্রেণী (মোট ৩টি)—(ক) হাইড্রোজোয়া—যথা, হাইড্রা, (খ) স্কাইফোজোয়া—যথা, ওরেলিয়া, (গ) অ্যান্থোজোয়া—যথা, সাগর কুসুম (Sea-Anemone).

পর্ব প্লাটিহেলমিনথিস্ (বা চ্যাপ্টা কৃমি)—দেহটি প্রায় পাতার মত চ্যাপ্টা।

শ্রেণী (মোট ৩টি)—(ক) টারবিলেরিয়া—যথা, প্ল্যানেরিয়া, (খ) ট্রিমাটোডা—যথা, যকৃৎ-কৃমি (Liver-fluke), (গ) সেস্টোয়ডিয়া—যথা, ফিতা-কৃমি (Tape-worm).

পর্ব নিমাথেলমিন্থিস্ — (অ্যাসকেলমিন্থিস্) গোল-সুতা কৃমি, দেহটি সুতার মত। শ্রেণী-নিমাটোডা ; যথা—অ্যাস্কারিস্।

পর্ব অ্যানিলিডা (বা অঙ্গুরীমাল)—বহু খণ্ডক-বিভক্ত নলের ন্যায় দেহ।

শ্রেণী—(মোট ৭টি)—(ক) পলিকিটা—যথা, নেরিস্। (খ) অলিগোকিটা —যথা, কেঁচো। (গ) হিরুডিনিয়া—যথা, জোঁক। (ঘ) আর্কিঅ্যানিলিডা —যথা, পলিগোর্ডিয়াস, (ঙ) ইকিউরোয়ডিয়া — যথা, বোনেলিয়া, (চ) সাইপাসকিউলোয়ডিয়া—যথা, সাইপানকিউলাস। (ছ) প্রায়াপুলিডা—যথা, প্রায়াপিউলাস।

পর্ব আর্থ্রোপোডা (বা সন্ধিপদ)—পদগুলি সন্ধিল বা কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড যুক্ত হইয়া গঠিত।

শ্রেণী—(মোট ৫টি)—(ক) ক্রাস্টেসিয়া (বা খোলকী)—যথা, চিংড়ি। (খ) ইন্সেক্টা (বা পতঙ্গ)—যথা, আরশোলা। (গ) মিরিয়াপোডা (বা বহুপদী)—যথা, কেন্নো। (ঘ) অ্যারাক্নোয়ডিয়া (বা মাকড়) যথা,—মাকড়সা। (ঙ) ওনাইকোফোরা—যথা,—পেরিপেটাস।

পর্ব মলাস্কা (বা শম্বুক)—নরমদেহী এই প্রাণীকুলের ভিতরে বা বাহিরে শক্ত খোলা (Shell) ও মাংসল পদ আছে।

শ্রেণী (মোট ৫টি) — (ক) অ্যাম্ফিনিউরা—যথা, কাইটন। (খ) স্ক্যাফো-পোডা—যথা, ডেন্টালিয়াম। (গ) গ্যাস্ট্রোপোডা—যথা, শামুক। (ঘ) বাইভালভিয়া যথা, ঝিনুক। (ঙ) কেফালোপোডা—যথা, অক্টোপাস।

পর্ব এ্যাকাইনোর্ডামাটা (বা কণ্টকত্বক্)—পূর্ণাঙ্গের দেহটি অরীয়ভাবে প্রতিসম। মাথা ও পদহীন।

শ্রেণী—(মোট ৫টি) (ক) অ্যাস্টেরয়ডিয়া—যথা, তারামাছ। (খ) একাইনয়ডিয়া—যথা, সি-আরচিন। (গ) অফিউরয়ডিয়া—যথা, ব্রিটলস্টার (ঘ) হলোথুরয়ডিয়া—যথা, সমুদ্রশশা (Sea-cucumber)। (ঙ) ক্রাইণয়ডিয়া—যথা, সামুদ্রিকলিলি।

পর্ব কর্ডাটা—পিঠের দিকে জীবনের যে কোন সময়ে, অথবা জীবন-ভোর নটোকর্ড নামীয় একটি নরম দণ্ড থাকে। পিঠের দিকে ফাঁপা একটি নার্ভকর্ড এবং জীবনের যে কোন সময় গলবিল-ছিদ্র (ফুল্কা ছিদ্র) থাকে।

উপপর্ব—(১) **হেমিকর্ডাটা** (অর্ধকর্ডাটা)—দেহের ভিতর সম্মুখের দিকে নটোকর্ড ; যথা—ব্যালানোগ্লোসাস্।

উপপর্ব—(২) **ইউরোকর্ডাট বা টিউনিকাটা** ; লেজের দিকে নটোকর্ড —যথা, এ্যাসিডিয়ান।

উপপর্ব—(৩) **কেফালোকর্ডাটা**—মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত নটোকর্ড প্রসারিত। যথা—আম্ফিয়কসাস্।

উপপর্ব—(৪) **ক্রেনিয়াটা** (বা মেরুদণ্ডী)—শৈশবে (ভ্রূণাবস্থায়) নটোকর্ড ও পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় শক্তহাড়ের মেরুদণ্ড পিঠের মধ্যস্থলে লম্বালম্বিভাবে বিদ্যমান।

শ্রেণী—(মোট ৭টি) (ক) সাইক্লোসটোমাটা বা অ্যাগ্নাথা—চোয়াল-বিহীন মেরুদণ্ডী প্রাণী। যথা—হ্যাগফিশ্। (খ) কনড্রিক্‌থিস্ বা ইলাস-মোব্রাঙ্কাই—যথা, ডগ্‌ফিশ (হাঙর)। (গ) অসটিক্‌থিস্—যথা, রুই ইত্যাদি। (ঘ) এ্যাম্ফিবিয়া (বা উভচর)—যথা, ব্যাঙ্ ইত্যাদি। (ঙ) রেপ্‌টাইল (বা সরীসৃপ)—যথা, সর্প ইত্যাদি। (চ) আভিস্ বা পক্ষী—প্রধানত আকাশচারী এই প্রাণীদের অগ্রপদ-জোড়া ডানায় রূপান্তরিত হইয়াছে। যথা,—পায়রা, ময়না ইত্যাদি। (ছ) ম্যামেলিয়া বা স্তন্যপায়ী—ইহাদের স্ত্রীরা একবারেই বাচ্চা প্রসব করে, সকলেরই দেহে কেশ এবং স্তনগ্রন্থি আছে। স্ত্রী-দের ক্ষেত্রে স্তনগ্রন্থি উন্নত এবং দুগ্ধক্ষরা হয়। যথা,—গিনিপিগ্, মানুষ ইত্যাদি। নিম্নে অ-কর্ডাটা ও কর্ডাটা প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা হইল :

অ-কর্ডাটা	কর্ডাটা
১। সর্বক্ষেত্রে দেহের কোন নির্দিষ্ট প্রতিসাম্য নাই।	১। দেহের নির্দিষ্ট প্রতিসাম্য আছে।
২। উপাঙ্গ একাধিক, অনির্দিষ্ট-সংখ্যক।	২। উপাঙ্গ দুই জোড়া।
৩। দেহে সাধারণতঃ কোন অস্থি-নির্মিত অন্তঃকঙ্কাল থাকে না,—নোটোকর্ড বা মেরুদণ্ড ত' নয়ই।	৩। দেহে সাধারণতঃ অন্তঃকঙ্কাল থাকে, (গঠনপথে নোটোকর্ড এবং অধিকাংশের পরবর্তীকালে মেরুদণ্ড থাকে)।
৪। কেন্দ্রীয় নার্ভরজ্জু অংকদেশে অবস্থিত এবং ফাঁপা নয়।	৪। কেন্দ্রীয় নার্ভরজ্জু পিঠের দিকে অবস্থিত এবং ফাঁপা।
৫। গলবিলে ফুল্‌কা-ছিদ্র থাকে না।	৫। গলবিলে ফুল্‌কা-ছিদ্র জীবনের কোন-না-কোন স্তরে থাকে।
৬। নাসারন্ধ্র থাকে না।	৬। নাসারন্ধ্র থাকে।
৭। মস্তিষ্কে কোন গহ্বর নাই।	৭। মস্তিষ্কের গহ্বর আছে।

অ-কর্ডাটা	কর্ডাটা
৮। চক্ষু—সরলাক্ষী বা পুঞ্জাক্ষী হইতে পারে।	৮। চক্ষু—সরলাক্ষী।
৯। হৃৎপিণ্ড পিঠের দিকে অবস্থিত।	৯। হৃৎপিণ্ড অংকদেশে অবস্থিত।
১০। পৌষ্টিক নালী নির্দিষ্টভাবে থাকিতে বা না থাকিতে পারে।	১০। নির্দিষ্ট পৌষ্টিক নালী আছে।
১১। শ্বাসযন্ত্র সকল ক্ষেত্রে থাকে না।	১১। শ্বাসযন্ত্র নির্দিষ্টভাবে থাকে।
১২। নির্দিষ্ট জননযন্ত্র থাকিতে বা নাও থাকিতে পারে, যৌন ও অযৌন জনন হয়। এক- বা উভলিঙ্গ।	১২। নির্দিষ্ট জননযন্ত্র থাকে। যৌন জনন হয়। একলিঙ্গ।
১৩। পায়ুর পশ্চাৎ-অংশে লেজ থাকে না, পায়ু দেহের পশ্চাৎ প্রান্তে অবস্থিত।	১৩। পায়ুর পশ্চাৎ-অংশে লেজ থাকে।
১৪। পেটের দিক, পিঠের দিক অপেক্ষা পুরু।	১৪। পেটের দিক, পিঠের দিক অপেক্ষা পাত্‌লা।

অনুশীলনী

1. শ্রেণীবিভাগ কি? আধুনিক বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি ও প্রয়োজনীয়তা কি?

2. প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ প্রক্রিয়া বিবৃত কর।

3. অঙ্গুরীমাল পর্বের প্রাণীগুলির শ্রেণীবিভাগ উদাহরণসহ বিবৃত কর।

4. লোয়ার কর্ডাটা জাতীয় প্রাণী কাহাদের বলে? ইহাদের শ্রেণীবিভাগ বিবৃত করিয়া ভারতে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় লিখ।

5. মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে আলোচনা কর।

6. পক্ষী কাহাকে বলে? উড়োপাখী ও দৌড়পাখীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা কর। কোন্ পাখী সাঁতার কাটে?

7. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:—

(ক) কোন্ পাখী সাঁতার কাটিতে পারে? (খ) সন্ধিপদ কি? (গ) কোন্ প্রাণীর পুরুষ স্ত্রীর দেহের মধ্যে বাস করে? (ঘ) বিভিন্ন পর্বভুক্ত কয়েকটি উড়ো প্রাণীর নাম কর। (ঙ) কয়েকটি পরভোজী আন্ত্রপ্রাণীর নাম কর এবং ইহারা মানুষের কি কি ক্ষতি করে লিখ।



(১) উড়ন্ত শৃগাল (২) উড়ন্ত কাঠবিড়াল (৩) উড়ন্ত গিরগিটি
(৪) উড়ন্ত ব্যাঙ (৫) উড়ন্ত মাছ

Questions to be discussed

1. What is classification ? Describe the basis and importance of the modern method of classification of animals.

শ্রেণীবিভাগ কি ? প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি ও উপকারিতা কি ?

2. Describe the history of classification of animals and explain the method of scientific classification,

প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

3. Classify the Phylum Annelida with examples.

পর্ব অ্যানিলিডা (অঙ্গুরীমাল)-র শ্রেণী বিভাগ উদাহরণসহ বিবৃত কর।

4. What are Lower Chordates ? Classify the Lower Chordates with their characteristics and examples. Mention the places in India where they are found.

নিম্নস্তরের কর্ডাটা প্রাণী কাহারা ? ইহাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া উদাহরণসহ শ্রেণীবিভাগ বিবৃত কর। ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় ইহাদের পাওয়া যায় ?

5. Compare the characteristics of the vertebrates and the invertebrates.

মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা কর। [H. S. 1965]

6. What are birds ? Explain the characteristicsa with examples of the flying and running birds. Name a swimming bird ?

পক্ষী কাহারা ? উড়োপাখী ও দৌড়পাখীর উদাহরণসহ বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা কর। একটি সাঁতারু পাখীর নাম বল।

7. Answer the following questions :—

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ;—

(a) name a swimming bird, (b) what is a jointed appendage, (c) name a male animal which lives within the female, (d) name some flying animals belonging to different phyla, (e) name some parasitic protozoa that live within the human hosts and mention the troubles, they cause.

(ক) একটি সাঁতারু পাখীর নাম বল, (খ) সন্ধিপদ কি ? (গ) কোন পুরুষ প্রাণী স্ত্রী প্রাণীর দেহের ভিতর বাস করে. (ঘ) কতকগুলি বিভিন্ন পর্বভুক্ত প্রাণীর নাম কর, (ঙ) কতকগুলি মানবদেহের পরভোজী এককোষী প্রাণীর নাম কর যাহারা অনিষ্টকারী।

8. Name the phyla and class to which the animals mentioned below, belong, and state reasons for placing them in their respective groups. Give one or more examples for each of the classes that you state ;

(1) The Prawn ; (2) the Guineapig, (3) the Koi fish ; (4) the Cockroach.

[W. B. Boord, 1960]

নিম্নলিখিত প্রাণীগুলিকে কোন পর্ব ও শ্রেণীতে কি ভিত্তিতে রাখা হইয়াছে। তাহার কারণ দর্শাইয়া বিবৃত কর। শ্রেণীগুলির এক বা ততোধিক উদাহরণ দাও।

(ক) চিংড়ি, (খ) গিনিপিগ (,৬৬) (ঘ) কই, (ঙ) আরশোলা (পঃ বঃ বোর্ড, ১৯৬০ '৬২)

(চ) হাইড্রা, (ছ) রুই (প. ব. বোর্ড ১৯৬২) (জ) মাগুর, গিরগিটি (প. ব. বোর্ড, ১৯৬৬)

[ক] কেঁচো (Pheritima posthuma)

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা কেঁচোর বাহ্যিক বিবরণ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছি। এইবার ইহার শারীরস্থান (Anatomy) বা আভ্যন্তরীণ অঙ্গব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু কিছু আলোচনা করা হইবে। এই পর্যায়ে সর্বপ্রথম পৌষ্টিকতন্ত্রের (Alimentary System) অবস্থান, বিভিন্ন অংশ এবং তাহাদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(১) পৌষ্টিকতন্ত্র (Alimentary System)

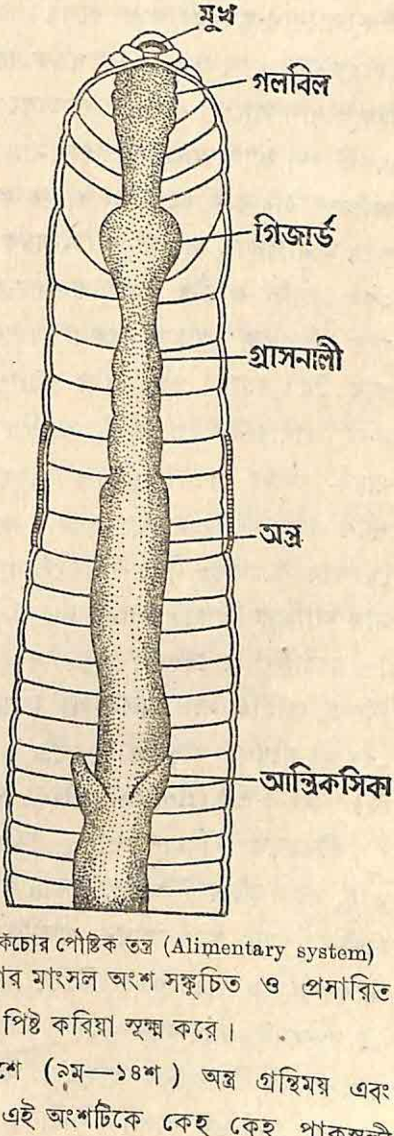
আমরা জানি যে, কেঁচোর দেহটি লম্বা নলাকৃতি এবং ইহা সাধারণতঃ 100 হইতে 120টি দেহখণ্ডে (Segments) বিভক্ত। সুতরাং স্বভাবতঃই এই নলাকৃতি দেহের ভিতরের অঙ্গগুলিও লম্বা ধরনের হইবে। দেহটির যে অর্ধাংশে ক্লাইটেলাম (Clitellum) আছে, তাহাই দেহের অগ্রভাগ এবং ইহারই অগ্রপ্রান্তে যে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র আছে, তাহাই কেঁচোর মুখ। ইহার বিপরীত অংশে, অর্থাৎ দেহের পশ্চাদ্‌ভাগে আর একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, ইহাকে পায়ু (Anus) বলে। কেঁচোর দেহের উপরিভাগের চামড়াকে যদি লম্বালম্বিভাবে কাটা হয়, তবে ইহার অভ্যন্তরে আর একটি নল দেখা যাইবে—অপেক্ষাকৃত চওড়া নলের ভিতর যেন অপর একটি সরু নল বসান আছে। ভিতরের এই সরু নলটিই **পৌষ্টিক নালী** (Alimentary canal)। ইহা মুখ হইতে পায়ু পর্যন্ত সরলভাবে বিস্তৃত। ইহার নিম্নলিখিত কয়েকটি অংশ আছে :—

মুখছিদ্র ও মুখবিবর—দেহের সম্মুখ প্রান্তে মুখছিদ্রটি অবস্থিত। ইহার পরবর্তী অংশটির নাম মুখবিবর (Buccal cavity)। ইহা অতি ক্ষুদ্র ও গোলাকার এবং তৃতীয় দেহখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। জীবন্ত কেঁচো এই অংশটি কখনো সম্মুখভাগে ঠেলিয়া দেয় আবার কখনো বা পিছনদিকে টানিয়া লয়। মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যগ্রহণই মুখবিবরের কাজ।

পরবর্তী অংশটির নাম **গলবিল** (Pharynx)। ইহা দেখিতে অনেকটা ন্যাসপাতির ন্যায়, অর্থাৎ, উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত চাপা এবং নিম্নভাগ সরু।

মুখবিবরের শেষে এবং গলবিলের শুরুতে একটি সরু দাগ আছে। ইহার উপরিভাগ কয়েকটি গোল গোল অংশে বিভক্ত। ইহার অভ্যন্তরভাগের গর্তটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং আড়াআড়িভাবে অবস্থিত। গলবিলের উপরে একটি মাংসল কন্দ (bulb—গোলাকৃতি অংশ) আছে। গলবিলটিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—(ক) লালাপ্রকোষ্ঠ এবং (খ) নির্বাহপ্রকোষ্ঠ। প্রথম অংশ হইতে লালা নিঃসৃত হইয়া খাদ্য-বস্তুতে মিশ্রিত হয় এবং প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য-পরিপাকে সহায়তা করে। দ্বিতীয় অংশটি লালা-মিশ্রিত খাদ্যবস্তুকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে।

চতুর্থ দেহখণ্ডের পরে গলবিল **গ্রাসনালীতে** প্রবেশ করে। গ্রাসনালী (Oesophagus) দেখিতে একটি সরু নলের ন্যায়। ইহা পঞ্চম দেহখণ্ড হইতে অষ্টম দেহখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু, অষ্টম কি নবম দেহখণ্ডের নিকটে ইহাকে একটি গোলাকৃতি, অপেক্ষাকৃত স্ফীত মাংসপিণ্ডের ন্যায় দেখায় —ইহার নাম **গিজার্ড** (Gizzard) বা কন্দ ; ইহার ভিতরে একটি কঠিন কৃত্তিকাবরণী আছে। কেঁচোর দাঁত নাই, সুতরাং ইহারা গোটা গোটা খাদ্যবস্তুই গলাধঃকরণ করে। তাই, ইহার মাংসল অংশ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া কৃত্তিকাবরণীর সাহায্যে খাদ্যবস্তুকে পিষ্ট করিয়া সূক্ষ্ম করে।



কেঁচোর পৌষ্টিক তন্ত্র (Alimentary system)

গিজার্ডের (কন্দের) পরবর্তী অংশে (৯ম—১৪শ) অন্ত্র গ্রন্থিময় এবং সূক্ষ্ম রক্তবাহী জালিকা নালী-সমন্বিত। এই অংশটিকে কেহ কেহ পাকস্থলী

(stomach) বলেন। এই অংশের গ্রন্থিগুলি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য পরিপাকের পক্ষে উপযোগী খমির নিঃসরণ করে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রস সম্ভবতঃ পরিপাক-কার্যে সহায়তা করে।

পৌষ্টিক নালীর চতুর্দশ দেহখণ্ডের পরবর্তী অংশ **অন্ত্রে** (Intestine) শেষ হইয়াছে। অন্ত্রগ্রাসনালী অপেক্ষা মোটা। ২৬ খণ্ডকের পরবর্তী অন্ত্রের অংশকে টিফ্লোসোল-পরবর্তী অংশ বলে। এই অংশে টিফলোসোল আছে। কেঁচোর দেহের শেষ ২৩শ থেকে ২৫শ খণ্ডক ব্যতীত অন্ত্রের মধ্য অংশের সমগ্র অঞ্চলেই টিফ্লসোল আছে। অন্ত্রের অভ্যন্তরে কয়েকটি দেহখণ্ড ব্যাপিয়া পিঠের দিকে একটি লম্বা ভাঁজ আছে। ইহার নাম **টিফ্লোসোল** (Typhlosole)। ইহা অন্ত্রের পরিধি বৃদ্ধি করে এবং তাহার ফলে খাদ্যশোষণে সহায়তা হয়। কেঁচোর অন্ত্রে নানাপ্রকার রাসায়নিক উৎসেচক (Enzyme) পাওয়া যায়। ইহাদের কেহ প্রোটিন-জাতীয়, কেহ শ্বেতসার-জাতীয়, আবার কেহ বা স্নেহ-জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। ইহার দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, মানুষের ন্যায় উন্নত ধরনের প্রাণিদেহের অগ্ন্যাশয় রসের (Pancreatic juice) মোটামুটি সকল রাসায়নিক গুণাগুণই অল্পবিস্তর কেঁচোর পরিপাক রসে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ত্রের পঞ্চদশ (১৫শ) দেহখণ্ড হইতে ষড়বিংশতি (২৬শ) দেহখণ্ড পর্যন্ত অংশকে টিফ্লোসোল-পূর্ববর্তী অংশ বলে। (২৬শ খণ্ডক) ষষ্ঠবিংশতি দেহখণ্ডে অন্ত্রের দুই দিকে দুইটি কোণাকৃতি মাংসল অংশ দেখা যায়; ইহাদের নাম **আন্ত্রিক সিকা** (Intestinal Caeca)।

ত্রয়োবিংশতি দেহখণ্ড হইতে পঞ্চবিংশতি দেহখণ্ড পর্যন্ত অন্ত্রের যে-অংশ বিস্তৃত, তাহার নাম **মলনালী** (Rectum)। মলনালী পায়ুতে (Anus) শেষ হইয়াছে। পায়ু দিয়া কুণ্ডলীর আকারে মল নিষ্কাশিত হয়।

(২) জনন-তন্ত্র (Reproductive System)

জীবমাত্রেরই বিনাশ আছে। কিন্তু, জীবনের প্রবাহ কখনও স্তব্ধ হয় নাই। তাই, সকল জীবেরই অন্যতম প্রধান কর্তব্য ও প্রয়াস এই যে, নিজ দেহ মৃত্যুতে বিলীন হওয়ার পূর্বে আপন প্রজাতির নূতন কিছু প্রাণী সৃষ্টি করা। এই বিশেষ কার্য সম্পাদন করার নিমিত্ত কতগুলি বিশেষ যন্ত্র দেহের মধ্যে থাকে। এই যন্ত্র-সমষ্টির নাম জনন-তন্ত্র। অতএব, যে তন্ত্রের (System) দ্বারা জীব আপন দেহ-উপাদানের সাহায্যে স্ব-জাতীয় নূতন জীবের জন্ম দিতে পারে, তাহাকে জননতন্ত্র বলে। সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের প্রাণীদের

মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। পুরুষ মাত্রেরই জননকার্যের জন্য শুক্রাশয় (Testes) থাকে ; এখানেই শুক্রকীট তৈয়ারী হয় এবং স্ত্রী মাত্রেরই ডিম্বাশয় বা অণ্ডাশয় (Ovary) থাকে ; ইহাতে ডিম্ব তৈয়ারী হয়। ডিম্বের সহিত শুক্রকীটের মিলনে স্ব-জাতীয় নূতন প্রাণীর জন্ম হয়। কিন্তু, নিম্নস্তরের সকল প্রাণীর মধ্যে এই স্ত্রী-পুরুষ ভেদ দেখা যায় না। এই সকল ক্ষেত্রে পুরুষ এবং স্ত্রী, উভয় লিঙ্গই (শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয়) একই প্রাণীতে বর্তমান। এই সকল প্রাণীদের উভলিঙ্গ প্রাণী (Hermaphrodite) বলা হয়। সুতরাং, ইহাদের যে পুরুষ, সে-ই স্ত্রী। কেঁচো এই ধরনেরই প্রাণী। তথাপি, একই কেঁচোর ডিম সেই কেঁচোরই শুক্রকীট দ্বারা নিষিক্ত (Fertilised) (বা মিলিত) হয় না, অর্থাৎ প্রজননের জন্য একলিঙ্গ (Unisexual) প্রাণীদের ন্যায় দুইটি কেঁচোরই প্রয়োজন ; কারণ, অপরাপর উন্নতধরনের একলিঙ্গ প্রাণীদের ন্যায়, একের শুক্রকীট অপরের ডিম্বকে নিষিক্ত করে।

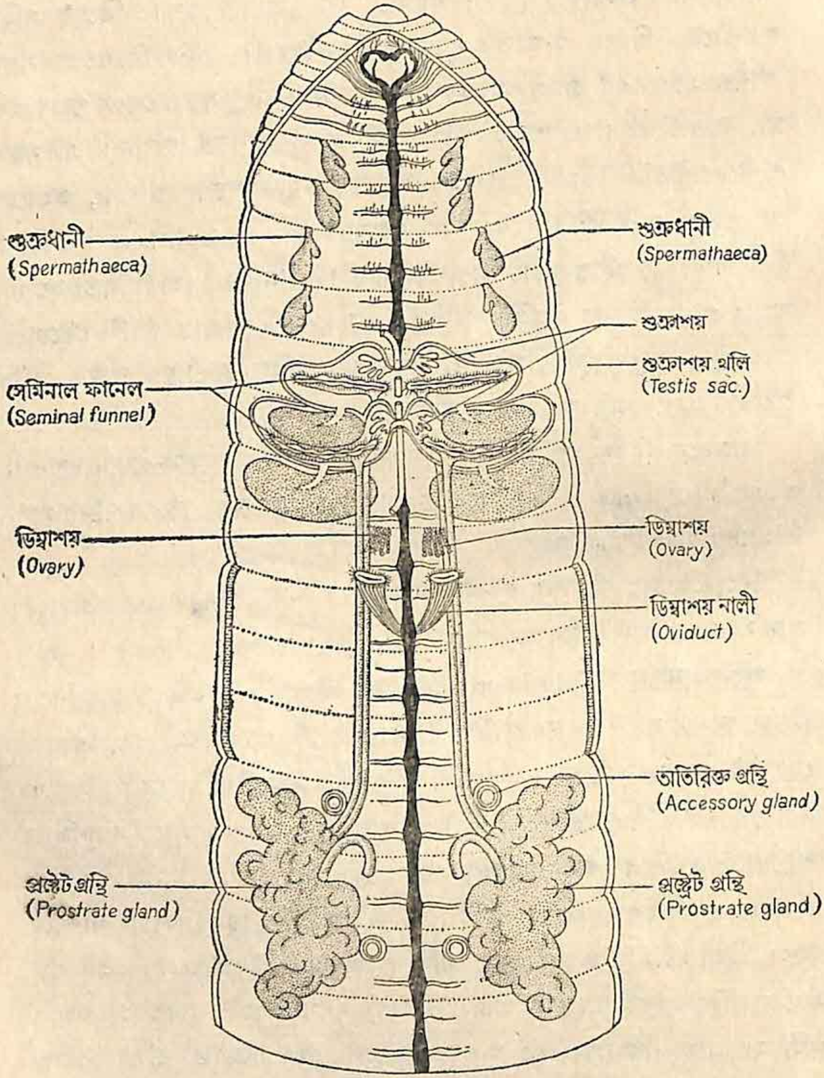
প্রজননে নিযুক্ত দুইটি প্রাণীর মধ্যে শুক্রকীটের আদান-প্রদান হয় এবং শুক্রধানী (Spermatheca) নামে দেহমধ্যস্থ এক ধরনের বিশেষ থলির মধ্যে তাহাদের রাখা হয়।

নিম্নে কেঁচোর পুং- এবং স্ত্রী-জনন-সংক্রান্ত অঙ্গ বা যন্ত্রসমূহ এবং তাহাদের কার্য সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হইল।

পুং-জননতন্ত্র (Male Reproductive System)—একটি কেঁচোর পিঠের দিকের চামড়া লম্বালম্বিভাবে কাটিলে গ্রাসনালীর দুই ধারে দশম এবং একাদশ দেহখণ্ডে অনুজ্জ্বল পীতবর্ণের দুইটি থলির ন্যায় বস্তু দেখা যাইবে। ইহাদের নাম শুক্রাশয় থলি (Testes Sac)। এই অঞ্চলের গ্রাসনালীকে সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া বাদ দিলে জনন-যন্ত্রগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। গ্রাসনালীর নিম্নে একাদশ ও দ্বাদশ দেহখণ্ডে আরও দুইটি থলি আছে ; ইহারা আকারে ক্ষুদ্র। ইহাদের নাম শুক্র-সংক্রান্ত থলি (Seminal Vesicle)। এই দুই ধরনের থলির সম্পর্ক অতি নিকট। কারণ, দশম এবং একাদশ দেহখণ্ডের থলি যথাক্রমে একাদশ এবং দ্বাদশ দেহখণ্ডের শুক্র-সংক্রান্ত থলির সহিত যুক্ত।

প্রতিটি শুক্রাশয় থলি সম্মুখের দিকে দুই ভাগে বিভক্ত। শুক্রাশয় থলির ভিতর সামনের দিকে একজোড়া **শুক্রাশয়** (Testes) এবং পিছনের দিকে একজোড়া **শুক্র-সংক্রান্ত চুঙ্গী** (Spermiducal Funnel) আছে। প্রতিটি

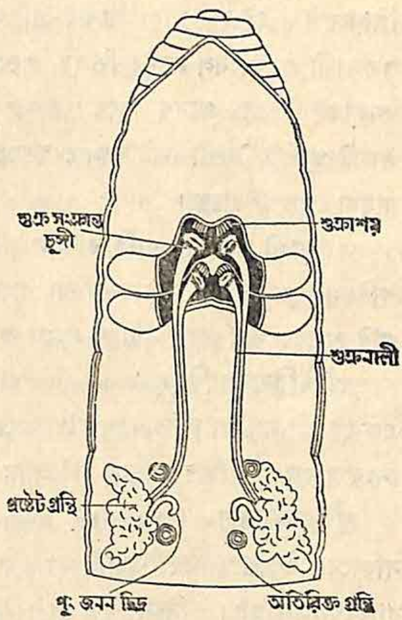
শুক্রাশয় থলি সেই পার্শ্বের শুক্র-সংক্রান্ত থলির সহিত সংযুক্ত। তাই, দশম খণ্ডকের শুক্রাশয় থলি একাদশ খণ্ডকের দুইটি শুক্র-সংক্রান্ত থলির সহিত এবং একাদশ



কেঁচোর জননতন্ত্র (Reproductive system)
[মধ্যরেখা বরাবর স্নায়ুতন্ত্র] দেখা যাইতেছে

খণ্ডকের শুক্রাশয় থলি দ্বাদশ খণ্ডকের দুইটি শুক্র-সংক্রান্ত থলির সহিত সংযুক্ত। প্রতিটি শুক্রাশয় থলি পিছনের দিকে সেই পার্শ্বের শুক্র-সংক্রান্ত থলির সহিত

মিলিত হইয়াছে। প্রতিটি শুক্রাশয় আকারে অতি ক্ষুদ্র এবং খালি চোখে দেখা শক্ত। দশম ও একাদশ, প্রতিটি দেহখণ্ডের মধ্যস্থলে ইহারা পাশাপাশি দুইটি করিয়া সাজানো। ইহাদের রং সাদা এবং আতস কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, প্রতিটি শুক্রাশয় চারিটি হইতে আটটি অঙ্গুলীর ন্যায় লম্বাকৃতি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এইগুলিতে **শুক্রকীট** তৈয়ারী হয়। শুক্রকীটগুলি অপরিণত অবস্থায় শুক্রাশয় হইতে শুক্র-সংক্রান্ত থলিতে (Spermiducal vesicle) যায়। এই স্থানেই ইহারা আহার্য রস গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া পরিণত আকার ধারণ করে এবং পরে পুনরায় শুক্রাশয় থলিতে ফিরিয়া যায়।



কেঁচোর পুং-জনন তন্ত্র
(Male reproductive System)

শুক্র-সংক্রান্ত চুঙ্গী (**Spermiducal Funnel**)—প্রত্যেকটি শুক্রাশয় থলির পিছন দিকে একটি করিয়া শুক্রসংক্রান্ত চুঙ্গী (Spermiducal funnel) থাকে। প্রতিটি চুঙ্গীর সামনের দিকে ফোঁদলের ন্যায় একটি বড় মুখ থাকে। ইহা ক্রমশঃ সরু হইয়া একটি নালীতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার নাম **শুক্রনালী** (**Spermiduct or vas deferens**)। কেঁচোর দেহের দুই ধারে দুইটি করিয়া এই ধরনের শুক্রনালী দ্বাদশ দেহখণ্ড হইতে লম্বালম্বিভাবে নীচের দিকে পাশাপাশি নামিয়া অষ্টাদশ দেহখণ্ডে শেষ হইয়াছে। এই স্থানে (অষ্টাদশ দেহখণ্ডে) প্রতি পার্শ্বের দুইটি করিয়া শুক্রনালী একটি অপেক্ষাকৃত মাংসল নলের (শুক্রনালী ও প্রস্টেট গ্রন্থিনালী) মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। শুক্রনালীর ভিতর দিয়া শুক্রকীট বাহিত হয়।

প্রস্টেট গ্রন্থি (**Prostate Gland**)—এই গ্রন্থি ষোড়শ অথবা সপ্তদশ দেহখণ্ড হইতে বিংশ অথবা একবিংশ দেহখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার রং সাদা এবং গ্রাসনালীর দুই ধারে অবিন্যস্তভাবে বিস্তৃত। এই গ্রন্থি হইতে

প্রতিপার্শ্বে একটি করিয়া নল বাহির হইয়া শুক্রনালী দুইটির পাশাপাশি গিয়াছে। এই নল দ্বারা প্রস্টেট গ্রন্থির রস বাহিত হয়। প্রতি পার্শ্বের দুইটি শুক্রনালী যে মাংসল নলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে প্রস্টেট গ্রন্থির নালীটিও তাহারই ভিতর প্রবেশ করে। অতএব, প্রতিপার্শ্বের দুইটি শুক্রনালী এবং একটি প্রস্টেট নালী অষ্টাদশ দেহখণ্ডের অংকভাগে অবস্থিত পুং-জননছিদ্রে যাইয়া শেষ হইয়াছে।

শুক্রনালী শুক্রকীট বাহিরে বহন করিয়া থাকে কিন্তু প্রস্টেট নালী প্রস্টেট গ্রন্থিরস পৃথক্‌ভাবে বহন করিয়া থাকে। এখনও পর্যন্ত, বস্তুতঃপক্ষে, প্রস্টেট গ্রন্থি রসের যথার্থ কার্যকারীতা সম্বন্ধে জানা যায় নাই।

অতিরিক্ত গ্রন্থি (Accessory gland)—সপ্তদশ এবং উনবিংশ দেহখণ্ডে এক জোড়া করিয়া অতিরিক্ত গ্রন্থি আছে। গোলাকৃতি এই গ্রন্থিগুলি হইতে নিঃসৃত রস সূক্ষ্ম ছিদ্র মাধ্যমে ৪টি জনন-গুল্মে (১৭ ও ১৯ খণ্ডকে) যায়।

স্ত্রী-জননতন্ত্র (Female Reproductive System)—স্ত্রী-জননতন্ত্রের সাহায্যে ডিম্বাশয়ে ডিম্ব তৈয়ারী হয় এবং পরিণত ডিম নালী দ্বারা বাহিত হইয়া বাহিরে নীত হয়। নিম্নলিখিত অংশগুলি লইয়া স্ত্রী-জননতন্ত্র গঠিত :—

(ক) **ডিম্বাশয়** (Ovary)—দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ দেহখণ্ডের মধ্যবর্তী ছেদক বা সেপ্টামের (Septum) পশ্চাদ্‌দেশে দুইটি ডিম্বাশয় পাশাপাশি অবস্থিত। শুক্রাশয়ের ন্যায় ডিম্বাশয়ও কয়েকটি দীর্ঘাকৃতি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। ইহারা অতিসূক্ষ্ম, সাদা রং-এর বস্তু। প্রত্যেকটি ডিম্বাশয়ে অপরিণত ও পরিণত বিভিন্ন আকারের ডিম দেখা যায়।

(খ) **ডিম্বাশয়চুঙ্গী** (Oviducal Funnel)—প্রতিটি ডিম্বাশয়ের নিম্নে একটি করিয়া চুঙ্গী আছে ; ইহার মুখটি বেশ বড় এবং পিছন দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া একটি নলে শেষ হইয়াছে। ইহাকে ডিম্বাশয় নালী (Oviduct) বলে। চুঙ্গীর মুখটি অনেকটা চাকীর ন্যায় এবং ত্রয়োদশ দেহখণ্ডে ডিম্বাশয়ের নিম্নে অবস্থিত। বলা বাহুল্য, ইহা বিশেষ লম্বা (শুক্রনালীর ন্যায় নহে)। পরিণত ডিম ডিম্বাশয় হইতে বাহির হইয়া চুঙ্গীর ভিতর দিয়া বাহিরে যায়। প্রতিটি ডিম্বাশয়নালী ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ দেহখণ্ডের ছেদকের পশ্চাতে মধ্য অংশে আসিয়া পরস্পরের সহিত যুক্ত হয় এবং একটি নালিতে পরিণত হয়। এই নালী চতুর্দশ দেহখণ্ডের অংকভাগে মধ্যরেখায় অবস্থিত স্ত্রী-জননছিদ্রে (Female Generative Aperture) যাইয়া শেষ হয়।

(গ) **শুক্রধানী** (Spermatheca)—চারিজোড়া শুক্রধানী, কেঁচোর দেহের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম দেহখণ্ডে গ্রাসনালীর দুই পার্শ্বে একটি করিয়া (Spermatheca) অবস্থিত। শুক্রধানীর দুইটি করিয়া অংশ আছে,—একটি অংশ অপেক্ষাকৃত গোলাকার থলির ন্যায়, অপরটি ইহারই সম্মুখভাগে অবস্থিত একটি সরু নল। ইহারা অনেকটা ঘটের ন্যায়। এই নল হইতে সূক্ষ্ম সরু একটি অংশ বাহির হইয়াছে। প্রজনন-সময়ে অপর কেঁচো হইতে যে-সকল পরিণত শুক্রকীট আসে, তাহারা সাময়িকভাবে গোলাকার থলির ভিতর সাধারণতঃ জমা থাকে। কিন্তু, ফেরিটিমা (আমাদের দেশে সচরাচর যে কেঁচো পাওয়া যায়)-তে গোলাকার থলি (Ampulla) হইতে যে সরু অংশটি বাহির হইয়াছে, তাহারই ভিতর শুক্রকীট জমা থাকে। প্রতিটি শুক্রধানী একটি ছিদ্রের সাহায্যে বাহিরের সহিত সংযুক্ত। শুক্রধানীর অভ্যন্তরে রক্ষিত শুক্রকীটগুলি প্রয়োজনমত ডিম্ব নিষেকের (নিষিক্তকরণের) কাজে ব্যবহৃত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদিও একই কেঁচোর দেহে পুং এবং স্ত্রী উভয়লিঙ্গই বর্তমান, তথাপি, একের শুক্রকীট অপরের ডিম্বকে নিষিক্ত করে, তাই এই প্রক্রিয়াকে **পরনিষেক** (Cross-Fertilization) বলে।

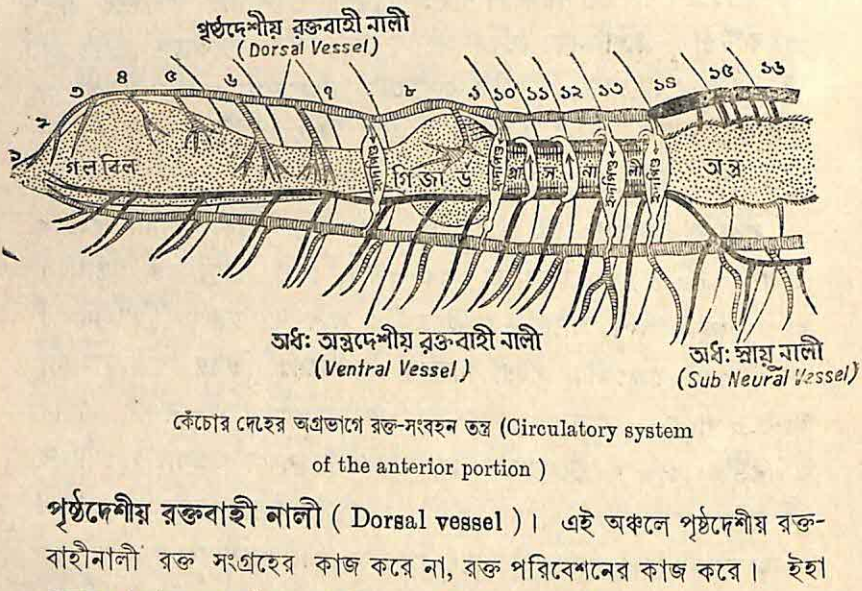
রক্ত-সংবহনতন্ত্র (Circulatory System)—জীবদেহ নানা-ধরনের কলার (tissue) সমন্বয়ে গঠিত ; যথা—অস্থি, পেশী, স্নায়ু, রক্ত ইত্যাদি। রক্তের দুইটি অংশ আছে,—একটি জলীয় অংশ বা রক্তরস (Plasma) এবং অপরটি রক্তকোষ লইয়া গঠিত। রক্তরসের ভিতর রক্তকোষগুলি ভাসিতে থাকে। কেঁচোর রক্তরসে যে রক্তকোষগুলি থাকে, সেগুলি বর্ণহীন ও নিউক্লিয়াসযুক্ত। উল্লেখযোগ্য যে, মানুষ সহ সকল স্তন্যপায়ীর লোহিত রক্তকণিকা (পরিণত) নিউক্লিয়াসবিহীন। রক্ত সমস্ত শরীরে সর্বক্ষণ দ্রুত চলাচল করিয়া দেহের নানা প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করে। আমাদের রক্ত দেখিতে লাল ; কারণ এক ধরনের কোষের (লোহিত রক্তকণিকা) ভিতর হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) নামে লাল রং-এর এক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। কেঁচোর রক্তও দেখিতে লাল, কিন্তু হিমোগ্লোবিন কোনও কোষের ভিতর থাকে না, রক্তরসের সহিত মিশ্রিত থাকে। দেহের একাংশ হইতে অপরাংশে যে নালীর মাধ্যমে রক্ত চলাচল করে, তাহাকে রক্তবাহী নালী বলে।

কেঁচোর রক্ত-সংবহনতন্ত্রে দুই ধরনের ব্যবস্থা দেখা যায়। দেহের প্রথম ১৩টি দেহখণ্ডের রক্ত-সংবহন ব্যবস্থা পরবর্তী দেহখণ্ডগুলির রক্ত-সংবহন

ব্যবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। এখন আমরা এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দেহের পুরোভাগে সপ্তম (৭) হইতে ত্রয়োদশ (১৩) দেহখণ্ডের মধ্যে কয়েকটি স্ফীত রক্তবাহী নালী আছে। ইহাদের **হৃৎপিণ্ড (Heart)** বলে। কতকগুলি রক্তবাহী নালীর মধ্যে কপাটিকা থাকায় এবং সাধারণভাবে রক্তবাহী নালীগুলি সংকোচন ও প্রসারণশীল হওয়ার ফলে কেঁচোর দেহে রক্ত নির্দিষ্ট পথে চলাচল করিতে পারে।

(ক) দেহের মধ্যরেখা বরাবর রক্তবাহী নালীসমূহ—কেঁচোর দেহে লম্বালম্বিভাবে তিনটি বড় রক্তবাহী নালী আছে; একটি পৌষ্টিক নালীর (Alimentary canal) উপরিভাগে অবস্থিত। ইহার নাম



কেঁচোর দেহের অগ্রভাগে রক্ত-সংবহন তন্ত্র (Circulatory system of the anterior portion)

পৃষ্ঠদেশীয় রক্তবাহী নালী (Dorsal vessel)। এই অঞ্চলে পৃষ্ঠদেশীয় রক্তবাহীনালী রক্ত সংগ্রহের কাজ করে না, রক্ত পরিবেশনের কাজ করে। ইহা দেহের পশ্চাৎ অংশ হইতে আসিয়া গলবিল অংশের উপর দিয়া সম্মুখভাগে আসিয়া মস্তিষ্কের অঞ্চলে আসে ও তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গলবিলের উপর ও মুখগহ্বরের ভিতর রক্ত পরিবেশন করে। অপরটি ইহার অংকভাগে অবস্থিত, ইহার নাম **অধঃপৌষ্টিক রক্তবাহী নালী** (Ventral vessel)। **অধঃপৌষ্টিক রক্তবাহী নালী** দেহের পশ্চাৎ অংশ হইতে আসিয়া সম্মুখভাগে দ্বিতীয় খণ্ডক (2nd Segment) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রতি খণ্ডকে এই নালী হইতে শাখানালী উভয় পার্শ্বে বাহির হইয়া দেহ-প্রাকার (Body-wall),

ছেদক (septa) এবং বৃক্ক নালীতে রক্ত পরিবেশন করে। ইহা ব্যতীত, দেহের জনন-অংশসমূহে (জনন-অংশগুলি এই অঞ্চলে অর্থাৎ দেহের অগ্রভাগে অবস্থিত।) রক্ত পরিবেশন করে। ইহা ব্যতীত লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত আরও কয়েকটি নালী আছে ; যেমন, নার্ভরজ্জুর নিম্নে অবস্থিত **অধঃস্নায়ু রক্তবাহী নালী** (Sub-neural vessel)। চতুর্দশ (১৪) দেহখণ্ডের অগ্রবর্তী অংশে ইহা ২ ভাগে গ্রাসনালীর উপরিস্থিত রক্তবাহী নালীতে (Lateral œsophageal) বিভক্ত হইয়াছে। দেহের প্রথম ১৩টি খণ্ডকে দেহের দুইপার্শ্বের এই নালী দুইটি বেশ স্পষ্ট। কতকটা আমাদের ন্যায় কেঁচোর হৃৎপিণ্ডেরও সঙ্কোচন ও প্রসারণ হয়, আর তাহারই ফলে রক্ত চলাচল করে। দেহের অগ্রভাগে প্রথম ১৪টি দেহখণ্ডে দেখা যায় যে, এই **পৃষ্ঠদেশীয় রক্তবাহী নালী** অধঃপৌষ্টিক রক্তবাহী নালীর সহিত চারি জোড়া ক্ষুদ্র **ফাঁসনালী** (Loops) দ্বারা গ্রাসনালীর দুই পার্শ্বে একে অপরের সহিত যুক্ত। এই ফাঁসনালীগুলিকেই **হৃৎপিণ্ড** (Heart) বলে। ইহাদের মধ্যে শেষের দুই জোড়ায় অর্থাৎ দ্বাদশ (১২) ও ত্রয়োদশ (১৩) দেহখণ্ডে অবস্থিত নালী দুইটির সহিত **অন্ত্র-উর্ধ্ব** (Supra-intestinal) রক্তবাহী নালী হইতে একটি করিয়া শাখানালী আসিয়া মিলিত হয়। নবম হইতে চতুর্দশ দেহখণ্ড পর্যন্ত গ্রাসনালীর দুই পার্শ্বে আর একটি করিয়া যে রক্তবাহী নালী আছে, তাহারই নাম অন্ত্র-উর্ধ্ব রক্তবাহী নালী। কিন্তু গ্রাসনালীকে ঘিরিয়া যথাক্রমে সপ্তম এবং নবম দেহখণ্ডে আরও যে দুইটি রক্তবাহী ফাঁসনালী আছে, তাহাদের সহিত ইহাদের যোগ নাই।

(খ) হৃদপিণ্ড ও অগ্রবর্তী ফাঁসনালী—

দেহের এই অংশের রক্তসংবহন নিম্নলিখিত অংশগুলি লইয়া গঠিত :—

(ক) দেহের মধ্যরেখা বরাবর রক্তবাহী নালীসমূহ,

(খ) হৃদপিণ্ড ও অগ্রবর্তী ফাঁসনালী,

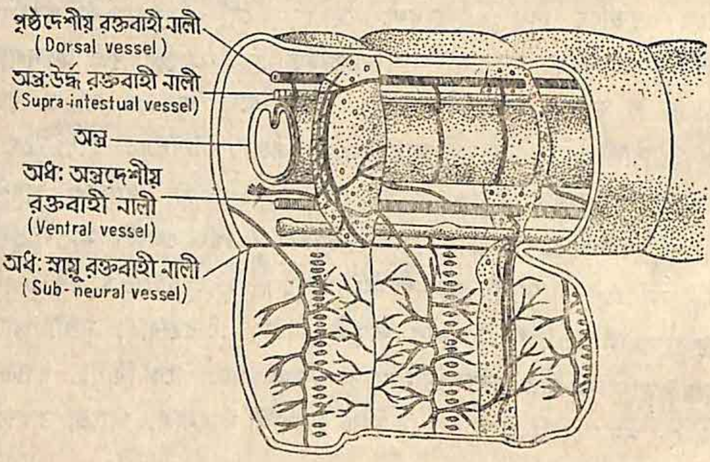
(গ) অন্ত্রের রক্তবাহী নালীসমূহ।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, দেহের অগ্রভাগের রক্ত সংগ্রহ (collection) করিবার নিমিত্ত গ্রাসনালীর উপরিস্থিত রক্তবাহী নালী (Supra-œsophageal) এবং দেহের দুই পার্শ্বের অঞ্চল হইতে রক্ত সংগ্রহের নিমিত্ত গ্রাসনালীর পার্শ্বদেশীয় রক্তবাহী নালী (Lateral œsophageal) দুইটি নিযুক্ত।

বস্তুতঃ দেহের ত্রয়োদশ (১৩) দেহখণ্ডের পশ্চাতে পৃষ্ঠদেশীয় নালী ও অধঃপৌষ্টিক নালীর (অঙ্কীয় নালীর) মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই। কিন্তু, দেহের অগ্রভাগে ইহারা ৭ম, ৯ম, ১২শ এবং ১৩শ দেহখণ্ডে পূর্বে বর্ণিত সংকোচনশীল হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে যুক্ত।

(গ) অন্ত্রের রক্তবাহী নালীসমূহ—

অন্ত্রের বাহিরের প্রাচীরে দশম হইতে ত্রয়োদশ খণ্ডক পর্যন্ত প্রতি খণ্ডকে প্রায় ১২টি হিসাবে অতিসূক্ষ্ম রক্তবাহী নালী আসিয়াছে। ইহারা উপরের দিকে অন্ত্র-উর্ধ্ব ও অঙ্কীয়দিকে গ্রাসনালীর পার্শ্বদেশীয় রক্তবাহী নালীর সহিত মিলিত হইয়াছে।



কেঁচোর দেহের পশ্চাদ্ভাগের রক্ত চলাচল ব্যবস্থা দেখানো হইয়াছে

ত্রয়োদশ খণ্ডকের পিছনে বা অন্ত্র অঞ্চলে রক্তবাহী নালীর বিন্যাস—

দেহের অগ্রভাগের ন্যায় এই অঞ্চলেও তিনটি প্রধান রক্তবাহী নালী দেহের লম্বরেখা বরাবর আছে। (১) পৃষ্ঠদেশীয় রক্তবাহী নালীটিই প্রধান ও মোটা। ইহা এই অঞ্চলে দেহের প্রতি খণ্ডকে অন্ত্র হইতে একটি (Dorso-instestinalis) ও সংযোগী নালী একটির (Commissural) সহিত যুক্ত। (২) অংকীয় নালীর (অধঃপৌষ্টিক) মোটামুটিভাবে দেহের অগ্রভাগের ন্যায়ই এই অঞ্চলেও বিন্যাস (৩) অধঃস্নায়ু রক্তবাহী নালী। (**Sub-neural blood vessel**)—দেহের অঙ্কীয় দিকে মধ্যরেখা বরাবর

নার্ভ রজ্জুর নিম্নে লম্বালম্বিভাবে একটি রক্তবাহী নালী আছে। ইহাই অধঃস্নায়ু রক্তবাহী নালী। দেহের পশ্চাৎপ্রান্ত হইতে চতুর্দশ দেহখণ্ড পর্যন্ত ইহা বেশ সরু এবং এক জোড়া পার্শ্বনালী (Commissural vessel)-এর সাহায্যে এই অঞ্চলে দেহের প্রতি খণ্ডকে পৃষ্ঠদেশীয় রক্তবাহী নালীর সহিত যুক্ত। (স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্রয়োদশ দেহখণ্ডে ইহা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গ্রাসনালীর উভয় পার্শ্ব দিয়া গ্রাসনালীর 'পার্শ্বনালী' নামে অপেক্ষাকৃত মোটা দুইটি নালীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।) ইহা দেহ-প্রাকারের অংকীয় অঞ্চল ও অংকীয় নার্ভরজ্জু হইতে রক্ত সংগ্রহ করে। এই রক্তবাহী নালীতে রক্ত পিছনের দিক হইতে সামনের দিকে চলাচল করে।

দেহের বিভিন্ন রক্তবাহী নালিতে রক্ত চলাচল পদ্ধতি—

শরীরে রক্ত চলাচলের পদ্ধতি **পৃষ্ঠদেশীয় রক্তবাহী** নালীতে এবং অধঃ-পৌষ্টিক রক্তবাহী নালীতে ভিন্ন প্রকারের। **পৃষ্ঠদেশীয় রক্তবাহী** নালীতে রক্ত দেহের পিছন হইতে সামনের দিকে যায়। এই নালীটি কেঁচোর দেহে বস্তুতঃ দুইটি ভিন্ন কার্য সম্পাদন করে দেহের দুই অঞ্চলে। দেহের পিছন দিকে, অর্থাৎ ১৩শ খণ্ডকের পিছন হইতে দেহের শেষ পর্যন্ত ইহার একমাত্র কার্য শাখা-নালীর সাহায্যে রক্ত সংগ্রহ করা, —রক্ত বিতরণ বা পরিবেশন করা নয়। কিন্তু ১৩শ খণ্ডক হইতে দেহের সম্মুখভাগ পর্যন্ত ইহার একমাত্র কার্য রক্ত পরিবেশন করা,—রক্ত সংগ্রহ নহে। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, একই নালী দেহের দুইটি ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন কার্য সমাধা করিতেছে। কিন্তু পশ্চাৎ অংশে **অঙ্কীয় অধঃপৌষ্টিক রক্তবাহী নালীতে** রক্ত সামনের দিক হইতে পিছন দিকে চলাচল করে, ইহা হৃদপিণ্ডের পিছনে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত পরিবেশন করে।

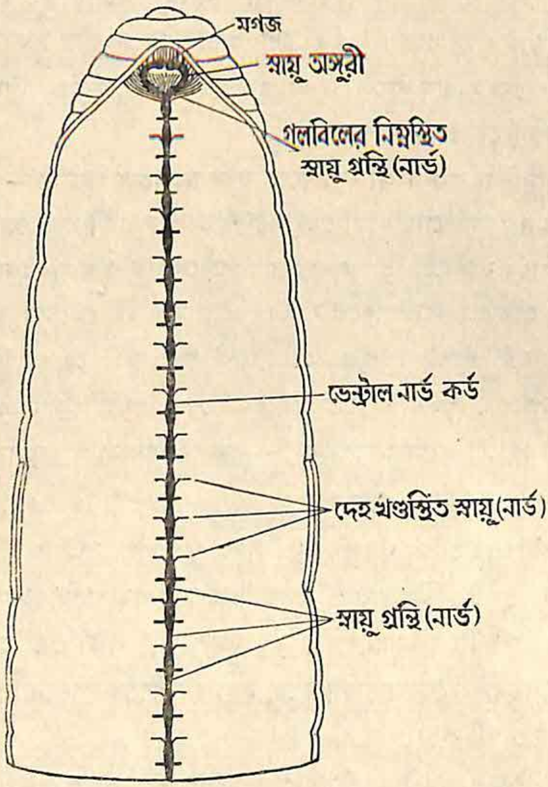
অধ পৌষ্টিক রক্তবাহী নালীতে রক্ত দেহের অগ্র অংশে পশ্চাৎভাগ হইতে সম্মুখভাগে প্রবাহিত হয়।

(৩) **স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)**

জীবদেহের সংবেদনশীল তন্ত্রের নাম **নার্ভ- বা স্নায়ুতন্ত্র** (Nervous system)। পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত প্রাণীর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলার ইহাই একমাত্র মাধ্যম। উন্নত ধরনের প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা ও মেধার ইহাই উৎস। ইহারই সাহায্যে সুখ-দুঃখের, ভালমন্দের, পছন্দ-অপছন্দের অনুভূতি পাওয়া যায়। কয়েকটি নার্ভকোষ বা স্নায়ুকোষের সমন্বয়ে ইহা গঠিত।

কেঁচোর স্নায়ুতন্ত্রের নিম্নলিখিত কয়েকটি অংশ আছে—

দেহের অগ্রভাগে একটি স্নায়ু বা **নার্ভ-অঙ্গুরী** গলবিলকে (Pharynx) ঘিরিয়া অবস্থিত। ইহা গলবিলের উপরে অবস্থিত নার্ভগ্রন্থির (Ganglion) সহিত স্নায়ু বা গলবিলের নিম্নে অবস্থিত নার্ভগ্রন্থিকে যুক্ত করিয়াছে। গলবিলের উপরে দ্বিতীয় দেহখণ্ডে এক জোড়া সেরিব্রাল (Cerebral) নার্ভগ্রন্থি অবস্থিত।



কেঁচোর স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)

এই গ্রন্থি দুইটি এত ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিত যে, ইহাদের দেখিলে একটি গ্রন্থি বলিয়াই মনে হয়। ইহাদেরই **মগজ** (Brain) বলে। এই গ্রন্থি ২টি হইতে কতকগুলি শাখা নার্ভ বাহির হইয়া মাথার দিকে যায়। গলবিলের নিম্নে চতুর্থ দেহখণ্ডে আর একটি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের অধঃগলবিল নার্ভগ্রন্থি (Sub-pharyngeal Ganglion) আছে। ইহারও অনেক শাখা আছে। গলবিলকে দুই পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া এক জোড়া নার্ভ উপরিস্থিত গ্রন্থির সহিত নিম্নের

গ্রন্থিকে যুক্ত করিতেছে। গলবিলকে বেষ্টন করার ফলে ইহা দেখিতে গোলাকৃতি, ইহার নাম স্নায়ু অঙ্গুরী।

গলবিলের নিম্নস্থিত নার্ভগ্রন্থি হইতে মোটা সুতার ন্যায় দুইটি নার্ভ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিতে একটি সুতার ন্যায় হইলেও, বস্তুতঃ, দুইটি নার্ভ লইয়া ইহা গঠিত। ইহার নাম **ভেণ্ট্রাল নার্ভ-কর্ড** বা অঙ্কীয় নার্ভরজ্জু (Ventral Nerve Cord)। প্রতি দেহখণ্ডে এই নার্ভ কর্ডে একটি করিয়া গ্রন্থি আছে। ইহা শেষ দেহখণ্ড পর্যন্ত গিয়াছে।

উপরে উল্লিখিত গলবিলের উপরিস্থিত এবং নিম্নস্থিত নার্ভগ্রন্থি হইতে এবং নার্ভ-কর্ডের প্রতি দেহখণ্ডস্থ গ্রন্থি হইতে সূক্ষ্ম নার্ভ বাহির হইয়া দেহের বিভিন্ন স্থানে গিয়াছে। ইহারা চামড়া এবং দেহের অন্যান্য অংশ হইতে অনুভূতি লইয়া স্নায়ু-কেন্দ্রে যায় এবং স্নায়ু-কেন্দ্র হইতে সঞ্চারিত উত্তেজনা দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয় ইহাদের দ্বারাই।

মৃত্তিকা-গঠনে কেঁচোর ভূমিকা

যে সকল প্রাণী মানুষের উপকার সাধন করিয়া থাকে, কেঁচো তাহাদের অন্যতম। ইহাদের উপকার প্রত্যক্ষভাবে আমাদের চোখে পড়ে না, তথাপি আমাদের অলক্ষ্যে ইহারা আমাদের উপকার করিয়া থাকে। কৃষিক্ষেত্রে ইহাদের দান বিস্ময়কর। ইহারা মাটিতে গর্ত করিয়া বাস করে। তাই চাষের জমি প্রচুর পরিমাণে ইহারা কর্ষণ করিয়া থাকে। মাটিতে গর্ত করিবার সময় নীচের মাটি ইহারা উপরে তোলে এবং ইহাতে শস্য বপনের উপযোগী জমি তৈয়ারী হয়। ইহারা খাদ্যবস্তুর সহিত যথেষ্ট পরিমাণ মাটি ভক্ষণ করে এবং সেই মাটি খাদ্যাবশিষ্টের সহিত বিষ্ঠা-কুণ্ডলীরূপে ত্যাগ করে। ৪০ বৎসরের অধিককাল পর্যবেক্ষণ করিয়া মহামতি ডারউইন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, এক একর জমিতে ৫০ হাজার কেঁচো বাস করিতে পারে এবং ইহারা এক বৎসরে ১৪ হইতে ১৮ টন মাটি নীচে হইতে উপরে তুলিতে পারে। বিজ্ঞানী হেনসন্ (Henson)-এর হিসাব মত ১ একর জমিতে প্রায় ৫৩ হাজার কেঁচো বাস করে এবং ইহারা ১০ টন মাটি বিষ্ঠাকুণ্ডলীরূপে ত্যাগ করে। এইরূপে ক্রমাগত নীচের মাটি উপরে উঠানোর ফলে মাটি বাতাস হইতে আর্দ্রতা গ্রহণ করিয়া থাকে এবং চাষের উপযোগী উন্নত ধরনের জমি তৈয়ারী হয়।

অনুশীলনী

1. কেঁচোর পৌষ্টিকনালীর বর্ণনা কর। ইহা কোন্ কোন্ প্রকার খাদ্যবস্তু হজম করিতে পারে ?

2. উভলিঙ্গ প্রাণী কাহাদের বলে ? পুং-কেঁচোর জননতন্ত্র বর্ণনা কর।

3. রক্ত কাহাকে বলে ? কেঁচোর রক্তের রং লাল কেন ? কেঁচোর রক্ত-সংবহনতন্ত্রের প্রধান রক্তবাহী নালী কি কি ? ছবির সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

4. স্নায়ুর কাজ কি ? কেঁচোর নার্ভতন্ত্র বলিতে কি বুঝ ?

5. কেঁচো কিভাবে মানুষের উপকার করে ? ইহাকে "কৃষকের বন্ধু" (Farmer's friend) বলা হয় কেন ? [H. S. 1963]

6. টীকা লিখ :—

(ক) স্বনিষেক ও পরনিষেক, (খ) টিফ্‌লোসোল, (গ) খমির বা উৎসেচক, (ঘ) আন্ত্রিক সিকা, (ঙ) শুক্রধানী।

7. কেঁচোর দেহের অন্ত্রের প্রস্থচ্ছেদের বর্ণনা কর। [H. S. 1966]

Questions to be discussed

1. Describe the allimentary system of an Earthworm and state the types of food that it can digest.

2. What are hermaphrodites ? Describe the male reproductive system of an Earthworm.

3. What is blood ? Why is it red in colour in Earthworms ? Describe the main blood vessels of an Earthworm with diagram.

4. What are the functions of a nerve ? Describe the nervous system of an Earthworm with diagram.

5. State how Earthworm is beneficial to man. Why it is called "Farmer's friend" ? [H. S. 1963]

6. Write short notes on :—(a) Self- and cross-fertilization, (b) Typhlosole, (c) Enzyme, (d) Intestinal caeca, (e) Spermatheca.

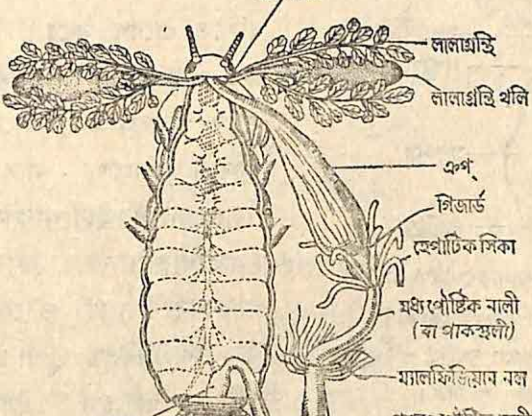
7. Describe the cross-section passing through the intestinal region of an Earthworm. [H. S. 1966]

(খ) আরশোলা (Periplaneta americana)

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, আরশোলা পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত প্রাণী। ইহারা সাধারণতঃ শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য খাইয়া থাকে। নিম্নে ইহাদের (১) পৌষ্টিক তন্ত্র ও (২) শ্বাসতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল:

(১) **পৌষ্টিক তন্ত্র** (Alimentary system)—ইহাদের দেহাভ্যন্তরে একটি দীর্ঘ নালীর মধ্যে পরিপাক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহার নাম পৌষ্টিক নালী (Alimentary Canal)। পৌষ্টিক নালী ও ইহার সহিত সংযুক্ত এক জোড়া লালাগ্রন্থি লইয়া পৌষ্টিকতন্ত্র গঠিত। এই তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল:—

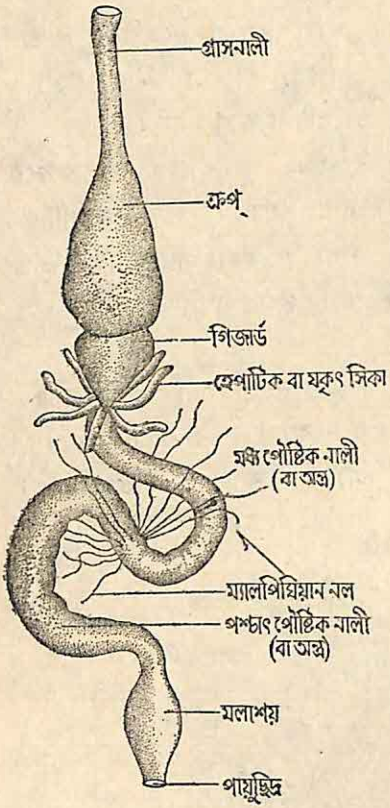
পৌষ্টিক নালী (Alimentary Canal)—ইহা লম্বা ফাঁপা নলের ন্যায় এবং প্রধানতঃ তিনটি অংশে বিভক্ত; যথা—(ক) অগ্র (Stomodaeum), (খ) মধ্য (Mesenteron) এবং (গ) পশ্চাৎ (Proctodaeum)



আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্র (লালাগ্রন্থি সমেত)

পৌষ্টিক নালী। ইহার মধ্যে অগ্র এবং পশ্চাদ্‌ভাগের ভিতর দিকে একটি কৃত্তিকাবরণী আছে, কিন্তু মধ্যভাগে এইরূপ কিছুই নাই। মধ্য পৌষ্টিক নালীর কোষ হইতে নানাপ্রকার রস নিঃসৃত হয় এবং ইহা খাদ্যবস্তু হজম করার কাজে সহায়তা করে। বস্তুতঃ, পৌষ্টিক নালীর এই মধ্যভাগে এবং

অন্ত্রে খাদ্যের সারবস্তু দেহাভ্যন্তরে শোষিত হয়। নিম্নে এই তিনটি ভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

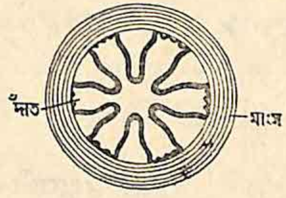


আরশোলার পৌষ্টিক নালী
(Alimentary canal)
[চিত্রের অগ্রভাগে মুখছিদ্র ও মুখবিবর দেখান হয় নাই ।]

(ক) **অগ্রভাগ** (Stomodaeum) —ইহাকে মোটামুটিভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—মুখ-ছিদ্রের পরবর্তী অংশ বা মুখবিবর (Buccal cavity)। মুখছিদ্রের ভিতর দিয়া খাদ্যবস্তু মুখবিবরে আসিয়া লালার সহিত মিশ্রিত হয় এবং শীঘ্রই পরবর্তী অংশ গলবিলে (Pharynx) প্রবেশ করে। এই অংশটি স্বল্পায়তন এবং ইহার ভিতর দিয়া খাদ্যবস্তু গ্রাসনালীতে (Oesophagus) প্রবেশ করে। ইহা একটি ছোট নলের ন্যায় এবং ক্রমশঃ বক্ষদেশে যাইয়া এই নলটি একটি বড় থলিতে প্রবেশ করে। ইহার নাম ক্রপ (Crop)। এখানে সাময়িক-ভাবে খাদ্যবস্তু জমা থাকে। ইহার পরবর্তী অংশের নাম **গিজার্ড** (Gizzard)। ইহা আকারে অনেকটা ত্রিকোণাকৃতি এবং ইহার ভিতরের কৃত্তিকাবরণী ছয়টি ভাঁজে (পরপৃষ্ঠায় চিত্র দেখ) বিভক্ত হইয়া ছয়টি খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা দেখিতে অনেকটা দাঁতের ন্যায়। ইহা কতকটা ছাঁকনীর ন্যায় কাজ করে অর্থাৎ খাঁজের ভিতর দিয়া খাদ্যবস্তু যাইবার সময় ইহা কঠিন খাদ্যবস্তুকে আট্‌কাইয়া রাখে এবং শুধুমাত্র তরলাংশই পৌষ্টিক নালীর পরবর্তী অংশে যায়।

(খ) **মধ্যভাগ**—গিজার্ডের পরবর্তী অংশ হইতে এই অংশের শুরু। ইহা আয়তনে ক্ষুদ্র। ইহার শুরুতে আঙুলের ন্যায় সরু সরু কয়েকটি একমুখ বন্ধ নলের ন্যায় বস্তু আছে—ইহাদের নাম **হেপাটিক সিকা** (Hepatic Caeca)।

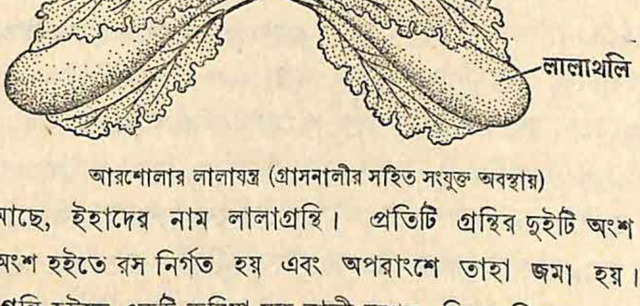
সংখ্যায় ইহারা ৭।৮টি হয়। মধ্য-এবং পশ্চাৎ-পৌষ্টিক নালীর সংযোগস্থলে সরু সরু কয়েকটি চুলের ন্যায় নল থাকে—ইহাদের বলা হয় ম্যালপিঘিয়ান নল (Malpighian tubule)। ইহারা সংখ্যায় প্রচুর এবং বিশেষ করিয়া নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্যবস্তু শোষণ করিয়া কতকাংশে ইহা বৃক্ক-যন্ত্রের (kidney) ন্যায় কাজ করে; অর্থাৎ দেহের তরল দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনে সাহায্য করে।



গিজার্ডের প্রস্থচ্ছেদ

(গ) **পশ্চাদ্ভাগ**—পৌষ্টিক নালীর শেষাংশ **ক্ষুদ্র** (small) এবং **বৃহৎ** (large) **অন্ত্রে** (Intestine) বিভক্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অন্ত্রে খাদ্যের সারবস্তু শোষিত হয়। বৃহদন্ত্র ক্রমশঃ **মলনালীতে** (Rectum) শেষ হইয়াছে। মলনালীর ভিতরের দেওয়ালে ৬টি ভাঁজ আছে এবং ইহারা মল হইতে অতিরিক্ত জল শোষণ করিয়া লয়। মলনালী ক্রমশঃ **পায়ুছিদ্রে** (Anus) শেষ হইয়াছে এবং ইহার ভিতর দিয়া মল বাহির হয়।

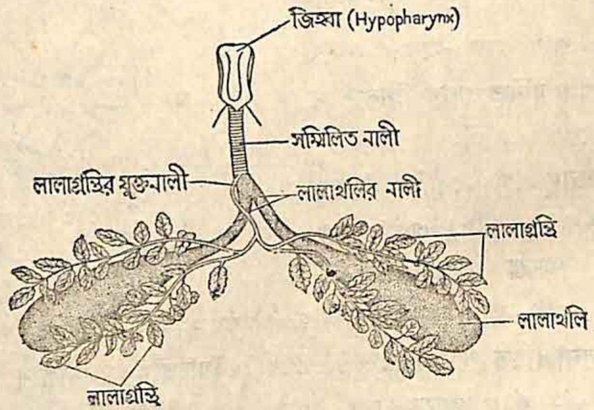
লালাগ্রন্থি (Salivary Gland)—শ্বাসনালীর দুই ধারে এক জোড়া



আরশোলার লালাযন্ত্র (গ্রাসনালীর সহিত সংযুক্ত অবস্থায়)

গ্রন্থি আছে, ইহাদের নাম লালাগ্রন্থি। প্রতিটি গ্রন্থির দুইটি অংশ আছে। একটি অংশ হইতে রস নির্গত হয় এবং অপরাংশে তাহা জমা হয়। প্রতি পার্শ্বের গ্রন্থি হইতে একটি করিয়া সরু নালী মুখের দিকে গিয়াছে। এইভাবে

দুই পার্শ্বের গ্রন্থির দুইটি নালী গ্রাসনালীর উপরিভাগে মিলিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে, প্রতি পার্শ্বের থলি হইতে একটি করিয়া নালী বাহির হইয়াছে এবং কিছুদূরে আসিয়া উভয় লালাগ্রন্থি-নালী একত্রে মিশিয়াছে। এই সাধারণ নালীর সহিত গ্রন্থির মিলিত-নালী একত্রিত হইয়া একটি সম্মিলিত



আরশোলার লালাযন্ত্র—(গ্রাসনালী বিযুক্ত অবস্থায়)

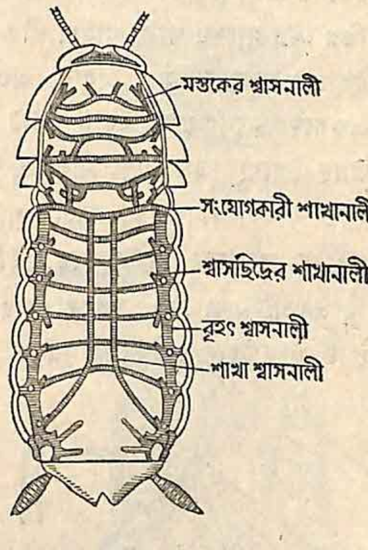
নালীতে পরিণত হইয়াছে। ইহা ক্রমশঃ সম্মুখদিকে অগ্রসর হইয়া জিহ্বায় শেষ হইয়াছে। এই গ্রন্থির নিঃসৃত রসকে লালা বলে এবং ইহা দেখিতে পরিষ্কার জলের ন্যায়। শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যকে পরিপাকে সহায়তা করার গুণ এই রসের আছে। ইহা খাদ্যবস্তুকে ভিজাইয়া নরম করে এবং মুখের বিভিন্ন অংশকে ভিজাইয়া রাখে। মনে রাখিবে, নালীসমেত লালাগ্রন্থি পৌষ্টিক তন্ত্রের একটি অংশ। এই গ্রন্থির গ্রাসনালীর সহিত সংযুক্ত অবস্থায় এবং গ্রাসনালীর সহিত বিযুক্ত অবস্থায় দুইটি চিত্র দেওয়া হইল।

(২) **শ্বাসতন্ত্র (Respiratory system)**—যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে তাহাকে শ্বাসতন্ত্র (Respiratory system) বলে। বায়ু বা জল হইতে প্রাণিদেহ কর্তৃক অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করাকে মোটামুটিভাবে বহিঃশ্বাসকার্য (External Respiration) বলে। দেহের প্রতিকোষের এই O_2 গ্রহণ ও CO_2 বর্জন প্রক্রিয়াকে অন্তঃশ্বাসকার্য (Internal Respiration) বলে। জীবনধারণের জন্য প্রাণীমাত্রেরই এই শ্বাসকার্য অতিমাত্রায় প্রয়োজনীয়। ইহা ব্যতিরেকে প্রাণী বাঁচিতে পারে না।

আরশোলা স্থলে বাস করে এবং বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ এবং দেহ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুতেই ত্যাগ করে। এই কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য ইহাদের

দেহে যে ব্যবস্থা আছে, তাহাকেই ইহাদের শ্বাসতন্ত্র বলে। দেহের প্রতিটি কোষের সঞ্চিত খাদ্যবস্তুকে অক্সিজেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দাহ করে এবং ইহারই ফলে উদ্ভূত শক্তির সাহায্যে তাহার প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করে। নিম্নে এই তন্ত্র বর্ণনা করা হইল :

আরশোলার দেহে বায়ু প্রবেশ করার জন্য পিঠের দিকে দশ জোড়া **শ্বাসছিদ্র** (Spiracle) আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুই জোড়া বক্ষদেশে অবস্থিত এবং বাকী আট জোড়া উদরের আটটি দেহখণ্ডের প্রতি পার্শ্বে একটি করিয়া থাকে। প্রতিটি শ্বাসছিদ্রের মুখে বাতাস প্রবেশ করা ও নির্গত হওয়া—এই ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি করিয়া কপাটিকা (valve) আছে। দেহের মাংসপেশী প্রয়োজনমত সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হওয়ার ফলে শ্বাস-ছিদ্রেরও ঢাক্‌নিটি উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হয়। প্রতিটি শ্বাসছিদ্র একটি করিয়া ক্ষুদ্র শ্বাসনালীর সহিত সংযুক্ত। প্রতিটি শ্বাসনালী আবার দেহের অভ্যন্তরে একটি বৃহৎ শ্বাসনালীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। দেহে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত এইরূপ দুইটি শ্বাসনালী আছে। ইহারা প্রতি দেহখণ্ডে আড়াআড়ি-ভাবে একে অপরের সহিত ক্ষুদ্র শ্বাসনালীর দ্বারা যুক্ত। প্রতিটি বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র শ্বাসনালী হইতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর শাখানালী বাহির হইয়াছে। সর্বশেষে, ক্ষুদ্রতম নালীগুলি দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করে। বাতাস হইতে কোষগুলি অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। দেহের মাংসপেশী, বিশেষ করিয়া উদরের মাংসপেশী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইবার ফলে শ্বাসনালীগুলিও সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় এবং এইভাবে নালীমধ্যে স্বাভাবিকভাবে গ্যাস চলাচল করিতে পারে।



আরশোলার শ্বাসতন্ত্র (Respiratory system)

(গ) প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্ত (Life-history of Butterfly)

যে-সকল প্রাণীর সৌন্দর্য মানুষের মনকে মুগ্ধ করে, প্রজাপতি তাহাদের অন্যতম। ইহা ব্যতীতও, গাছের বংশ-বিস্তারে পরাগযোগ-ক্রিয়া বহুলাংশে প্রজাপতির সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত প্রাণী। প্রজাপতি তোমরা সকলে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহাদের বেশ জমকালো রঙচঙে দুই জোড়া ডানা আছে—উহাতেই ইহাদের এত রূপ!

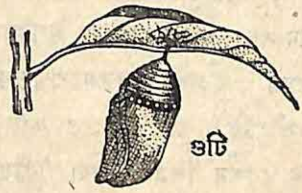
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রজাপতি পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত প্রাণী ; তাই, ইহাদের জীবনেও অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় **চারিটি** অবস্থা আছে। আমাদের দেশে নানা ধরনের প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতির শূককীট ভিন্ন ভিন্ন গাছের পাতা খাইয়া জীবনধারণ করে ; তাই, এই সকল গাছের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। ইহারা একলিঙ্গ প্রাণী। স্ত্রী-প্রজাপতি গাছের পাতায় একসঙ্গে অনেকগুলি ছোট ছোট ডিম পাড়ে। স্বভাবতঃই, এমন পাতার উপর ইহারা ডিম পাড়ে, যাহাতে, ডিম ফুটিলে শুঁয়াপোকা বাহির হইয়া সেই পাতা খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে। ডিম হইতে শূককীট বাহির হওয়ার সময়ের তারতম্য নির্ভর করে দুইটি কারণের উপর : (১) প্রজাপতির ধরনের বিভিন্নতা, এবং (২) আবহাওয়ার তারতম্য। তবে, সাধারণতঃ আমাদের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ডিম ফুটিতে ১০।১২ দিন সময় লাগে। আপন সন্তানের প্রতি সম্ভবতঃ ইহাদের মমত্ববোধ কম, তাই ডিম ফুটিয়া শূককীট বাহির হইলে স্ত্রী-প্রজাপতি ইহাদের কোন যত্ন লয় না। প্রজাপতির শূককীটে সাধারণতঃ শুঁয়া বেশী থাকে না। ইহাদের **কীড়া** বলে। তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের অঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য চুলের ন্যায় অসংখ্য কাঁটা থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই কাঁটা অত্যন্ত বিষাক্ত হয়।



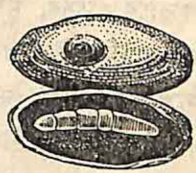
কীড়া

শূককীটের দেহটি মস্তক ব্যতীত ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম তিনটি লইয়া বক্ষ এবং বাকী দশটি খণ্ড লইয়া উদর অংশ গঠিত। ইহাদের বুকের প্রতি খণ্ডে এক জোড়া করিয়া পদ এবং সপ্তম হইতে দশম খণ্ড পর্যন্ত প্রত্যেক খণ্ডে এক জোড়া করিয়া উপপদ আছে। শেষ দেহখণ্ডে এক জোড়া বাঁকানো পদ

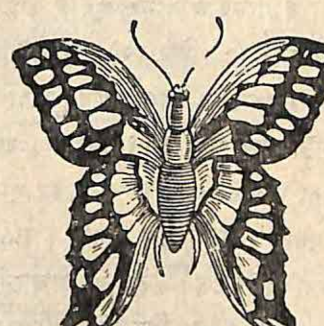
(কোন বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে সাহায্য করে) আছে। তৃতীয়, চতুর্থ এবং ত্রয়োদশ দেহখণ্ড ব্যতীত অপরগুলির দুই পার্শ্বে একটি করিয়া **শ্বাসছিদ্র** (Spiracle) থাকে। ইহাদের এক জোড়া শুঁড়, অপরিণত দুইটি চোখ ও দুইটি চোয়াল ছাড়াও, ৩য় হইতে ১০ম দেহখণ্ড পর্যন্ত ৮ জোড়া উপপদ (Proleg) আছে। শেষের জোড়াটিকে **ক্ল্যাসপার** (Clasper) বলে। ইহা গুটিকে পাতার সহিত আট্‌কাইয়া রাখে। ডিম ফুটিয়া বাহির হইবামাত্র এই শূককীট এত ক্ষুধার্ত হয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ডিমের খোসাটি পর্যন্ত খাইয়া ফেলে। তাহার পর যে গাছের পাতার উপর ইহারা জন্মগ্রহণ করে সেই গাছের কচি পাতা খাইতে আরম্ভ করে। ইহারা খুব পেটুক। এইভাবে ইহারা কয়দিন প্রচুর ভোজন করিয়া থাকে এবং কয়েক-বার দেহের খোলস বদলায়। তাহার পর খাওয়া বন্ধ করিয়া পাতার নীচে মুখের লালা দ্বারা দেহের চারিদিকে একটি আবরণী গড়িয়া তোলে। ইহারই নাম গুটি*। এই গুটি একটি রুদ্ধদ্বার আবরণী। ইহার ভিতরে শূককীট পিউপায় (পরবর্তী অবস্থা) রূপান্তরিত হয়। পিউপার দেহের রূপান্তরণের সঙ্গে সঙ্গে ইহার দেহের কাঁটাগুলি, পা, শুঁড় ইত্যাদি অঙ্গ আর থাকে না। কিছুদিন পরে গুটি কাটিয়া একটি সুন্দর প্রজাপতি বাহির হইয়া আসে। ইহাকে **ইমাগো** (Imago) বলে। সাধারণভাবে, ১½ হইতে ১¾



গুটি



গুটির মধ্যে পিউপা



প্রজাপতি

প্রজাপতির জীবনের বিভিন্ন অবস্থা

*কোন কোন প্রজাপতির শূককীট যথার্থ গুটি তৈয়ারী করে না, কিন্তু একটি উজ্জ্বল সোনালী রঙের আবরণ দ্বারা দেহটিকে ঘিরিয়া রাখে। সাধারণতঃ করবী গাছের পাতা ও সরু ডাল হইতে ইহাদের ঝুলিতে দেখা যায়—দেখিতে অনেকটা নাকের নোলকের মত।

মাস প্রজাপতির রূপান্তর-কাল হইলেও, কীড়া (শূককীট) অবস্থাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। তবে, সাধারণভাবে দশ দিন, দুই সপ্তাহ বা অল্প কিছু বেশী সময়ের মধ্যে পিউপা প্রজাপতিতে পরিণত হয়।

(ঘ) রেশম-মথের জীবন-বৃত্তান্ত (Life-history of Silk-moth)

যে সকল প্রাণী মানুষের উপকার সাধন করিয়া থাকে, রেশমকীট তাহাদের অন্যতম। ইহারা পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত এবং প্রজাপতির জ্ঞাতি। ইহাদের (শূককীটের) দেহ-নিঃসৃত লালা হইতে রেশম উৎপন্ন হয় এবং সেই রেশমের দ্বারাই রেশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। রেশম-মথকে কেন্দ্র করিয়া এখনও আংশিকভাবে তসর, মুগা, এণ্ডি, গরদ ইত্যাদি কুটিরশিল্প-পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে এই রেশমকীট-গুটিকে লইয়া ইহাদের চাষ করা হয়। বাংলাদেশে, প্রধানতঃ, বহরমপুরে সরকারী তত্ত্বাবধানে রেশম-মথের চাষ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানেও ইহার চাষ হয়।

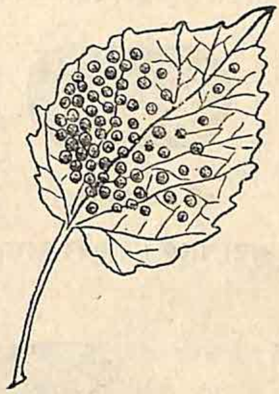
ইহাদের জীবনেও পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর আছে। অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় ইহাদের জীবনেও (১) ডিম, (২) শূককীট, (৩) পিউপা, এবং (৪) পূর্ণাঙ্গ মথ, এই **চারিটি** অবস্থা আছে। রেশম-মথের মধ্যে যাহারা বৎসরে একবার ডিম পাড়ে, তাহাদের **ইউনিভোল্ট (Univolt)** (যথা, ব্যোমবিক্স মোরী [Bombyx mori]) এবং যাহারা একাধিকবার ডিম পাড়ে, তাহাদের **মাল্টিভোল্ট (Multivolt)** (যথা, ব্যোমবিক্স নিসট্রি [Bombyx nistri]) এই দুইটি দলে ভাগ করা হইয়াছে। ইহারা স্বভাবে নিশাচর ও বর্ণে অনুজ্জ্বল। বিশ্রামকালে ইহাদের ডানা পিছনদিকে জোড়া থাকে। গুটিপোকা গুটির ভিতর জীবন অতিবাহিত করে।

স্ত্রী-মথেরা সাধারণতঃ তুঁত† পাতার উপর ডিম পাড়ে এবং উহা হইতে অতি ক্ষুদ্র গুটিপোকা বাহির হইয়া আসে।

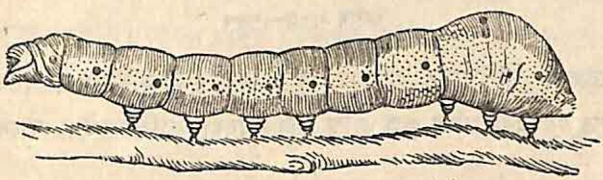
পূর্ণাঙ্গ মথের চেহারা বেশ সুপুষ্ট এবং ইহা উড়িতে পারে না। গুটি হইতে বাহির হইবার অল্প পরেই ইহারা প্রজনন-কার্যে রত হয়। এই সময় স্ত্রী-মথেরা পাতার আড়ালে চলিয়া যায় এবং সেইখানেই প্রজনন হয়। কারণ, ইহারা এই সময়ে অন্ধকার পছন্দ করে। স্ত্রী-মথেরা তুঁত পাতার উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া

† তুঁত পাতা ব্যতীত এরণ্ড, পেয়ারা, মুরগা (শালের ন্যায় একপ্রকার গাছ), পলাশ, কুল প্রভৃতি গাছের পাতায়ও ইহারা ডিম পাড়ে।

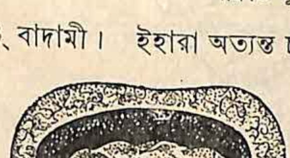
ডিম পাড়ে, যাহাতে মধ্যস্থলে কিছু অংশ খালি থাকে। ডিমগুলি আকারে সরিষার মত ও একসাথে ৪০০।৫০০ ডিম একটি পাতার উপর জমা হয়। তখন ইহাদের রঙ্ থাকে হলুদ এবং আকৃতি ঈষৎ চাপা।


তুঁত পাতায় স্ত্রী-মথের ডিম

ডিম হইতে শুক কীট বাহির হইতে প্রায় ৭।৮ দিন সময় লাগে যদিও আবহাওয়ার তারতম্যের উপর এই সময় বাড়িতে বা কমিতে পারে। ইহাদের শূককীটকে **পলু** বলে। ডিমগুলি হইতে শূককীট বাহির হইবার পূর্বে উহাদের রঙ্ অপেক্ষাকৃত ধূসর হয়। ডিম হইতে বাহির হইবার পর শূককীটগুলি দেখিতে অতি ক্ষুদ্র থাকে। ইহাদের গায়ের রঙ্ ধূসর এবং মাথার

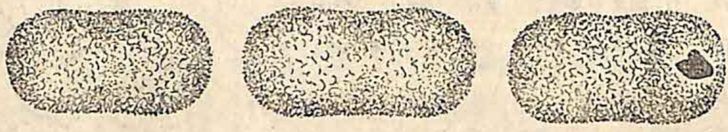

পরিণত শূককীট (Larva) বা পলু

রঙ্ বাদামী। ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল। ইহাদের দেহটি মস্তক, বক্ষ ও উদর, এই ৩টি অংশে বিভক্ত। মুখে ১ জোড়া চোয়াল এবং বক্ষ-সংলগ্ন ৩ জোড়া পদ থাকে। বক্ষে ১ জোড়া এবং উদরে ৮ জোড়া শ্বাসছিদ্র (Spiracle) থাকে। শুককীট প্রায় ১ মাসকাল যাবৎ পাতা খায় এবং


পিউপা (গুটি কাটিয়া দেখানো হইয়াছে)

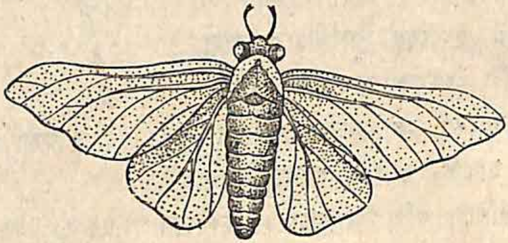
সুপুষ্ট আকার ধারণ করে এবং ইতিমধ্যেই ইহারা চারিবার খোলস ত্যাগের পর ক্রমশঃ পূর্ণবয়ব প্রাপ্ত হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক শূককীট লম্বায় প্রায় ২ ইঞ্চি হয়। তখন ইহাদের রঙ্ হয় সাদা। এই অবস্থায় ইহারা খাওয়া বন্ধ করে ও রেশম গুটি তৈয়ারী করে। ইহাদের দেহের ভিতরের গুটি-রস মুখ দিয়া বাহিরে আসে এবং বায়ুর সংস্পর্শে আসামাত্রই শক্ত হইয়া যায়। এইভাবে শূককীট ক্রমেই

সম্পূর্ণভাবে গুটির মধ্যে আবদ্ধ হয়। স্ত্রী-মথের গুটি পুরুষ-মথের গুটি অপেক্ষা আকারে কিছুটা ছোট হয়। এক-একটির মধ্যে প্রায় ৪০০ শত গজ রেশম



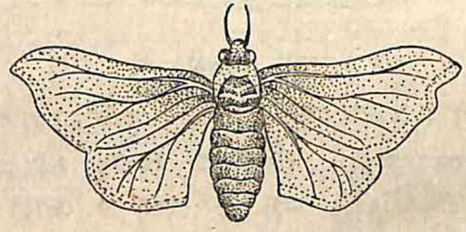
গুটি (প্রথম অবস্থা) গুটি (দ্বিতীয় অবস্থা)। গুটি (তৃতীয় অবস্থা)

সূতা থাকে। গুটির মধ্যে দেহের নানাপ্রকার পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকে।



রেশম পতঙ্গ—পুরুষ

শূককীট ক্রমশঃ পিউপাতে পরিণত হয়। ইহার কিছুদিন পর পিউপা পূর্ণাঙ্গ মথে পরিণত হয় এবং গুটির এক প্রান্ত ফুটা করিয়া বাহির হইয়া আসে। ডিম



রেশম পতঙ্গ—স্ত্রী

অবস্থা হইতে পূর্ণাঙ্গ মথের রূপগ্রহণ করিতে ইহাদের মোটামুটি-ভাবে প্রায় ৭।৮ সপ্তাহ সময় লাগে।

প্রজাপতি ও মথ—আকৃতির দিক হইতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, যেন, এই দুইটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্যই বেশী। তাই, স্বভাবতঃই অনেক সময় দুইটিকেই এক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, বলা বাহুল্য, প্রজাপতি এবং মথ একে অপরের জ্ঞাতি হইলেও এই দুই-এর মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। মথকে কখনো কখনো রাত-প্রজাপতি বলা হয়।

নিম্নে সাধারণভাবে প্রজাপতি ও মথ চিনিবার জন্য সহজ কয়েকটি পার্থক্য দেখান হইল :—

প্রজাপতি	মথ
১। দিনের বেলায় সক্রিয় থাকে ও রাত্রে বিশ্রাম লয়।	১। দিনের বেলায় বিশ্রাম লয় এবং রাত্রে সক্রিয় থাকে।
২। আকারে অপেক্ষাকৃত সরু ও লম্বা।	২। আকারে অপেক্ষাকৃত মোটা ও বেঁটে।
৩। দুই জোড়া বড় ডানা; বর্ণাঢ্য, অপূর্ব সুন্দর।	৩। ডানা দুই জোড়ার তত জৌলুষ নাই।
৪। বিশ্রাম সময়ে পিঠের উপরে ডানা দুইটি মুড়িয়া খাড়াভাবে রাখে।	৪। বসিয়া থাকার সময়ে ডানা দুইটি দুই পার্শ্বে বিস্তৃত থাকে।
৫। সামনের শুঁড় আকারে মোটা।	৫। সামনের শুঁড় আকারে ক্রমশঃ সরু হইয়া আসিয়াছে।

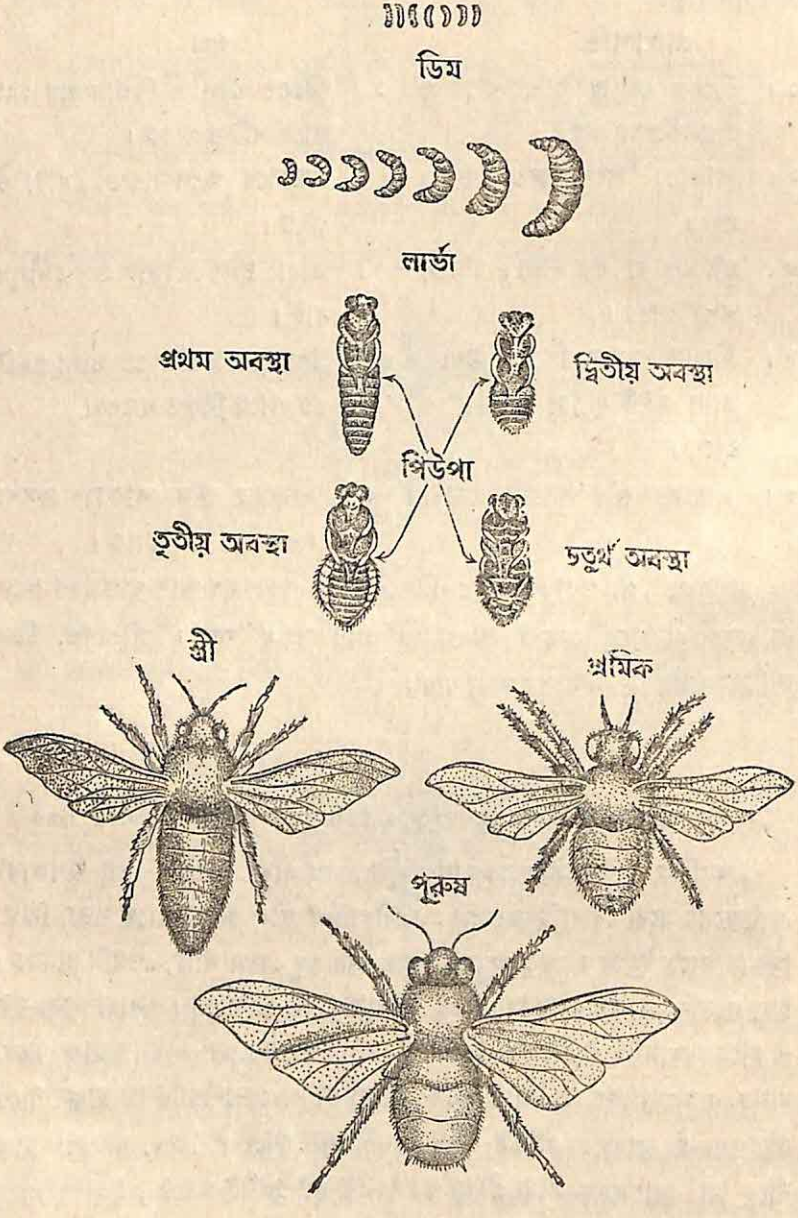
দ্রষ্টব্য : স্ত্রী ও পুরুষ মথের মিলনের পর পুরুষ-মথ আর খাদ্যগ্রহণ করে না, এবং এইভাবে ক্রমশঃ অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করে। স্ত্রী-মথও, ডিম পাড়িবার অল্প কিছুদিন পর মারা যায়।

মৌমাছির জীবন-বৃত্তান্ত (Life-history of Honey-Bee)

একাধিক প্রাণী নানাভাবে মানুষের উপকার সাধন করে। এই উপকারী প্রাণীকুলের মধ্যে মৌমাছি অন্যতম। মৌমাছির হুলে জ্বালা আছে সত্য, কিন্তু, মিষ্টতা আছে ইহার চাকের মধুতে; আর সেই মধু যেমন খাঁটি, তেমনি অনবদ্য। ইহা ছাড়াও চাকের মোম আমাদের নানাবিধ কাজে লাগে। সাধারণতঃ দুই প্রকারের মৌমাছি দেখিতে পাওয়া যায়। একপ্রকারের মৌমাছি চাক বাঁধে, অপর একপ্রকারের মৌমাছি চাক বাঁধে না। যে-মৌমাছিরা চাক বাঁধে তাহাদের স্ত্রী, পুরুষ ও শ্রমিক—এই তিনটি ভাগ আছে। কিন্তু, যাহারা চাক বাঁধে না, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীই আছে; ইহারা ফুলের মিষ্ট রস ও পরাগ খাইয়া থাকে।

শুধুমাত্র শীতপ্রধান দেশ ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মৌমাছি দেখিতে

পাওয়া যায়। ইহারা দলবদ্ধ জীব। ইহাদের সামাজিক জীবন ও তাহার



মৌমাছির 'ডিম হইতে পূর্ণাঙ্গে' রূপান্তর

ব্যবস্থা মানুষের বিস্ময়ের বিষয়। ইহাদের বাসাকে মৌচাক বলে। ইহা

অনেকগুলি কুঠুরী লইয়া গঠিত। কুঠুরীগুলি ছয় বাহুযুক্ত। এক-একটি মৌচাক ইহাদের এক-একটি উপনিবেশ। যে কুঠুরীতে শ্রমিক মৌমাছির লার্ভা-দশা কাটে, তাহাই সর্বাপেক্ষা ছোট। মৌচাকের উপরের দিকের কুঠুরীগুলিতে মধু ও নীচেরগুলিতে ডিম, লার্ভা প্রভৃতি থাকে। একটি মৌচাকে প্রায় অর্ধ-লক্ষ মৌমাছি থাকিতে পারে।

প্রতিটি মৌচাকে সাধারণতঃ **একটি** করিয়া স্ত্রী বা রাণী*-মৌমাছি, অসংখ্য শ্রমিক এবং (বৎসরের একটি বিশেষ সময়ে) কিছু পুরুষ-মৌমাছি থাকে। **রাণী** বা **স্ত্রী-মৌমাছি** আকারে **শ্রমিক**† অপেক্ষা দেড়গুণ বড় এবং উদরের পশ্চাদ্‌ভাগ ছুঁচালো। ইহারা প্রান্তের **হুল** (sting) থাকে। **পুরুষ-মৌমাছি** বেশ হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু অলস এবং কোন কাজ করে না। স্ত্রী-মৌমাছি অর্থাৎ রাণী এককভাবে কয়েক বৎসর (সাধারণতঃ তিন বৎসর) পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং প্রজনন-কালে দৈনিক কয়েক হাজার করিয়া ডিম পাড়ে। শ্রমিক মৌমাছির নিরন্তর শ্রমের ফলেই মৌচাকের যাবতীয় কার্য সম্পন্ন হয় ; ফুলের রস হইতে ইহারাই মধু তৈয়ারী করে। ইহারাই লার্ভা, পুরুষ ও রাণীর খাদ্য যোগায় ও পরিচর্যা করে।

প্রজনন-কালে পুরুষ-মৌমাছিগুলি রাণীকে ঘিরিয়া আকাশে উড়িতে থাকে। এই অবস্থায় অধিকাংশ পুরুষ-মৌমাছিই মারা যায়, এবং একটি মাত্র পুরুষ মৌমাছির সহিত শূন্যে রাণীর মিলন হয় এবং শ্রমিকেরা রাণীকে চাকে ফিরাইয়া আনে। চাকে ফিরিয়া আসিয়া রাণী ডিম পাড়িতে শুরু করে এবং চাকের প্রতি কুঠুরীতে একটি করিয়া ডিম রাখিয়া দেয়। মৌমাছির বিভিন্ন ধরনের, এবং আবহাওয়ার, তারতম্যের উপরই প্রধানতঃ ডিম হইতে শূককীট বাহির হওয়ার সময় নির্ভর করে। যাহা হউক, কয়েকদিন, সাধারণতঃ তিন দিন পর ডিম ফুটিয়া ছোট শূক বা লার্ভা বাহির হয়। এই অবস্থায় খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া ইহাদের স্ত্রী এবং শ্রমিকে রূপান্তর হয়। অর্থাৎ

* মৌচাকে ডিম হইতে অন্য রাণীর সৃষ্টি হইলে, পূর্বের রাণী তাহাকে শৈশব অবস্থায়ই হুল ফুটাইয়া মারিয়া ফেলে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মৌচাকের সকল মৌমাছিই ইহার নিজেরই সন্তান।

† শ্রমিক অপুষ্ট এবং প্রজননে অক্ষম স্ত্রী-মৌমাছি। ইহাদের পশ্চাদ্‌পদ-সংলগ্ন পরাগবহণ যন্ত্র এবং উদরের মধ্যে মোমগ্রন্থি থাকে। উদরের শেষপ্রান্তে ইহাদের একটি শক্তিশালী হুল থাকে। হুলে বিষগ্রন্থি থাকে। শ্রমিকের জীবন ৪৫ দিন—৯০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী।

শূকগুলির মধ্যে যে তিনদিনের বেশী শ্রমিকদিগের মুখ-নিঃসৃত রস (Royal Jelly) [শ্রমিকের মস্তকের একজোড়া লম্বা গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত] খাইয়া বড় হয় সেইটি স্ত্রী-মৌমাছি বা রাণীতে পরিণত হয়, আর যাহারা তিনদিনের পর অন্যপ্রকার রস [পরাগ মিশ্রিত মধু ; ইহাকেই **"মৌমাছির রুটী"** (Bee bread) বলে] খাইয়া বড় হয় তাহারা শ্রমিক হয়। যাহাই হউক, শ্রমিকদিগের মুখ-নিঃসৃত রস খাওয়ার পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই রূপান্তর ঘটে। কিন্তু অনিষিক্ত ডিমগুলি হইতে পুরুষ মৌমাছির জন্ম হয়। শূককীট ক্রমশঃ আকারে বড় হয় এবং কয়েকবার খোলস ত্যাগ করে। শুককীট অবস্থা, সাধারণতঃ ৪—৭ দিন পর্যন্ত (রাণীর ক্ষেত্রে আরো কম।) স্থায়ী হয়। পরে, মুখের লালা দিয়া ইহারা দেহের চারিদিকে একটি আবরণীর (পিউপেরিয়াম) সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় আবরণবদ্ধ শূককীট পিউপায় পরিণত হয়। মৌচাকের যে-সকল কুঠুরীর মধ্যে পিউপারা থাকে শ্রমিক-মৌমাছিরা মোম দিয়া সেই কুঠুরীগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এই অবস্থায় পিউপার দেহের রূপান্তর ঘটিতে থাকে। কুঠুরীবদ্ধ পিউপার দেহের পরিবর্তনের ফলে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি গঠিত হয় এবং প্রায় ১২ দিন পর শ্রমিক, ১৪-১৫ দিন পর পুরুষ এবং ৭-৮ দিন পর রাণী মৌমাছি মোমের আবরণ কাটিয়া বাহির হইয়া আসে।

জন্মের পর ২-৩ সপ্তাহ শ্রমিক মৌমাছি মৌচাকের কাজই করে, বাহিরে যায় না। তাই ইহাদের এই সময়ে ধাত্রী (Nurse) মৌমাছি বলা হয়।

কৃত্রিমভাবে যাঁহারা মৌমাছির চাষ (Apiculture) করেন, তাঁহারা নূতন স্ত্রী-মৌমাছিকে কিছু পুরুষ ও শ্রমিক মৌমাছি সহ কৃত্রিম চাকে স্থানান্তরিত করেন। হিসাব মত শ্রমিক মৌমাছি ৮ হইতে ১০ সের মধু শোষণ করিলে ½ সের মোম তৈয়ারী করিতে পারে। Apis-গণ নামভুক্ত এই মৌমাছিদের ভারতে কতকগুলি, প্রধানতঃ ৪টি, প্রজাতি পাওয়া যায়।

ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তা ঃ মৌমাছি একটি উপকারী পতঙ্গ, কারণ, ইহা হইতে মধু ও মোম পাওয়া যায়।

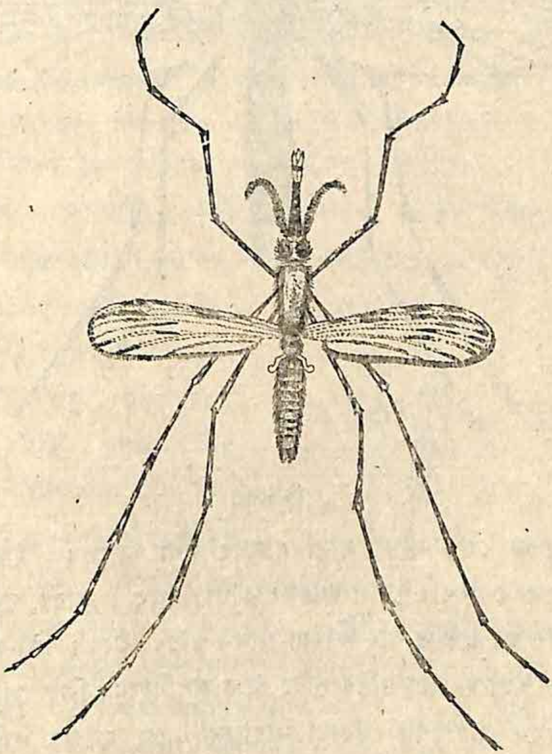
মধু ঃ শ্রমিক মৌমাছির ক্রপ (crop)-এর [পৌষ্টিক নালীর অংশ] মধ্যে ফুলের মিষ্ট রস (Nectar) লালার সহিত রাসায়নিক সংযোগের ফলে পরিবর্তিত হয়। শ্রমিক ইহা উগ্‌রাইয়া দেয় মৌচাকের প্রকোষ্ঠে এবং ডানা নাড়িয়া ইহার অতিরিক্ত জল বাষ্পীভূত করে। ফলে ক্রমশ ইহা মধুতে পরিবর্তিত হয়। মধুতে জল ১৪-২৪%, এবং বাকী অংশ প্রধানতঃ শর্করা (চিনি) জাতীয়

উপাদান লইয়া গঠিত। ইহা ব্যাতীত ভিটামিন B_1, B_2, C এবং নিকোটিনিক এ্যাসিড পরিমাণ মত থাকে। তাই, ইহা বলকারক এবং পুষ্টিকর খাদ্য ও বহু রোগের ঔষধ।

মোম ঃ মধু নিঙ্‌ড়াইয়া লইবার পর মৌচাকের বাকী অংশ হইতে মোম পাওয়া যায়। নানান্ প্রসাধন সামগ্রী, পালিশ প্রভৃতি বহু দ্রব্য তৈয়ারীর কাজে মোম ব্যবহৃত হয়। তাই, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মৌমাছির চাষ করা হয়।

মশকের জীবন-বৃত্তান্ত
(Life-history of Mosquito)

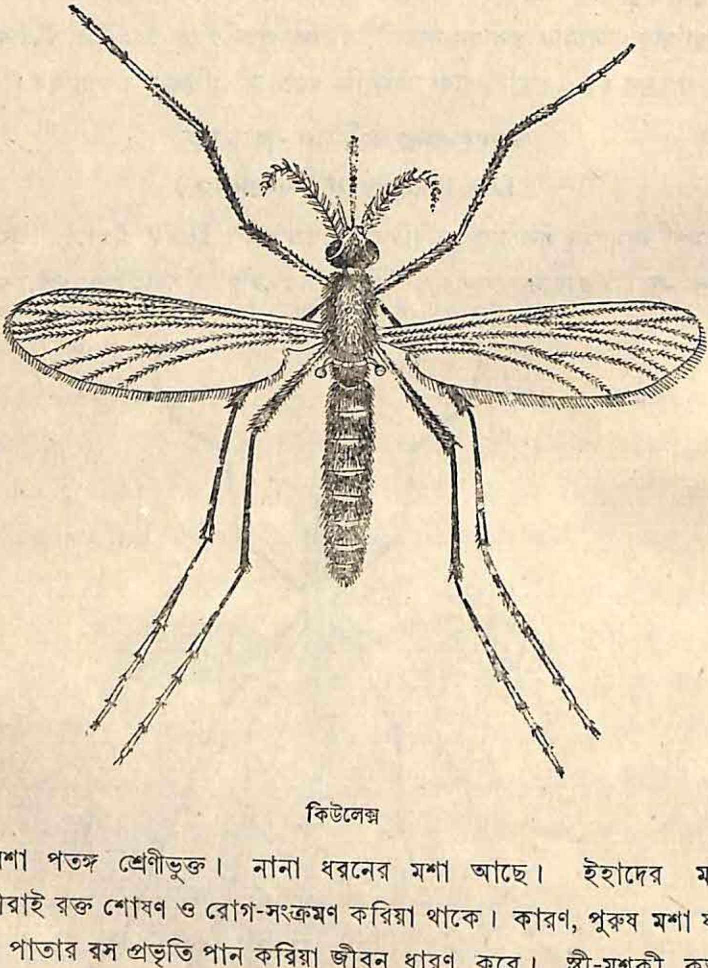
মশা আমাদের সকলেরই পরিচিত ; যদিও সকল স্থানেই ইহাদের উৎপাত সমান নয়। ভারতে যে-সকল স্থানে মশার দৌরাত্ম সর্বাপেক্ষা বেশী, বাংলা



এনোফিলিস

দেশ তাহার অন্যতম। আমাদের অনেকেরই, বিশেষতঃ যাহাদের বাস গ্রামাঞ্চলে, তাহাদের মশার কামড়ের উৎপাতে বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত করিবার তিক্ত

অভিজ্ঞতা আছে। আর তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ম্যালেরিয়া রোগ আক্রমণের দুঃখদায়ক স্মৃতি মনে আছে। অতি অল্পদিন পূর্বেও ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুর সংখ্যা আমাদের এই দেশে ভয়াবহ রকমের বেশী ছিল।



কিউলেক্স

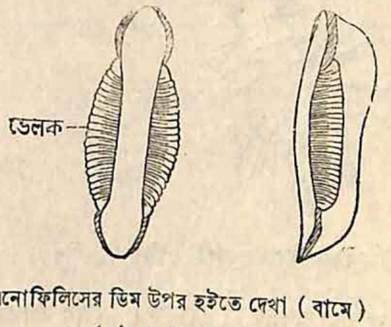
মশা পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত। নানা ধরনের মশা আছে। ইহাদের মধ্যে মশকীরাই রক্ত শোষণ ও রোগ-সংক্রমণ করিয়া থাকে। কারণ, পুরুষ মশা ফল, শাক, পাতার রস প্রভৃতি পান করিয়া জীবন ধারণ করে। স্ত্রী-মশকী কর্তৃক শোষিত রক্ত ইহাদের ডিমগুলির পুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু শুধুমাত্র কামড়ের জালাটুকু বাদে সাধারণতঃ ইহারা মারাত্মক নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহারা কোনও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়াইয়া নিজেরা **সংক্রামিত** হয়। বর্তমানে মশক নিবারণকারী নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য এবং রোগ নিরাময়কারী ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় মশকের বিভীষিকা কমিয়াছে।

অন্যান্য সকল পতঙ্গের ন্যায় মশকের জীবনেও **চারিটি** অবস্থা আছে ; যথা—(ক) ডিম, (খ) শূককীট, (গ) পিউপা ও (ঘ) পূর্ণাঙ্গ মশক। প্রথম তিন অবস্থাই জলে অতিবাহিত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মশক ডানা মেলিয়া শূন্যে উড়িয়া বেড়ায় বা স্থলে থাকে।

মশক একটি অপকারী পতঙ্গ। সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর মশক দেখা যায় : (১) এনোফিলিস (Anopheles)—ইহারা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে এবং এই রোগ এক মানুষ হইতে অপর মানুষে ছড়ায় ; (২) কিউলেক্স (Culex)—ইহারা শ্লীপদ বা ফাইলেরিয়া (Elephantiatis) রোগের জীবাণু বহন করে ; (৩) এডিস্ বা ষ্টিগোমায়া (Aedes or stegomia)—ইহারা ডেঙ্গু ও পীত জ্বরের জীবাণু বহন করে। নিম্নে মশকের জীবন-বৃত্তান্ত (Life-history) সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

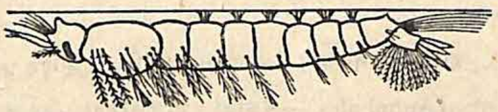
মশকীরা চোষকনল বা প্রবোসিস্ (proboscis)-এর সাহায্যে মনুষ্যরক্ত পান করিয়া থাকে (অন্যতম মূল কারণ বংশবৃদ্ধি করা ; কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যরক্ত ডিমগুলির পুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য)। কিন্তু মশকরা ফল, ফুল ও শাক-সব্জির রস পান করিয়া জীবন ধারণ করে।

(ক) **ডিম**—এনোফিলিস মশকী পুকুর অথবা অগভীর জলাশয় প্রভৃতির স্থির বা মৃদুস্রোতযুক্ত জলে বা জলাশয় সন্নিহিত কোনও তৃণ বা গুল্মের উপর ডিম পাড়ে। ইহারা এককালীন প্রায় তিন শতের মত ডিম পাড়ে। কিউলেক্স মশকী কিন্তু বাড়ির আশে-পাশে নর্দমা, ভাঙ্গা হাঁড়ি, কলসী, বোতল, টিনের ডিবা প্রভৃতির ভিতর জমা জলে ডিম পাড়ে। বিভিন্ন ধরনের মশকীর ডিমের আকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। এনোফিলিস মশকীর ডিমগুলি ছাড়াছাড়া ভাবে জলে ভাসিতে থাকে। প্রতিটির দুইপার্শ্বে দুইটি বায়ুপূর্ণ ভেলক (Raft) থাকে। ইহাদের সাহায্যেই ইহারা জলে ভাসিতে পারে। কিউলেক্সের ডিমগুলি কিন্তু একপ্রকার আঠার ন্যায় বস্তুর সাহায্যে একত্রে আটকানো থাকে এবং জলের উপর ভেলার ন্যায় ভাসিয়া বেড়ায়। ডিমগুলি উপবৃত্তাকার এবং অপেক্ষাকৃত বড়। প্রায় এক মি.মি. লম্বা। তাই ইহাদের সহজেই চোখে পড়ে। ডিমের একপ্রান্ত সূঁচাল, অপরপ্রান্তে স্ফীত।



এনোফিলিসের ডিম উপর হইতে দেখা (বামে) পার্শ্ব হইতে দেখা (ডাইনে)

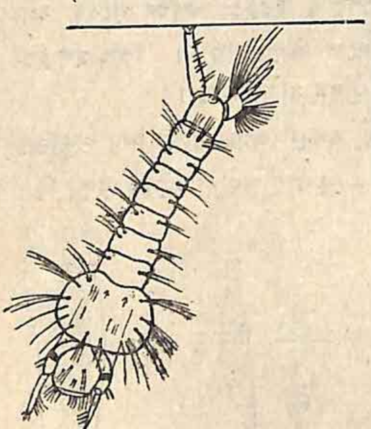
(খ) **শূককীট**—এনোফিলিস মশকীর ডিম প্রায় ৪৮ ঘণ্টা (২ দিন) পর ফুটিয়া শূককীট বা লার্ভা (Larva) বাহির হয় এবং খাদ্যের খোঁজে জলের মধ্যে



এনোফিলিসের শূককীট (বিশ্রামকালীন)

ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। ইহারা জলজ উদ্ভিদ্ এবং ছোট ছোট পোকা খাইয়া জীবনধারণ করে। শূককীট বা লার্ভার দেহ মস্তক, বক্ষ এবং উদরে বিভক্ত। মস্তকে ১ জোড়া করিয়া পুঞ্জাক্ষি, শুঙ্গ, চোয়াল এবং ভোজন কূর্চগুচ্ছ (Feeding brush) থাকে।

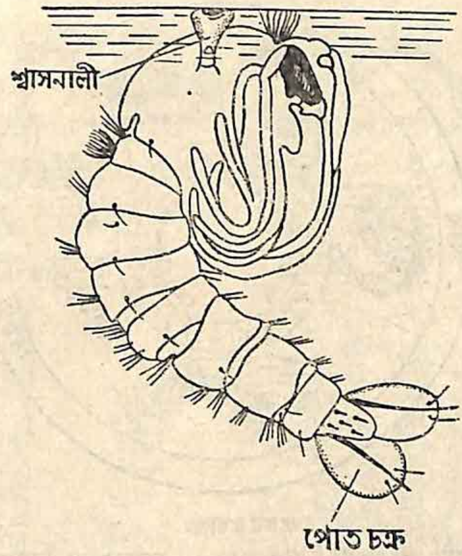
শূককীটের প্রথম অবস্থায় ইহারা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শ্বাস-কার্য চালায়। ২৪ ঘণ্টা পরে ইহা প্রথমবার দেহের খোলস ত্যাগ করে। এই অবস্থায় সর্বসমেত ইহারা চারিবার খোলস ত্যাগ করিয়া থাকে। শূককীট অবস্থার শেষ দিকে ইহাদের অষ্টম উদর খণ্ডের দুই ধারে দুইটি শ্বাসছিদ্র দেখা যায়। ইহারাই প্রধান শ্বাসনালী দুইটির ছিদ্রপথ। ইহারা জলের উপরিভাগে সমান্তরালভাবে চিৎ হইয়া ভাসিয়া এই শ্বাসছিদ্রের সাহায্যে বায়ু গ্রহণ করিয়া শ্বাসকার্য চালায়। শেষ উদরখণ্ডক-এ সূক্ষ্মপাতের মত দুই জোড়া শ্বাস-নালী-ফুল্কা (Trachial gill) আছে।



কিউলেক্সের শূককীট (বিশ্রামকালীন)

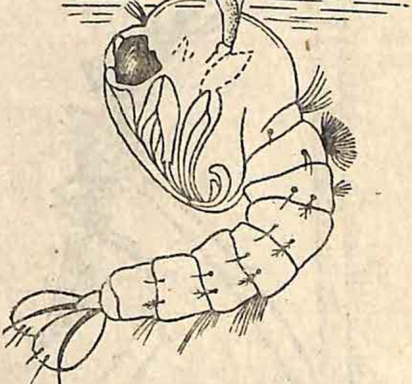
কিউলেক্স মশকীর শূককীটের পুচ্ছদেশে লম্বাকৃতি শ্বাসনলের (Respiratory siphon) শেষে শ্বাসছিদ্র থাকে। সেজন্য ইহারা মাথা নীচের দিকে করিয়া শ্বাসনালীকে জলের সমরেখার উপরিভাগের সহিত সমকোণে রাখিয়া উল্টাভাবে ভাসিতে থাকে এবং এইভাবে শ্বাসকার্য চালায়। তাই, জলে একটু নাড়া দিলেই তলায় নামিয়া যায়। লার্ভা অবস্থা ৮-১০ দিন স্থায়ী হয়।

(গ) **পিউপা** (Pupa)—ডিম হইতে বাহির হইবার প্রায় আট-দশ দিন পর চতুর্থবার দেহের খোলস ত্যাগ করিয়া শূককীট পিউপায় রূপান্তরিত হয়। এই



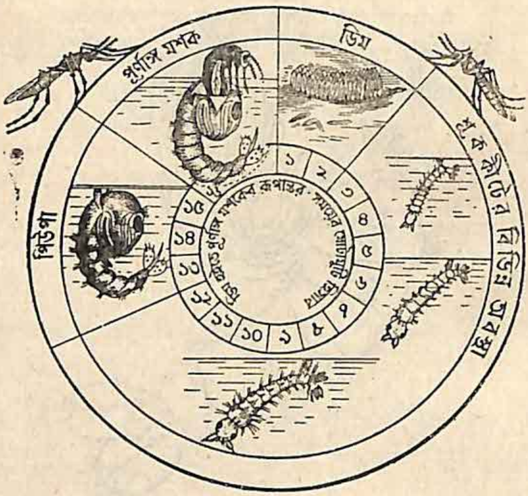
এনোফিলিস পিউপা

রূপান্তর সাধারণতঃ রাত্রে হইয়া থাকে। পিউপা অনেকটা কমা (,) চিহ্নের ন্যায় দেখিতে। ইহার মস্তক ও দেহের অপেক্ষাকৃত অগ্রভাগটি একত্রিত, তাই বৃহদাকার এবং পশ্চাদ্ভাগ (উদর) ছোট ও সরু। এই অবস্থায় ইহাদের মুখ থাকে না, তাই খায় না কিছুই ; কিন্তু চঞ্চলভাবে সাঁতার কাটিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। পিউপার উদরে শেষখণ্ডে একজোড়া চ্যাপ্টা পাখনা এনোফিলিস ও কিউলেক্স উভয়েই দেখা যায়। এনোফিলিস ও কিউলেক্স মশকীর পিউপা দেখিতে প্রায় একই রকমের। এনোফিলিস পিউপার বক্ষের উপরিভাগ সংলগ্ন-বায়ুনল দুইটি বেঁটে ও চ্যাপ্টা, কিউলেক্সে ইহারা লম্বা ও সরু।



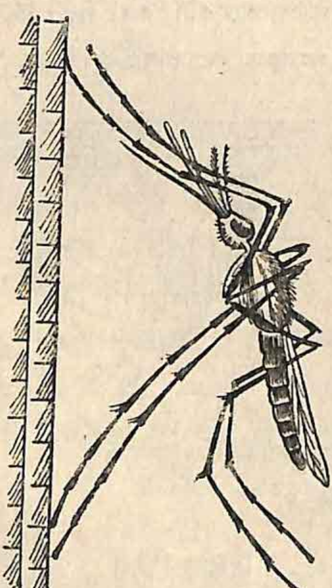
কিউলেক্স পিউপা

(ঘ) **পূর্ণাঙ্গ মশক**—২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টা পর পিউপার মস্তকের দিকটি ফাটিয়া পূর্ণাঙ্গ মশক বাহির হয়। অবশ্য জলের উষ্ণতা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক

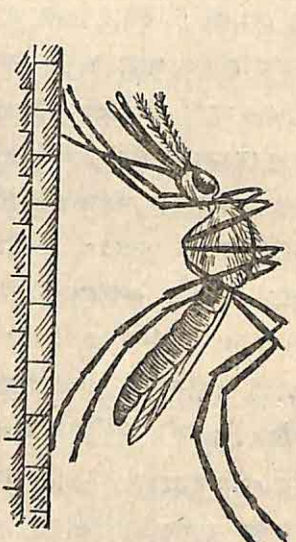


মশকের রূপান্তর

অবস্থার উপর সময়ের তারতম্য নির্ভর করে। যতক্ষণ না ইহাদের ডানা শুকায় ততক্ষণ পর্যন্ত মশা ইহার পরিত্যক্ত খোলসের উপর বসিয়া জলে ভাসিয়া বেড়ায়।



এনোফিলিস মশার দেওয়ালে বসার ভঙ্গি

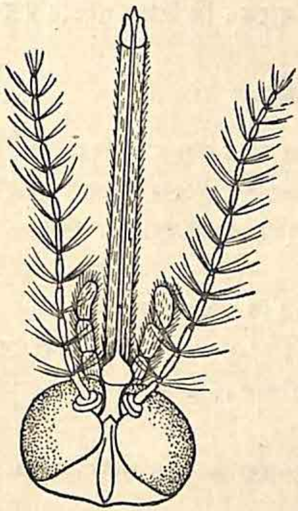


কিউলেক্স মশার দেওয়ালে বসার ভঙ্গি

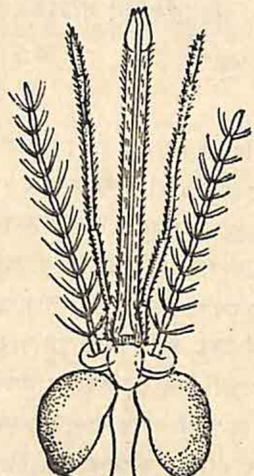
এনোফিলিস ও কিউলেক্স মশা চিনিবার উপায়—

(১) এনোফিলিস বসিবার সময় দেহের পিছনের অংশ উঁচু থাকে এবং সামনের অংশ ভূমির (যেখানে বসে) সহিত সূক্ষ্মকোণ উৎপন্ন করে। অপরপক্ষে, কিউলেক্স কুব্জভাবে বসে ও পিঠ উঁচু করিয়া দেহটি সমান্তরালভাবে রাখে।

(২) এনোফিলিস মশকীর হুলটি শুঁয়ায় আবৃত এবং ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি শুঁড় আছে, কিন্তু স্ত্রী-কিউলেক্সের এইরূপ শুঁড় নাই, শুধুমাত্র হুলের প্রথম অংশটি শুঁয়ায় আবৃত।



কিউলেক্সের মস্তক



এনোফিলিসের মস্তক

(৩) কিউলেক্স দিবারাত্র উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু এনোফিলিস সাধারণতঃ রাত্রিকালেই উড়িয়া বেড়ায়।

(৪) এনোফিলিসের উড়িবার সময় কোনরূপ আওয়াজ হয় না; কিউলেক্সের হয়।

(৫) ডানাতে সাদা-কালো ডোরা দাগ থাকে কিউলেক্সে, এনোফিলিসে এই রকম থাকে না।

(৬) এনোফিলিস অপেক্ষা কিউলেক্স আকারে বড়।

এনোফিলিস ও কিউলেক্সের ডিম ও লার্ভা চিনিবার উপায় :—

(১) এনোফিলিসের ডিম নৌকার ন্যায় দেখিতে এবং ছাড়া ছাড়া ভাবে জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। কিউলেক্সের ডিম লম্বা আকৃতির, একসংগে থাকে এবং জলের উপর একসংগে ভেলার ন্যায় ভাসিয়া বেড়ায়।

(২) স্থির-অবস্থায় এনোফিলিস লার্ভা জলের সহিত সমান্তরালভাবে চিৎ হইয়া ভাসিয়া থাকে। কিউলেক্স লার্ভা মাথা নীচু করিয়া বাঁকাভাবে জলে ঝুলিতে থাকে।

(৩) এনোফিলিস লার্ভার শ্বাসনালী নাই। শ্বাসছিদ্র দুইটি। কিউলেক্স লার্ভার শ্বাসনালী আছে। শ্বাসছিদ্র ইহার প্রান্তে অবস্থিত।

(৪) এনোফিলিস লার্ভার দেহে রোম থাকে; কিউলেক্স লার্ভায় থাকে না।

অনুশীলনী

1. শ্বাসকার্য কাহাকে বলে? আরশুলার শ্বাসতন্ত্র সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

2. রেশম আমরা কিভাবে পাই? যে-প্রাণিদেহ হইতে রেশম পাওয়া যায় তাহার জীবন-বৃত্তান্ত চিত্রসহ বর্ণনা কর। সাধারণভাবে কোন্ কোন্ গাছের উপর ইহারা নির্ভরশীল?

৪. প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা কর।

4. প্রধানতঃ কোন্ কোন্ মশা মানুষের দেহে কি কি রোগ সংক্রমণ করে? মশকের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা কর। [হা. সে. ১৯৬৫]

5. এনোফিলিস ও কিউলেক্স মশকী চিনিবার সাধারণ উপায় কি কি? ইহাদের জীবন-বৃত্তান্তের বৈষম্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

6. মৌমাছির জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া রানী-মৌমাছির ভূমিকার বর্ণনা দাও।

7. রেশম মথের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ইহার জীবনের বিভিন্ন দশার মধ্যে কোন্‌টির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে? কেন এই গুরুত্ব?

[হা. সে. ১৯৬৩ (কমপ.); ১৯৬১ (কমপ.)]

৪. মধু কি? সংক্ষেপে মৌমাছির জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। (হা. সে. ১৯৬৩)

9. মৌমাছির জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা কর। প্রতি দশায় ইহা কি ভাবে খাদ্য গ্রহণ করে? (হা. সে. ১৯৬১)

Questions to be discussed

1. What is respiration? What do you know about the respiratory system of cockroach?

2. How do we get silk? Describe the life-history of the animal that produces silk. Mention the plants on which they are dependant.

3. Describe the life-history of butterfly.

4. Name the main types of mosquitoes that are responsible for the transmission of some of the human diseases.

Describe the life-history of one of them. [H. S. 1965]

5. How do you distinguish an anopheles from a culex. Mention the chief points of differences between their respective life-histories.

6. Describe briefly the life-history of bee with special reference to the role of the queen bee.

7. Describe in outline, the life-history of the Silk-moth. Which stage of its life-history is of economic importance and how ?

[H. S. 1963 (comp.) ; 1961 (comp.)]

8. What is honey ? Describe briefly the life-history of honey-bee.

[H. S. 1963]

9. Give a brief account of the life-history of Honey-bee. How does it take food at each stage. [H. S. 1961]

(ক) হাঙর (Scoliodon sp.)

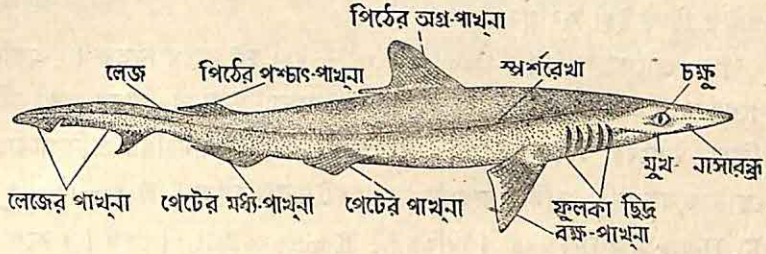
আমরা পূর্ব-অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি যে, হাঙরও এক ধরনের মাছ। মাছ প্রধানতঃ দুই প্রকারের হয়—এক প্রকারের নাম অস্থিবিশিষ্ট মাছ, অর্থাৎ ইহাদের দেহের কাঠামো হাড় দ্বারা গঠিত এবং অপর প্রকারের নাম কোমলাস্থিবিশিষ্ট মাছ অর্থাৎ ইহাদের দেহের কাঠামো কোমল হাড়জাতীয় এক প্রকার বস্তু দ্বারা গঠিত। হাঙর এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মাছ। ইহারা সামুদ্রিক মাছ। বঙ্গোপসাগরেও প্রচুর হাঙর দেখা যায়। ইহাদের চামড়া দ্বারা কাঠপালিশ ও যকৃৎদ্বারা তৈল (Shark-liver oil) তৈয়ারী হয়।

ইহারা মাংসাশী এবং প্রধানতঃ মাছ খাইয়া জীবনধারণ করে; সুযোগ পাইলে অবশ্য মানুষকে পর্যন্ত ঘায়েল করিয়া তাহার মাংস খাইয়া থাকে।

আমাদের দেশের সমুদ্রে নানা রকমের হাঙর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদেরই একটির বহিরাকৃতির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বহিরাকৃতি—ইহারা লম্বায় প্রায় ২ ফুট হয় এবং সাধারণতঃ মাছের ন্যায় ইহাদের দেহের অগ্র এবং পশ্চাদ্‌ভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। হাঙরের দেহটিকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়; যথা—মাথা, ধড় ও লেজ। কিন্তু দেহের এই ভাগগুলি স্পষ্ট নয়। মাথাটি নীচের দিকে ঈষৎ চাপা এবং ইহারই শেষ প্রান্তের নাম তুণ্ড (Snout)। দেহটির ধড়ের অংশ মোটামুটিভাবে গোলাকার। লেজটি ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার দুই পার্শ্ব চাপা থাকার ফলে শেষভাগ উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। হাঙরের রং পিঠের দিকে গাঢ় ধূসর, কিন্তু পেটের দিকের রং অনুজ্জ্বল ধূসর। ইহার সারা দেহ অতি সূক্ষ্ম আঁইশে আবৃত। ইহার আঁইশগুলি আকৃতিতে সাধারণ মৎস্যের আঁইশ হইতে ভিন্ন এবং অতি সূক্ষ্ম। এই আঁইশগুলির

একের অগ্রভাগ অপরের পশ্চাদ্‌ভাগকে অন্যান্য ধরনের আঁইশের ন্যায় ঢাকিয়া



হাঙরের বহিরাকৃতি

রাখে না। ইহাদের নাম প্লাকয়েড্ (Plax = Plate, edios = Form) আঁইশ। ইহাদের প্রতিটির তলদেশে চাক্‌তির ন্যায় একটি প্লেট্ থাকে এবং ইহার উপরে পশ্চাৎ দিকে প্রসারিত তিনটি কাঁটাবিশিষ্ট একটি অংশ থাকে। কাঁটাগুলি পিছনের দিকে প্রসারিত হওয়ার জন্য হাঙরের লেজের দিক হইতে মাথার দিক পর্যন্ত হাত বুলাইলে আঁইশের কাঁটাগুলি খোঁচার মতো হাতে লাগে।





হাঙরের চামড়ায় আঁইশ

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল মাছেরই (অস্থি ও তরুণাস্থি-বিশিষ্ট) বৈশিষ্ট্য এই যে, পাখনাতে কমবেশী কতকগুলি ফিন্-রে (Fin-ray) কাঁটার মতো থাকে, তাই পাখনাগুলি শক্ত হয়। ইহা মাছেরই বৈশিষ্ট্য। মাছ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর (প্রজাপতি, বাদুড় প্রভৃতি) পাখ্‌নাতে ফিন-রে নাই। পাখনা মাছের অপর একটি বিশেষত্ব। দুই ধরনের পাখনা দেখা যায়। এক ধরনের পাখনাকে বলে একক (Median) পাখনা এবং অপর ধরনের পাখনাকে বলে জোড়া (Paired) পাখনা। হাঙরের দেহে নিম্নলিখিত কয়েকটি পাখনা আছে ঃ

(ক) পিঠের দিকের পাখনা (Dorsal Fin)—পিঠের দিকে দুইটি পাখনা আছে ; ইহার একটি পিঠের মধ্যভাগে থাকে। ইহাকে পিঠের অগ্র-পাখনা (Anterior Dorsal Fin) বলে। পিঠের অপর পাখনাটি অগ্র-পাখনা ও লেজের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে, ইহাকে পিঠের **পশ্চাৎ-পাখনা** (Posterior Dorsal Fin) বলে। দুই পাখনাই আকারে প্রায় ত্রিকোণ।

(খ) অংকীয় পাখনা (Ventral Fin)—পায়ুর পিছনে পিঠের পাখনার বিপরীত দিকে ইহা অবস্থিত।

(গ) লেজের পাখনা (Caudal Fin)—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি উপরের অংশ এবং অপরটি নীচের অংশ। লেজের উপরের অংশে মেরুদণ্ডটি বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। এইরূপ অনিয়মিত প্রতিসাম্যের (ছোট ও বড় দুই ভাগ) জন্য ইহাকে **হেটারোসার্কল্** (Heterocercal ; GK. Heteros = Diverse { বিভিন্ন } ; Kerkos = Tail { লেজ }) বলে। ইহার উপরের অংশের নাম পৃষ্ঠভাগ (Dorsal lobe) এবং নীচের অংশের নাম অংকীয় ভাগ (Ventral lobe)।

(ঘ) বক্ষ-সংলগ্ন পাখনা (Pectoral Fin)—মাথার পিছনে ধড়ের অগ্রভাগে প্রতি পার্শ্বে একটি করিয়া একজোড়া পাখনা আছে। ইহারাও জোড়া পাখনা, আকারে ত্রিকোণ এবং আনুভূমিক বিস্তৃত।

(ঙ) শ্রোণী পাখনা (Pelvic Fin)—ইহারা আকারে বক্ষ-সংলগ্ন পাখনা অপেক্ষা ছোট এবং পেটের দিকে ধড় ও লেজের সংযোগস্থলে দুই পার্শ্বে একটি করিয়া অবস্থিত। পুরুষ-হাঙরের এই শ্রোণী পাখনার সংলগ্ন প্রতি পার্শ্বে একটি করিয়া কোমল দণ্ডী (Clasper) সংযুক্ত থাকে। এই দণ্ডীর ভিতরের দিকে একটি সরু নালী (Groove) থাকে। স্ত্রী-হাঙরে ইহা থাকে না। পুরুষ হাঙরকে ইহা প্রজনন কার্যে সাহায্য করে।

মুখটি মাথার নীচের দিকে অবস্থিত। ইহা আকারে অর্ধচন্দ্রের ন্যায়। মাথার দুই দিকে দুইটি চক্ষু আছে। প্রতিটি চক্ষুর উপরে ও নীচে দুইটি পাতা আছে। কিন্তু এই পাতা দুইটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অকেজো।* পেটের দিকে, মুখের সামনে দুই পার্শ্বে দুইটি ছিদ্র আছে। ইহাদের নাসারন্ধ্র (Nostril) বলে। মুখ এবং বক্ষ-সংলগ্ন পাখনার মধ্যবর্তী স্থানে দেহের দুই পার্শ্বে **পাঁচটি** করিয়া **ফুলকা-ছিদ্র** (Gill-slits) আছে। দুই দিকের শ্রোণী পাখনার মধ্যবর্তী স্থানে পায়ুছিদ্রটি (Vent) অবস্থিত। পায়ুছিদ্রের পিছনে এক জোড়া ছিদ্র আছে। ইহাদের **উদরস্থ ছিদ্র** (Abdominal pores) বলে।

দেহের প্রতি পার্শ্বে মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত একটি করিয়া লম্বা রেখা দেখা যায়। ইহাদের নাম **স্পর্শ-রেখা** (Lateral-line sense organs).

* মাথার দুইপাশে দুইটি অন্তঃকর্ণ আছে,—কিন্তু বাহির হইতে দেখা যায় না।

দ্রষ্টব্য ঃ কোন কোন হাঙরের ফুলকাছিদ্রের পূর্বে প্রতি পার্শ্বে আরও একটি করিয়া ছিদ্র থাকে। ইহাকে **স্পাইরাকল্** (Spiracle) বলে।

নিম্নে অস্থিবিশিষ্ট (রুই) ও তরুণাস্থিবিশিষ্ট (হাঙর)—এই দুইটি মাছের বহিরাকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করা হইল।

রুই	হাঙর
১। চক্রাকার বা সাইক্লোয়েড্ (Cycloid) আঁইশ দ্বারা দেহটি আবৃত। আঁইশগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বড়।	১। কণ্টক আঁইশ বা প্লাকয়েড্ (Placoid) আঁইশ দ্বারা দেহটি আবৃত। আঁইশগুলি অতি ক্ষুদ্র।
২। পার্শ্ব-চাপা (Laterally compressed) মাথাটি ত্রিকোণাকৃতি এবং ইহারই অগ্রভাগে অংকীয় ভাবে (Ventrally) মুখছিদ্রটি অবস্থিত। মুখছিদ্রটি প্রায় গোলাকার।	২। উপরে-নীচে চাপা (Dorso-ventrally flattened) অপেক্ষাকৃত লম্বা ধরনের ত্রিকোণাকৃতি মাথার অংকীয় দেশে তুণ্ডের মূলে মুখছিদ্রটি অবস্থিত এবং আকার অর্ধচন্দ্রের ন্যায়।
৩। ইহাদের পুরুষের শ্রোণী পাখনা-সংলগ্ন কোন সংগম-অংগ বা ক্লাস্পার (Clasper) নাই।	৩। ইহাদের শ্রোণী পাখনা-সংলগ্ন সংগম-অংগ বা ক্লাসপার (Clasper) পুরুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়।
৪। লেজের পাখনা সমান দুইটি ভাগে বিভক্ত।	৪। লেজের পাখনা দুইটি অসমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।
৫। ফুলকাছিদ্র চার জোড়া। কানকুয়া (Operculum) দ্বারা ফুলকাছিদ্র আবৃত।	৫। ফুলকাছিদ্র পাঁচ জোড়া। কানকুয়া (Operculum) নাই, ফুলকাছিদ্র অনাবৃত।
৬। শ্রোণী পাখনার অপেক্ষাকৃত পিছনে ও পায়ুপাখনার সম্মুখে পায়ুছিদ্র অবস্থিত।	৬। শ্রোণীর পাখনাজোড়ার মধ্যস্থলে পায়ুছিদ্র অবস্থিত।

রুই	হাঙর
৭। অবসারণী (Cloaca) নাই।	৭। অবসারণী (Cloaca) আছে।
৮। উদর-ছিদ্র নাই।	৮। পায়ুছিদ্রের দুই পার্শ্বে একটি করিয়া দুইটি উদর-ছিদ্র আছে।
৯। স্পাইরাকল্ নাই।	৯। স্পাইরাকল্ আছে।

চক্ষুর উপরে চামড়ার একটি পাতলা আবরণী আছে। ইহাকে **উপ-পল্লব** (Nictitating Membrane) বলে।

(খ) গিরগিটি (Calotes versicolor)

টিকটিকি, গিরগিটি-জাতীয় প্রাণী ঝোপে-ঝাড়ে, বনে-জঙ্গলে সচরাচর দেখা যায়। ইহারা সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত এবং ল্যাসার্টিলিয়া (Lacertilia) বর্গের (order) অধীনস্থ অনুষ্ণশোণিত প্রাণী। ইহারা পোকা-মাকড় খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। সাধারণতঃ বাড়িতে যে-ধরনের টিকটিকি (গৃহ-গোধিকা) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের দেহে পরিবেশজনিত রূপান্তর (দেহের রং ইত্যাদির তফাৎ) অত্যন্ত প্রকট। তাই, সরীসৃপের প্রতীক-সদস্য হিসাবে বাগানে যে-ধরনের গিরগিটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই বহিরাকৃতির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

বহিরাকৃতি—

(১) ইহাদের সর্বাঙ্গ সূক্ষ্ম আঁইশে ঢাকা।

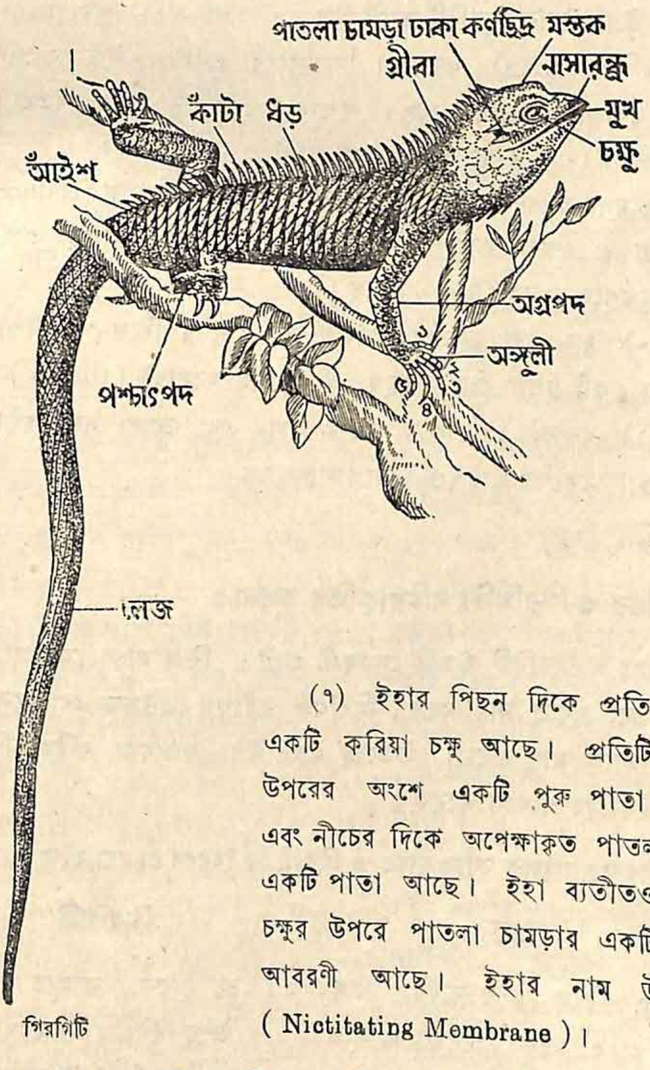
(২) ইহাদের দেহটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—মাথা, ধড় ও লেজ। মাথা ও ধড়, এই দুই অংশ একটি অস্পষ্ট গ্রীবা (ঘাড়) দ্বারা সংযুক্ত।

(৩) ইহার মাথাটি ত্রিকোণ এবং তাহার অগ্রভাগে ইহাদের মুখটি অবস্থিত।

(৪) মাথার পিছন হইতে ঘাড় অবধি পিঠের দিকের আঁইশগুলি খাড়া-ভাবে থাকে এবং এইজন্যই কাঁটার ন্যায় দেখায়।

(৫) পুং-গিরগিটির ঘাড়ের রং প্রজনন-ঋতুতে লাল হয়। (এবং তাই অনেকে ভুলবশতঃ মনে করে যে, গিরগিটি বুঝি রক্ত পান করে।)

(৬) মুখছিদ্রের উপরে দুই পার্শ্বে দুইটি (বহিঃ) নাসারন্ধ্র (Nostrils) আছে।



গিরগিটি

(৭) ইহার পিছন দিকে প্রতি পার্শ্বে একটি করিয়া চক্ষু আছে। প্রতিটি চক্ষুর উপরের অংশে একটি পুরু পাতা আছে এবং নীচের দিকে অপেক্ষাকৃত পাতলা আর একটি পাতা আছে। ইহা ব্যতীতও প্রতি চক্ষুর উপরে পাতলা চামড়ার একটি স্বচ্ছ আবরণী আছে। ইহার নাম উপপল্লব (Nictitating Membrane)।

(৮) প্রতি চক্ষুর পিছন দিকে একটি করিয়া **কর্ণছিদ্র** (Auditory aperture) আছে, কিন্তু ছিদ্র দেখা যায় না। কারণ, প্রতিটি ছিদ্রের উপর

আঁইশ-বিহীন গোলাকার চামড়ার আবরণ আছে। ইহা দেখিয়া কর্ণছিদ্রের অবস্থিতি চেনা যায়। ইহার নাম কর্ণ-পটহ (Tympanic Membrane)। এইটি উপরের চামড়া হইতে স্বল্প ভিতর দিকে ঢোকানো থাকে।

(৯) ধড়ের অগ্র এবং পশ্চাদ্ভাগের দুই পার্শ্ব হইতে যথাক্রমে দুই জোড়া উপাঙ্গ বাহির হইয়াছে। সম্মুখের জোড়াটি অগ্রপদ ও পশ্চাতের-টি পশ্চাদ্পদ। প্রতিটি উপাঙ্গ আবার চারিটি ভাগে বিভক্ত। যথা—(১) পুরবাহু, (২) বাহু, (৩) মণিবন্ধ ও (৪) করতল। অগ্রপদের প্রথম অঙ্গুলিটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, ইহাকে পোলাক্স (Pollux) বলে। পশ্চাদ্পদও চারিটি ভাগে বিভক্ত। যথা, (১) জংঘা, (২) জানুতল, (৩) গোড়ালী ও (৪) পদতল।

পশ্চাদ্পদের প্রথম অঙ্গুলিটিও ক্ষুদ্রতম ; ইহাকে হেলাক্স (Hallux) বলে। অগ্র ও পশ্চাৎ উভয়পদেই পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলী আছে এবং প্রতিটি অঙ্গুলীর শেষে নখর (Claw) আছে।

(১০) ধড় এবং লেজের সংযোগ-স্থলে পেটের দিকে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত একটি চওড়া ছিদ্র আছে। ইহার নাম অবসারণী (Cloaca)।

(১১) লেজটি গোলাকার, যথেষ্ট লম্বা এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া শেষ হইয়াছে। লেজের আঁইশগুলি অপেক্ষাকৃত বড়।

হাঙর ও গিরগিটির বহিরাকৃতির তুলনা :

হাঙর ও গিরগিটি উভয়ই মেরুদণ্ডী প্রাণী। কিন্তু হাঙর কোমলাস্থিবিশিষ্ট মৎস্য এবং সমুদ্রে বাস করে ; গিরগিটি সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত এবং বনে-জঙ্গলে, ঝোপে-ঝাড়ে বাস করে। উভয়েই মাংসাশী। স্বভাবতঃ, বহিরাকৃতির দিক হইতে ইহাদের পার্থক্য অনেক।

নিম্নে তুলনামূলক ভাবে হাঙর ও গিরগিটির বিবরণ দেওয়া হইল।

হাঙর	গিরগিটি
১। রং ফিকে ধূসর বর্ণের, কিন্তু পিঠের দিক হাল্কা কাল্চে রং-এর হয়।	১। রং ফিকে, কাল্চে। মাথার উপর পিঠের মধ্যরেখা বরাবর সারি সারি কাঁটা মস্তক হইতে লেজ পর্যন্ত গিয়াছে।

হাঙর	গিরগিটি
২। দেহটি তিনটি ভাগে বিভক্ত —মস্তক, ধড় ও লেজ।	২। দেহটি প্রধানতঃ মস্তক, ধড় ও লেজ, এই তিনভাগে বিভক্ত; কিন্তু মস্তক ও ধড় একটি ছোট গ্রীবার দ্বারা একে অপরের সহিত যুক্ত।
৩। চামড়া পুরু ও কর্কশ এবং অতি ক্ষুদ্র কণ্টক আঁইশ দ্বারা আবৃত। মুখছিদ্রটি মস্তকের বিপরীত দিকে দেহের অংকভাগে অবস্থিত।	৩। দেহটি আঁইশে আবৃত। আঁইশগুলি লম্বালম্বিভাবে দেহের উপর সাজানো। পেটের আঁইশগুলি পিঠের আঁইশগুলি অপেক্ষা বড়। মুখছিদ্রটি মস্তকের অগ্রভাগে অবস্থিত এবং উপরে ও নীচে চোয়াল দ্বারা শক্তভাবে আট্‌কানো। কণ্টক আঁইশ নাই।
৪। বহিঃনাসারন্ধ্র দুইটি মুখের অগ্রভাগে দুই পার্শ্বে অবস্থিত। মুখ-গহ্বরের সহিত ইহা যুক্ত নয়।	৪। মাথার দুইপার্শ্বে একটি করিয়া বহিঃনাসারন্ধ্র আছে। ইহা মুখ-গহ্বরের সহিত অন্তঃনাসারন্ধ্রপথে যুক্ত।
৫। মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটি গোলাকার চক্ষু আছে। কিন্তু চক্ষুর উপরে ও নীচে সঙ্কুচিত চামড়ার পল্লব আছে।	৫। মস্তকের দুই পার্শ্বে উজ্জ্বল গোলাকার চক্ষুর উপর-নীচে ব্যতীতও একটি ৩য় পাতা বা স্বচ্ছ ঝিল্লি (Nictitating Membrane) আছে।
৬। কোন কর্ণছিদ্র নাই।	৬। কর্ণছিদ্র একটি অপেক্ষাকৃত মসৃণ পর্দার দ্বারা আবৃত এবং মস্তকের পশ্চাতে অবস্থিত। ইহাকেই কর্ণ-পটহ (Tympanic Membrane) বলে।
৭। পাঁচ জোড়া ফুলকাছিদ্র থাকে।	৭। ফুলকাছিদ্র থাকে না।

হাঙর	গিরগিটি
৮। দেহের দুইপার্শ্বে দুইটি পার্শ্বরেখা থাকে।	৮। দেহে কোন পার্শ্বরেখা থাকে না।
৯। উপাংগ হিসাবে পাখ্‌না আছে। জোড় ও বিজোড় পাখ্‌না আছে। অংক দেশে দুই জোড়া ও একটি বিজোড় এবং পিঠের দিকে দুইটি বিজোড় পাখ্‌না থাকে। ইহা ছাড়া একটি লেজের পাখ্‌না থাকে।	৯। উপাংগ হিসাবে দেহকাণ্ডের সম্মুখে এক জোড়া অগ্রপদ এবং পশ্চাতে এক জোড়া পশ্চাদ্‌পদ থাকে।
১০। অবসারণীর আকার গোল।	১০। অবসারণী আড়াআড়িভাবে অবস্থিত।
১১। লেজে পাখনা থাকে।	১১। লেজে পাখনা থাকে না।

অনুশীলনী

১। হাঙরের বহিরাকৃতি চিত্রসহ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কর। [হা. সে. ১৯৬২]

২। গিরগিটি কোন্ শ্রেণীভুক্ত জীব? গিরগিটির বহিরাকৃতির চিত্রসহ একটি পূর্ণ বিবরণ দাও।

৩। হাঙর ও গিরগিটির বহিরাকৃতির বৈষম্যগুলি প্রয়োজনীয় চিত্রসহ তুলনা কর।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ:—(ক) সংগম-অঙ্গ, (খ) উদরস্থ ছিদ্র, (গ) কণ্টক আঁইশ, (ঘ) স্পাইরাকল্, (ঙ) হেটারোসারকেল্ পাখনা।

৫। একটি হাঙরের বহিরাকৃতি অংকন করিয়া চিত্রে তাহার বিভিন্ন অংশের নাম লিখ। প্রতিটি অংশের কাজ কি? [হা. সে. ১৯৬৫]

Questions to be discussed

1. Describe the external features of a Shark in details. Give neat sketches. [H. S. 1962]

2. Name the class to which the Lizard belongs? Give a detailed description of the external features of a lizard with necessary diagrams.

3. Compare the external features of a Shark with that of a Lizard. Give necessary sketches.

4. Write short notes on :—(a) Clasper. (b) Abdominal pore. (c) Placoid scale. (d) Spiracle. (e) Heterocercal tail,

5. Draw and label the external features of a Shark and mention the function of each structure. [H. S. 1965]

কোষ

পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, জীবনের শুরুতে প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) কোন আবরণীর ভিতর আবদ্ধ ছিল না। ক্রমশঃ এই প্রোটোপ্লাজম আবরণীবদ্ধ হয়। তাহার পর প্রোটোপ্লাজম, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিওপ্লাজম, এই দুইটি অংশে বিভেদিত হইয়া ক্রমশঃ কোষে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে কতকগুলি এককোষী প্রাণীর সৃষ্টি হয়। একটি মাত্র কোষ লইয়া যে-প্রাণিদেহ গঠিত তাহাকে এককোষী প্রাণী (unicellular) বলে। কিন্তু ক্রমশঃ কোষের বিভাজনের ফলে বহুকোষী (Metazoa) প্রাণীর সৃষ্টি হয়। ইহাদের দেহে যদিও বহু কোষ আছে, তথাপি, সব কোষের আকৃতি ও প্রকৃতি একরূপ নহে। একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে মোট ১০০০০০০০০০০০০০০ কোষ থাকে। আশ্চর্যের কথা, প্রতিটি কোষ একে অপরের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা বজায় রাখিয়া সার্থকভাবে নিজ নিজ কাজ করে। যতদূর জানা যায়, সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের কোষেও এই প্রোটোপ্লাজমের ভিতর এক ধরনের বস্তু দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা নিউক্লিয়াস (Nucleus) নামে একটি বিশেষ বস্তুরূপে বিদ্যমান। তাই, সাধারণ সংজ্ঞায় আবরণীবদ্ধ প্রোটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াসকে কোষ (L. cella = ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ) বলা হয়। সুতরাং, প্রতি কোষে প্রোটোপ্লাজম দুইটি রূপে বিদ্যমান—ইহার কিছু অংশ লইয়া নিউক্লিয়াস (Nucleus) গঠিত এবং বাকী অংশ সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)-রূপে থাকে।

জীবদেহের সূক্ষ্ম গঠন সম্বন্ধে সঠিক কোন জ্ঞান অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদেরও ছিল না। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয় এবং ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে রবার্ট হুক (Robert Hook) সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে কর্কের (বোতলের 'ছিপি'-জাতীয়) দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কুঠুরী লইয়া গঠিত। এই কুঠুরীকে তিনি **কোষ** (cell) নামে অভিহিত করেন। ফণ্টনা (১৭৮১) ও পরবর্তী কালে রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) [১৮৮৩] এই কোষ মধ্যে নিউক্লিয়াস নামে (কোষের প্রাণকেন্দ্র) একটি বস্তুর সর্বপ্রথম

বর্ণনা দেন। ইতিমধ্যে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে স্লাইডেন (Scleiden) ও ১৮৩৯-এ সোয়ান (Schwann) কোষকেই যথাক্রমে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহের 'একক' (Unit) হিসাবে বর্ণনা করেন। কোষ বিভাজনের ফলেই নূতনতর কোষের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ এই বিভাজন প্রক্রিয়া ও পূর্বেকার কোষের সহিত বিভাজিত কোষের সম্বন্ধ নিরূপিত হয়। কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণার ফলে জীব-বিজ্ঞানের একটি নূতন দিগন্ত ক্রমশঃ উদ্ভাসিত হইল এবং ইহার ফলে স্থাপিত হইল জীববিজ্ঞানের আর-এক-শাখা, **কোষবিজ্ঞান** (Cytology)।

কোষের আকার—আমরা জানি যে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির কোষ দেখা যায়। সাধারণতঃ প্রাণীকোষ এত ছোট হয় যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত খালি চোখে উহা দেখা যায় না। কিন্তু কোন কোন কোষ বেশ বড় হয়; যেমন—হাঁস বা মুরগীর ডিম। উল্লেখযোগ্য যে, ডিমের লাল অংশ (কুসুম)-ই বস্তুত কোষ-অংশ, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদি কোষ-বহির্ভূত অংশ। সম্ভবতঃ, বৃহত্তম কোষ হিসাবে উট পাখির ডিম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার ব্যাস চার ইঞ্চি। অপরপক্ষে, বৃহত্তম দৈর্ঘ্যের দিক হইতে, একটি নার্ভকোষের উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহা কয়েক ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। যদিও বিভিন্ন ধরনের কোষ জীবদেহে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি, ইহাদের সকলের গঠনের মধ্যেই একটি মূলগত ঐক্য আছে এবং সেই কারণেই নিম্নে একটি আদর্শ কোষের বর্ণনা করা হইল। যদিও ঠিক এই ধরনের কোষ জীবদেহে দেখা যায় না, তথাপি, বিভিন্ন কোষ এই আদর্শ কোষেরই কমবেশী রূপান্তর মাত্র।

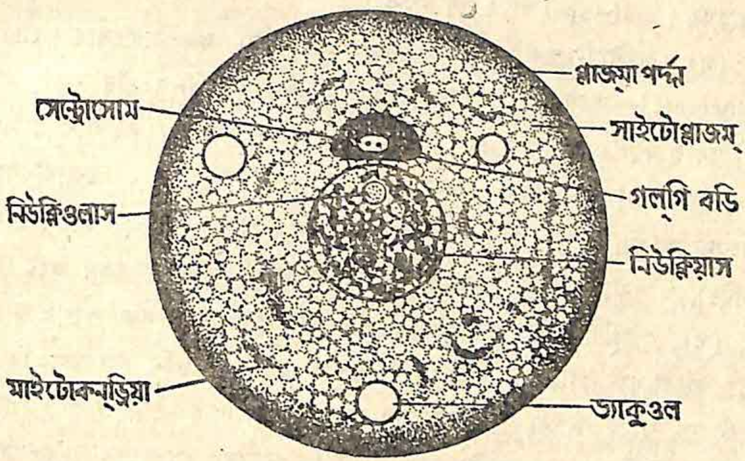
আদর্শ কোষ

একটি আদর্শ প্রাণিকোষকে বর্ণনা করার জন্য তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; (১) প্লাজমা পর্দা, (২) নিউক্লিয়াস-বহির্ভূত বস্তুসমূহ (Extra-nuclear structures) এবং (৩) নিউক্লিয়াস-মধ্যস্থ বস্তুসমূহ (Intra-nuclear structures)।

প্লাজমা পর্দা (Plasma Membrane)—প্রাণিকোষের প্রাচীর অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্দার ন্যায়, কিন্তু সকল কোষেই সুনির্দিষ্ট কোষপ্রাচীর দেখা যায় না।

(১) সাইটোপ্লাজমের বাহিরের দিকের অংশ প্লাজমা পর্দায় রূপান্তরিত, সুতরাং ইহা জীবন্ত। কোষ হইতে ইহাকে পৃথক্ করা যায় না। ইহা

সাইটোপ্লাজমকে কোষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ইহা বাহির হইতে কোষের ভিতরে যথাক্রমে খাদ্যবস্তু এবং O_2-র এবং ভিতর হইতে বাহিরে



আদর্শ কোষ (বর্ধিত আকারে দেখানো হইয়াছে)

দূষিত বস্তুর আসা-যাওয়ার নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ ইহাতে অতি সূক্ষ্ম কিছু ছিদ্র আছে। পর্দাটি অর্ধস্বচ্ছ (semi-transparent) এবং অর্ধভেদ্য (Semi-permeable)

দ্রষ্টব্য ঃ এই পর্দাকে ঘিরিয়া অনেক সময় অজীবীয় একটি আস্তরণ থাকে। ইহাকে পেলিকল (Pellicle) বলে। ইহা কোষকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে এবং এক কোষের সহিত অপর কোষকে আট্‌কাইয়া রাখিতে সাহায্য করে।

নিউক্লিয়াস-বহির্ভূত বস্তুসমূহ ঃ [Extra-nuclear structures]

(ক) **সাইটোপ্লাজম**—কোষে সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াসকে চারিদিকে ঘিরিয়া থাকে। ইহা দেখিতে অর্ধ-তরল জেলীর ন্যায়। ইহা একটি জটিল রাসায়নিক পদার্থ। সাইটোপ্লাজমের প্লাজমা-পর্দার সংলগ্ন অংশের **বহিঃপ্লাজম** (Ectoplasm) এবং নিউক্লিয়াস-সংলগ্ন অংশের **অন্তঃপ্লাজম** (Endoplasm) নাম।

পূর্বোক্ত অংশ ঘন, স্বচ্ছ এবং শেষোক্ত অংশ অপেক্ষাকৃত কম ঘন, কম স্বচ্ছ এবং দানাদার।

(খ) **ভ্যাকুওল** (Vacuole)ঃ সাইটোপ্লাজমের ভিতর বুদ্বুদের ন্যায় কিছু কিছু শূন্য-স্থান দেখা যায় ; তাহাকে ভ্যাকুওল (Vacuole) বলে। ইহা কোষরস (cell-sap) দ্বারা পূর্ণ থাকে।

(গ) **মাইটোকনড্রিয়া** (Mitochondria) বা কনড্রিয়োসোম (Chondriosome)—কয়েকটি লিপিড্ (Lipid) এবং প্রোটিনজাতীয় বস্তুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে এইগুলি গঠিত হয়। দানা, ডিম্বাকৃতি বা বর্তুলাকার অথবা সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় এইগুলিকে কোষের মধ্যে দেখা যায়। ইহা কোষবিপাকে সাহায্য করিয়া থাকে। জীবিত কোষে এইগুলি ইতঃস্তত নড়াচড়া করে। বিশেষ করিয়া, শ্বাসকার্য, জারন-ক্রিয়া প্রভৃতিতে ইহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

(ঘ) **গল্‌গি বডি** (Golgi Body)—সাইটোপ্লাজমে সরু সূতার জালের ন্যায় অথবা সরু কাঠি বা ছোট ছোট কণার ন্যায় এইগুলি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে অথবা নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি একত্র হইয়া থাকিতে পারে। ইহারাও লিপিড্ এবং প্রোটিন দ্বারা গঠিত। কোষের রস-ক্ষরণে (Secretion) সম্ভবতঃ ইহার অবদান আছে।

(ঙ) **মেটাপ্লাস্টিক বডি** বা অজীবীয় বস্তু (Metaplastic Bodies)—কোষবিপাকের ফলে সঞ্চিত নানা আকারের খাদ্যবস্তু অথবা বর্জবস্তু কোষের ভিতর থাকিতে পারে। ইহারা চর্বি বা তৈল-কণা। ক্ষরিত-রস কণিকা (Secretion granule) বা রঞ্জক কণিকা (Pigment granule) ইত্যাদি ধরণের হইতে পারে।

(চ) **সেন্ট্রোসোম** (Centrosome)—নিউক্লিয়াসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিত যে ঘন গোলাকার বস্তু দেখা যায়, তাহারই নাম সেন্ট্রোসোম। ইহার বাহিরের দিকের অংশটিকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার (Centrosphere) বলে। ইহারই মধ্যে অতি ক্ষুদ্র দুইটি কণিকা থাকে। ইহাদের সেন্ট্রিয়োল্ (Centriole) বলে। কোষ বিভাগের সহিত ইহারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

৩। **নিউক্লিয়াসমধ্যস্থ বস্তুসমূহ** (Intra-nuclear structurs) :

নিউক্লিয়াস (Nucleus)—ইহা কোষের প্রাণকেন্দ্র। কোষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে এই নিউক্লিয়াস। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, সাইটোপ্লাজম ব্যতিরেকে নিউক্লিয়াসও বাঁচিতে পারে না। সাধারণতঃ ইহা আকারে গোল হয় এবং কোষের মধ্যস্থলে থাকে। ইহা আবার প্রটোপ্লাজম গঠিত একটি সূক্ষ্ম, অর্ধভেদ্য আস্তরণ দ্বারা আবৃত থাকে—ইহার নাম **নিউক্লিয়ার পর্দা** (Nuclear

Membrane) ইহার ভিতর একটি জলীয় পদার্থ থাকে। সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রবেশ ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থের বহির্গমন ইহার মাধ্যমেই হয়। ইহার নাম **নিউক্লিয়ার স্যাপ** (Nuclear Sap) বা কেরিওলিম্ফ (Karyolymph)। ইহার ভিতর দুই ধরনের বস্তু দেখা যায়—একটির নাম **ক্রোমাটিন বস্তু** (Chromatin material) এবং অপরটির নাম **নিউক্লিওলাস** (Nucleolus)। ক্রোমাটিন ছড়ানো, অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ভিতর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে অথবা জালের ন্যায় জড়ানো অবস্থায় দেখা যাইতে পারে। কোষবিভাগের সময় এই ক্রোমাটিন কতকগুলি সূক্ষ্ম সূতার আকার প্রাপ্ত হয় এবং ইহাদের **ক্রোমোজোম** (Chromosome) বলে। এইগুলি বংশগত (hereditary) ধর্ম বহন করিয়া থাকে। এক প্রজাতির সকল প্রাণীরই দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং একই। প্রতিটি নিউক্লিয়াসে সাধারণভাবে এক বা একাধিক ঘন গোলাকার পদার্থ থাকে,—ইহারই নাম **নিউক্লিওলাস** (Nucleolus)। কোষবিভাগের সময় ইহা লুপ্ত হয় এবং পরে আবার গঠিত হয়। সম্ভবতঃ, নিউক্লিয়াসের বিপাকীয় (Metabolic) পরিবর্তনের জন্যই ইহার মধ্যে কিছু খাদ্যবস্তু সঞ্চিত থাকে।

কলা (Tissue)

আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, একটি কোষের বিভাগের ফলে কালক্রমে বহু কোষের সৃষ্টি হয়। এককোষী প্রাণীর দেহ একটিমাত্র কোষ লইয়া গঠিত। কিন্তু বহুকোষী প্রাণীর দেহের কোষগুলিকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা; (১) সাধারণ দেহকোষ (somatic cells) ও (২) জনন-কোষ (reproductive cells)। দেহ-কোষ বিভাজনের ফলে দেহের গঠন, ক্ষয়-ক্ষতির সংস্কার ইত্যাদি সারাজীবন-ব্যাপিয়া প্রাণীদেহে অব্যাহত থাকে; কিন্তু প্রজনন কার্যের জন্য যে বিশেষ জনন-কোষ উৎপন্ন হয়, তাহা শুধুমাত্র প্রজনন ও তাহার মাধ্যমে বংশধারার (hereditary characters) বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। যদিও প্রারম্ভিক অবস্থায় এই কোষগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি একই ধরনের থাকে, তথাপি কোষগঠনের সাথে সাথে ক্রমশঃ ইহাদের আকৃতিতে বৈষম্য এবং প্রকৃতিতে পার্থক্য দেখা যায়।

ক্রমবিকাশের মাধ্যমে কোষগঠনের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকারের কোষ তৈয়ারী হয় (cell differentiation)। সাধারণতঃ যখন একই রূপে উৎপন্ন এবং একই বা বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির কতকগুলি কোষ নির্দিষ্টভাবে একত্রিত হইয়া সকলে মিলিয়া একটি বিশেষ কার্য সমাধা করে, তখন তাহাকে কলা (Tissue) বলে।* ফরাসী বৈজ্ঞানিক M, F. K. Bichart সর্বপ্রথম ইহার টিস্থ (Tissue) বা কলা বলিয়া নামকরণ করেন। প্রাণী বিজ্ঞানের যে শাখা বিভিন্ন ধরনের কলা সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণায় নিযুক্ত আছে, সেই শাখার নাম **কলাতত্ত্ব** (Histology)। উন্নত ধরনের প্রাণীর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ছয় প্রকার কোষ-ব্যবস্থা বা কলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার আরও বিশেষভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। তথাপি, মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত ছয় প্রকারের কলাই প্রধান :—

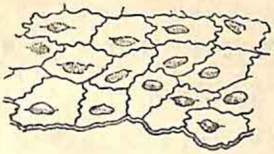
(ক) এপিথিলিয়াল কলা (Epithelial Tissue)
(খ) ভারবাহী কলা (Supporting Tissue)
(গ) মেদ কলা (Adipose Tissue)
(ঘ) পেশী কলা (Muscle Tissue)
(ঙ) স্নায়ু কলা (Nervous Tissue)
(চ) রক্ত সম্বন্ধীয় কলা (Vascular Tissue)

(ক) **এপিথিলিয়াল কলা (Epithelial Tissue)**—ইহা বিভিন্ন ধরনের এপিথিলিয়াল কোষের সমষ্টির ফলে গঠিত হয়। ইহারা সাধারণতঃ দেহের আবরণী গঠনে সাহায্য করে এবং দেহের ভিতরের বিভিন্ন গহ্বর, নালী ইত্যাদির বহিরাবরণ ইহার দ্বারা গঠিত হয়। সাধারণতঃ এপিথিলিয়াল কোষগুলি একটি পাতলা পর্দার উপর বসানো থাকে। এই পর্দার নাম বেসমেন্ট-মেমব্রেণ (Basement Membrane)। এই ধরনের কলায় কোষান্তর পদার্থ (তুইটি বা বিভিন্ন কোষের মধ্যবর্তী পদার্থ ; interestitial fluid) অত্যন্ত কম, তাই কোষগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট।

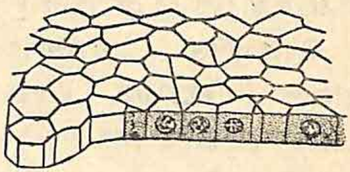
যখন ইহারা দেহের **বহিরাবরণ** গঠন করে তখন ইহাদিগকে বহিঃ-এপিথিলিয়াম (External epithelium) এবং যখন দেহের **ভিতরের কোন আবরণী** গঠন করে, তখন ইহাদিগকে অন্তঃএপিথিলিয়াম (Internal epithelium) বলে। যখনই এপিথিলিয়াম কলা **একটি মাত্র** কোষস্তর লইয়া গঠিত

* সর্ব শেষ মতবাদ অনুযায়ী কোন কোন কলা বস্তুতঃ একাধিক ধরনের কোষ লইয়া গঠিত।

হয়, তখন তাহাকে **সাধারণ এপিথিলিয়াম** (Simple epithelium) বলে।

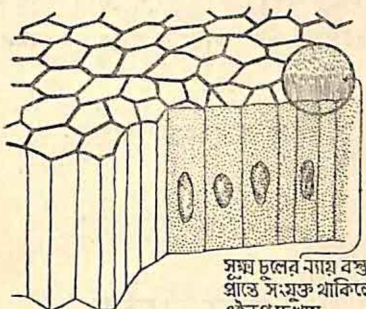


স্কোয়েমাস্ এপিথিলিয়াম কোষ



কিউবয়ডাল এপিথিলিয়াম কোষ

যখন ইহা **একাধিক** কোষস্তর লইয়া গঠিত হয়, তখন তাহাকে **স্তরবিভক্ত** (Stratified) এপিথিলিয়াম বলে। **রসনিঃসরণকারী গ্রন্থি** (Gland cells), **প্রজনন-সংক্রান্ত** প্রয়োজনীয় কোষ (Reproductive cells) ইত্যাদি নানা বস্তু এই ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত হয়। সর্বোপরি, দেহের ভিতরে সাধারণ ভাবে কোন বস্তুর **প্রবেশ** করিতে হইলে বা **বাহিরে আসিতে** হইলে তাহাকে এই কোষের মধ্য দিয়াই যাতায়াত করিতে হইবে। ইহাদের আকৃতি নানাপ্রকার এবং কোষব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের। এই বিভিন্নতার **উপর** নির্ভর করিয়াই ইহাদের বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে; যথা—(১) **স্কোয়েমাস** কোষ, (২) **কিউবয়ডাল** কোষ, (৩) **কলম্‌নার** কোষ।



কলম্‌নার এপিথিলিয়াম কোষ

(১) যে সকল এপিথিলিয়াম কোষ টালির ন্যায় চ্যাপ্‌টা, পাতলা ও চওড়া তাহাদের স্কোয়েমাস (Squamous) এপিথিলিয়াম বলে। ইহা সাধারণতঃ দেহের ভিতরের (দেহ-গহ্বরের) **আবরণী** সৃষ্টি করে।

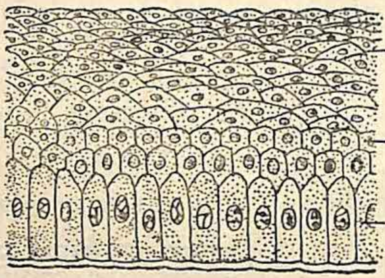
(২) যে এপিথিলিয়াম কোষ ছয়টি দেওয়াল দ্বারা গঠিত তাহাদের কিউবয়ডাল (Cuboidal) এপিথিলিয়াম বলে। ইহা দেহের কোন কোন **নালী-গঠনে** সাহায্য করে, যেমন, বৃক্ক, লালাগ্রন্থি প্রভৃতির।

(৩) যে এপিথিলিয়াম কোষগুলি আকারে লম্বা এবং দেহের ভিতরের আবরণী ইত্যাদির সৃষ্টি করে তাহাদের নাম কলম্‌নার (Columnar) এপিথিলিয়াম। শুধু কোষগুলিই নয়, ইহাদের নিউক্লিয়াসগুলিও অনুরূপভাবে

লম্বা। এই কোষগুলির প্রধান কাজ **শোষণ ও ক্ষরণ**। পাকস্থলী ও অন্ত্রের ভিতরের আবরণী এই কোষগুলি দিয়া গঠিত।

উপরে বর্ণিত (৩) কোষগুলির সহিত সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় বস্তু সংযুক্ত থাকিলে তাহাকে **সিলিয়েটেড** (Ciliated) **এপিথিলিয়াম** কোষ বলে। এক ধরনের আবরণী কলা আপাতঃদৃষ্টিতে-স্তর বিভক্ত মনে হইলেও বস্তুতঃ বিভিন্ন কোষ উপরে-নীচে করিয়া একটিমাত্র কোষ দ্বারাই সাজান থাকে। এইরূপ বিন্যাসকে **নকল স্তর-বিন্যাস** (Pseudo-stratification) বলে। শ্বাস নালীর ভিতরের আবরণ এই ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত।

পূর্বে-বর্ণিত এই তিন ধরনের এপিথিলিয়াম কোষ একাধিক স্তরে বিন্যস্ত হইয়া স্ট্র্যাটিফায়েড বা স্তর-বিন্যস্ত এপিথিলিয়ামের সৃষ্টি করিতে পারে। যেমন,



স্তর-বিন্যস্ত এপিথিলিয়াম কোষ

আমাদের দেহের চামড়ার বাহিরের অংশটি স্ট্র্যাটিফায়েড এপিথিলিয়ামের দ্বারা গঠিত। প্রতি ধরনের কোষের সহিত আবার চুলের ন্যায় সহজে সঞ্চরণশীল কয়েকটি বস্তু সংযুক্ত থাকিতে পারে।

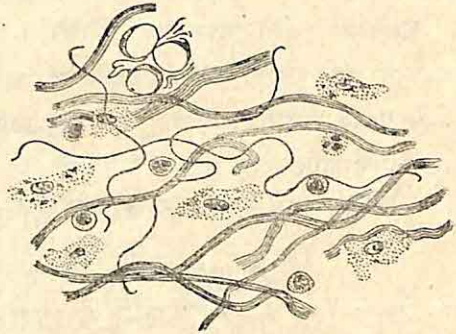
কার্যভেদে এপিথিলিয়াল কলাকে **চারটি** ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :—

(১) রক্ষাকারী (Protective) এপিথিলিয়াম, (২) গ্রন্থি (Glandular) এপিথিলিয়াম, (৩) অনুভূতিবাহী (Sensory) এপিথিলিয়াম, (৪) জনন (Reproductive) এপিথিলিয়াম।

(খ) ভারবাহী কলা (Supporting Tissue)—যোগ কলা (Fibrous connective Tissue), হাইয়ালাইন কোমলাস্থি (Hyaline Cartilage) এবং হাড় (Bone), এই তিন ধরনের কলার সমন্বয়ে ভারবাহী কলা গঠিত হয়। আন্তঃকোষ পদার্থের উৎপাদন-ক্ষমতা ইহার সর্বোচ্চ।

এই আন্তঃকোষ পদার্থকেই ম্যাট্রিক্স (Matrix) বলে। কয়েকপ্রকার কঠিন বা দ্রবীভূত পদার্থও এই আন্তঃকোষ পদার্থে থাকে।

(১) **যোগ কলা** (Fibrous connective Tissue)—চামড়াকে পেশীর সহিত ও পেশীকে হাড়ের সহিত সংযুক্ত করা ইত্যাদি কাজে এই ধরনের কলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কলার কোষগুলির সংখ্যা খুব কম। কোষগুলি একটি সংযুক্তিবস্তু বা ম্যাট্রিক্স্ (Matrix)-এর মধ্যে অবস্থিত। যোগকলার অন্যতম উদাহরণ হিসাবে **এরিওলার** কলার নাম করা যায়। দেহের চামড়ার নিম্নে অবস্থিত এই কলা দেহের অন্যান্য কলার ও যন্ত্রের সহিত যোগাযোগ সাধন করে। এই কলারই অপর নাম ফ্রাইব্রাস (Fibrous tissue) কলা। ইহাও এক প্রকারের সংযোজক কলা ও ইহা নিজের আকৃতি বজায় রাখিতে পারে। জেলির ন্যায় একটি আন্তঃকোষ পদার্থের মধ্যে বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র, কিছু কোষ এবং সূতার জালিকার ন্যায় পদার্থ থাকে। কোষগুলি দুই প্রকারের—(১) সূতা প্রস্তুতকারী কোষ (Fibroblast) ; এই তন্তুগুলি দুই প্রকারের, যথা, (ক) শ্বেত তন্তু (white fibres) এবং (খ) পীত তন্তু (yellow fibres) এবং (২) আন্তঃকোষ পদার্থ প্রস্তুতকারী ম্যাট্রিক্স কোষ।



যোগকলা

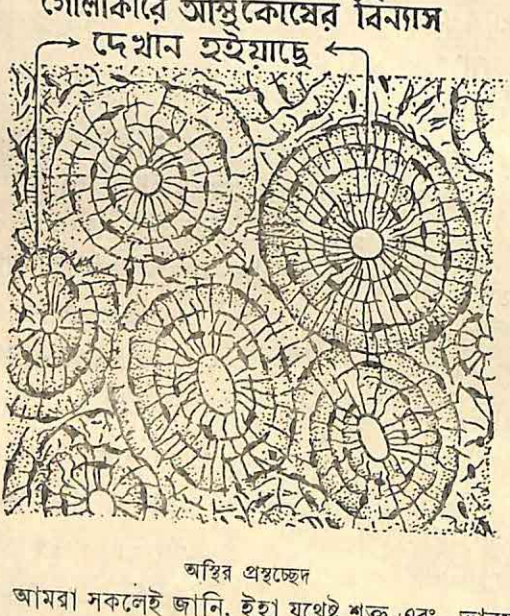
(২) **হাইয়ালাইন কোমলাস্থি** (Hyaline Cartilage)—ইহা অপেক্ষাকৃত শক্ত বস্তু এবং ইহা সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। তরুণাস্থি কোষগুলি **কনড্রিন** (chondrin) নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের ম্যাট্রিক্সের মধ্যে অবস্থিত। ইহা থক্‌থকে জেলীর ন্যায় প্রায়-স্বচ্ছ পদার্থ। ইহার মধ্যে কতকগুলি কোষপূর্ণ গহ্বর ইতস্ততঃভাবে অবস্থিত। কোষগুলির নাম কন্‌ড্রিওব্লাষ্ট (chondrioblast)



হাইয়ালাইন কোমলাস্থি

এবং ইহার মধ্যে দুই-এর গুণনীয়ক হিসাবে কোষগুলি বিভিন্নভাবে অবস্থিত; মধ্যে মধ্যে শূন্য গহ্বর থাকে। এই গহ্বরগুলিকে **ল্যাকিউনি** (Lacunae) বলে। তরুণাস্থি কলার উপরে রজ্জু কলার (যোগকলা) একটি আবরণী থাকে। ইহা 'হাড়ের' শেষ প্রান্তে হাইয়ালাইন কোমলাস্থিরূপে এবং ইলাষ্টিক (Elastic) কোমলাস্থিরূপে 'কানে' দেখিতে পাওয়া যায়। উন্নত-ধরনের জীবদেহ গঠনের পথে কখনও প্রথমাবস্থায় এই ধরনের কোমলাস্থি ক্রমশঃ হাড়ে রূপান্তরিত হয়। অতএব, হাইয়ালাইন ব্যতীত ইলাষ্টিক বা স্থিতিস্থাপক, শ্বেত-রজ্জু তরুণাস্থি প্রভৃতি কোমলাস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থিতিস্থাপক (Elastic) কোমলাস্থিতে স্থিতিস্থাপক তন্তু বেশী থাকে। যে তরুণাস্থি কলার আন্তঃকোষ পদার্থে তন্তু থাকে, তাহাকে **তন্তুময়-তরুণাস্থি** (Fibro-cartilage) বলে। শিশুর মেরুদণ্ডের দুইটি কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে এইরূপ তরুণাস্থি থাকে।

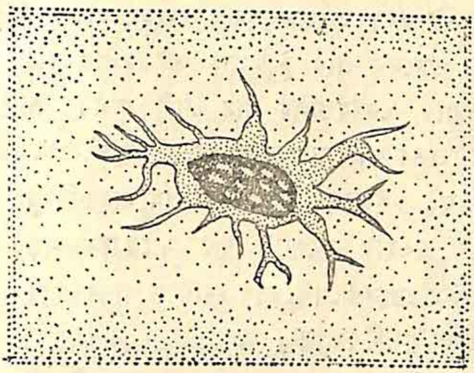
অস্থি (Bone)—অস্থি মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহকংকাল গঠন করে, আকৃতি



অস্থির প্রস্থচ্ছেদ

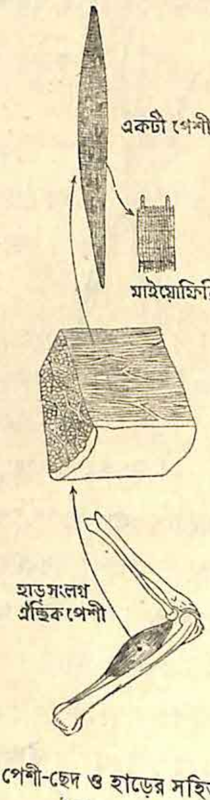
বজায় রাখে। আমরা সকলেই জানি, ইহা যথেষ্ট শক্ত এবং ভারসহিষ্ণু কলা। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহ-কঙ্কাল অস্থি দ্বারা গঠিত। একটি ম্যাট্রিক্সের (Matrix) ভিতর একটি বিশেষ ধাঁচে এই অস্থিকোষগুলি সজ্জিত থাকে। ম্যাট্রিক্সের জৈব পদার্থে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট (calcium phosphate) ও ক্যালসিয়াম

কার্বনেট (calcium carbonate) জমা হওয়ার ফলে ম্যাট্রিক্স অত্যন্ত শক্ত হয়।



অস্থিকোষ (বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে)

কখনও বা একটি নালীর চতুষ্পার্শ্বে অস্থি কোষগুলি গোলাকারে সাজানো থাকে। যেমন, লম্বা অস্থির ছেদ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, রন্ধ্রগুলিকে কেন্দ্র করিয়া কঠিন আন্তঃকোষ-পদার্থ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে। ইহার নাম হ্যাভারসিয়ান নালী (Haversian canal)। প্রতিটি অস্থিকোষ হইতে অতি সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় কয়েকটি শাখা বাহির হয়। অস্থির ফাঁপা অংশে নরম মজ্জা (Bone marrow) থাকে। সমগ্র অস্থিকলার চারিদিকে একটি তন্তুময়-যোগকলার (periostrium) আবরণ থাকে।

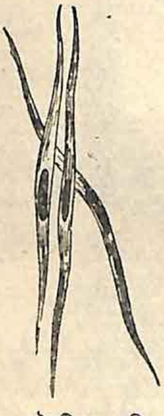


পেশী-ছেদ ও হাড়ের সহিত ইহার সম্পর্ক

(গ) **মেদ কলা (Adipose Tissue)**—ফাইব্রাস যোগ কলার রূপান্তরের ফলে মেদ কলার সৃষ্টি হয়। চামড়ার নীচে অবস্থিত এরিওলার কলার কিছু কিছু কোষে স্নেহজাতীয় (চর্বি) পদার্থ জমা হয়। এইগুলির নাম চর্বি কোষ (Fat cell)। ইহার কোষগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। কারণ, কোষগুলির ভিতরেই চর্বি জমা হয়। দেহের বহু স্থানেই চর্বি আকারে মেদ কলা জমা হইয়া থাকে। যেমন—পেট, বুক, ঘাড় ইত্যাদি।

(ঘ) **পেশী কলা** (**Muscle Tissue**)— উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার কাজে প্রধানতঃ এই কলা ব্যবহৃত হয়। দেহের মাংসল অংশ গঠন করে এই কলা। দেহের ওজনের প্রায় $\frac{2}{5}$ অংশই এই কলার অবদান। বস্তুতঃ ইহা কোষ-প্রধান কলা। কোষগুলির নাম পেশী তন্তু। প্রতিটি পেশীকোষের সাইটোপ্লাজমের ভিতর অতি সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় তন্তু জীবপংকের (Protoplasm) রূপান্তরের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের নাম মাইওফিব্রিল (Myofibril) ; ইহারা সংকুচিত হওয়ার ফলেই পেশী সংকোচন সম্ভব হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে তিন ধরনের পেশীকোষ দেখিতে পাওয়া যায়।

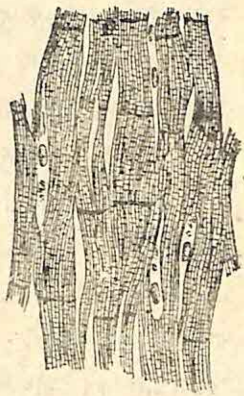
(১) **ঐচ্ছিক পেশীকোষ** (Voluntary muscle)—ইহাই প্রধানতঃ দেহের মাংসল অংশ গঠন করে এবং প্রাণীরা ইচ্ছানুযায়ী এই পেশীকোষগুলিকে সংকুচিত করিতে পারে ; যেমন—হাতের ও পায়ের পেশীসকল। ইহার কোষগুলি লম্বা। প্রতি কোষের ভিতর একাধিক লম্বা নিউক্লিয়াস আছে। প্রতিটি কোষে কয়েকটি সাদা-কালো দাগ দেখা যায়। তাই, ইহাকে রেখা-চিহ্নিত পেশী (Striped muscle) বলে।


অনৈচ্ছিক পেশীকোষ

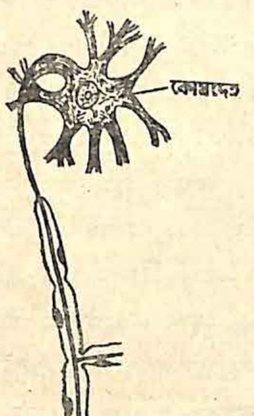
(২) **অনৈচ্ছিক পেশীকোষ** (Involuntary muscle)—ইহার কোষে ডিম্বাকার একটি মাত্র নিউক্লিয়াস থাকে। ইহাতে কোন দাগ নাই। তাই, ইহাকে অচিহ্নিত (Unstriped muscle) বলে। ইহা সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-গঠন, রক্তবাহীনালী এবং অন্যান্য নালী-গঠনে সাহায্য করে। প্রাণী স্ব-ইচ্ছায় ইহা সঙ্কুচিত করিতে পারে না।

(৩) **হৃৎপিণ্ডের পেশীকোষ** (Cardiac Muscle)—হৃৎপিণ্ড যে সকল কোষ লইয়া গঠিত, তাহাকে হৃৎপিণ্ডের পেশীকোষ বলে। এই কোষগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও মসৃণ। ইহারা পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে না। ইহারা শাখান্বিত কোষ, একে অপরের সহিত শাখার দ্বারা যুক্ত। প্রতিটি কোষে একটিমাত্র ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস আছে। আমরা জানি যে, যতদিন জীবন থাকে ততদিনই হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। তাই, স্বভাবতঃই ইহার গঠন দৃঢ়। এই কোষগুলি প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে না ; আপনা হইতেই নিয়মিতভাবে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। এই হিসাবে ইহাও এক প্রকার অনৈচ্ছিক পেশী।

(ঙ) **স্নায়ু কলা** (**Nervous Tissue**)—যে-কোষগুলি লইয়া স্নায়ু কলা গঠিত তাহারা এই কাজের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। ইহাদের **নিউরন** (Neuron) বলে। ইহারা সংবেদনশীলতা (Conductivity) এবং উত্তেজনশীলতায় (Irritability) সহায়তা করে। প্রাণীর বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলার ইহাই একমাত্র মাধ্যম। প্রতিটি কোষের একটি করিয়া কোষ-দেহ (cell-body) আছে এবং ইহা হইতে প্রোটোপ্লাজমে অনেকগুলি ছোট এবং একটি বড় শাখা বাহির হইয়াছে। বড় শাখাটির নাম **অ্যাক্সন** (Axon) এবং ছোটগুলির প্রত্যেকটিকে **ডেণ্ড্রাইট** (Dendrite) বলে। এইগুলি বাহির হইতে উত্তেজনা লইয়া কোষ-দেহে যায় এবং তথা হইতে নিউরন উত্তেজক-সংকেত বাহিরে লইয়া আসে।



হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী



নিউরন স্নায়ু কোষ

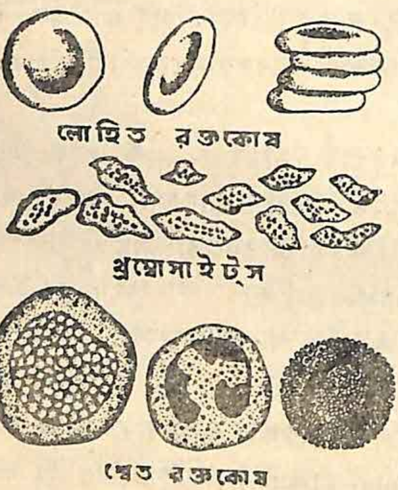
অনেকগুলি নার্ভতন্তুর সমষ্টি লইয়া একটি নার্ভ গঠিত। ইহা যোগকলার আবরণী দ্বারা আবৃত। নার্ভতন্তু দুই রকমের, যথা :—আবরণযুক্ত (Medullated) এবং আবরণহীন (Non-medullated)। আবার কার্যভেদে ইহারা দুই রকমের, সেনসারী (Sensory) ও মোটর (Motor)।

(চ) **রক্ত সম্বন্ধীয় কলা বা শোণিত কলা** (**Vascular Tissue**)—এতক্ষণ পর্যন্ত যে সকল কলা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল, ইহাদের সকলেরই প্রাণিদেহে নিজস্ব নির্দিষ্ট স্থান আছে। শোণিত কলার কিন্তু নির্দিষ্ট কোন স্থান নাই,—ইহা দেহমধ্যে ঘুড়িয়া বেড়ায়। ইহাই রক্ত। একটি তরল পদার্থের মধ্যে কতকগুলি কোষ বিচ্ছিন্নভাবে ভাসিয়া বেড়ায়। এই তরল মাধ্যমের নাম প্লাজমা (Plasma) বা **রক্তরস**। ইহা সামান্য হলুদ রং-এর (খড়ের ন্যায় রং)

দেখিতে ; খাদ্য পদার্থ ইত্যাদি নানা প্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থ ইহাতে দ্রবীভূত অবস্থায় দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হয়। সাধারণতঃ এই রক্তরসের মধ্যে **দুই** ধরনের রক্তকোষ দেখিতে পাওয়া যায় :—

(১) **লোহিত রক্তকোষ** (Red blood corpuscle)—ইহার ভিতর হিমোগ্লোবিন (Hæmoglobin) নামে একটি লোহিত কণিকা থাকে। তাহার জন্যই রক্তের রং লাল। রক্তে এই রক্তকণিকার সংখ্যাই সর্বাধিক। ইহা আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লোহিত রক্ত কণিকায় (কোষে) **নিউক্লিয়াস নাই**। মানুষের লোহিত রক্ত কণিকা আকারে গোলাকার, দ্বি-অবতল (Bi-concave)। এক ঘনমিলিমিটার মানুষের রক্তে ৫০ লক্ষ লোহিত রক্ত কণিকা থাকে। শ্বাসকার্যের অক্সিজেন গ্রহণ ও পরিবেশনে এই কোষের হিমোগ্লোবিন (লৌহ-কণিকা) অপরিহার্য।

(২) **শ্বেত রক্তকোষ** (White blood corpuscle)—ইহা নানা আকারের হয়। রোগজীবাণু দমনে ইহারা যথেষ্ট সাহায্য করে। ইহাদের কোন রং নাই। ইহারা লোহিত রক্তকোষ অপেক্ষা আকারে বড় এবং সংখ্যায় কম ; এক ঘন মিলিমিটারে ৭/৮ হাজার মাত্র।



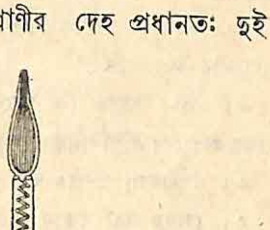
প্রাণিদেহের বিভিন্ন শোণিত কোষ

৩। **অনুচক্রিকা** (Thrombocytes)—ইহা ব্যতীত অনুচক্রিকা বা প্লেটলেটস্ (থ্রম্বোসাইট্‌স্) নামক কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ আছে। ইহাদের কোন রং নাই। কোন স্থান কাটিয়া গেলে রক্ত বাহির হইবার সময় ইহারা রক্ত জমাইয়া রক্ত পড়া বন্ধ করিতে সাহায্য করে।

লসিকা (Lymph)—ইহা তরল এবং রক্তের ন্যায় দেহের একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে। ইহা রক্তের সহিত সম্পর্কিত ; কিন্তু রক্ত নহে। কারণ জালকনালী দিয়া চুঁয়াইয়া রক্তের যে জলীয় অংশ দেহ-কোষগুলির মধ্যবর্তী ফাঁকে গড়াইয়া পড়ে, তাহাই লসিকা।

অঙ্গ (Organ)—যে-সকল বিচ্ছিন্ন ধরনের কলার কথা পূর্বে আলোচনা করা হইল, তাহাদের যথাযথ বিন্যাসের ফলেই একত্রভাবে এক-একটি অঙ্গ (organ) গঠিত হয় ; যেমন—হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, পাকস্থলী ইত্যাদি। যে অঙ্গের যাহা কাজ, তাহা উত্তমরূপে সমাধা করার জন্য তাহা উপযুক্ত ভাবে তৈয়ারী হয়। এক-এক ধরনের অঙ্গ এক-একটি বিশেষ ধরনের কার্যভার বহন করিয়া থাকে। এই ধরনের বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়ে এক-একটি তন্ত্রের (SYSTEM) সৃষ্টি। বিভিন্ন ধরনের তন্ত্রের সুষম সমন্বয়ে একটি উন্নত-ধরনের প্রাণিদেহের সৃষ্টি হয়।

জনন-অঙ্গ (Reproductive organ)—প্রাণীর দেহ প্রধানতঃ দুই ধরনের কোষ লইয়া গঠিত। একটির নাম দেহকোষ (somatic cells) এবং অপরটির নাম জননকোষ (germ cells)। পূর্বে বর্ণিত সকল কলাই বিভিন্ন ধরনের দেহকোষ লইয়া গঠিত, কিন্তু জনন কোষগুলি* ইহাদের হইতে কিছুটা স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌। যে-কোষের সাহায্যে পুং-প্রাণীতে শুক্রাণু এবং স্ত্রী-প্রাণীতে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়, তাহাকে জননকোষ বলে। প্রাণীরা পরিণতি লাভ না করা পর্যন্ত এই কোষগুলি রূপান্তরিত হয় না। সাধারণতঃ উচ্চস্তরের প্রাণীতে পুং-জনন যন্ত্ররূপে দুইটি শুক্রাশয় থাকে, ইহার মধ্যে পুং-জনন কোষ এবং স্ত্রী-প্রাণীতে দুইটি ডিম্বাশয়ের মধ্যে স্ত্রী-জনন কোষ থাকে। পুং-জনন কোষ বিভাজন ও রূপান্তরণের ফলে শুক্রকীট বা শুক্রাণু তৈয়ারী করে এবং স্ত্রী-জনন কোষ হইতে অনুরূপভাবে ডিম্বাণু তৈয়ারী হয়। শুক্রাণু ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হওয়ার ফলে নূতন প্রাণীর জন্ম হয়। সাধারণতঃ ডিম্বাণু একটি বিশেষ স্থানে নিশ্চল অবস্থায় থাকে ; ইহা আকারে গোল এবং নিউক্লিয়াস সমন্বিত, অপর পক্ষে, শুক্রাণুর দেহটি মস্তক, ক্ষুদ্র গলা, দেহ ও লেজ লইয়া গঠিত। মস্তকের ভিতর নিউক্লিয়াস থাকে এবং দীর্ঘ লেজের সাহায্যে ইহারা নড়াচড়া করে এবং ডিম্বের সহিত মিলিত হয়।



১। শুক্রকীট ২। ডিম্ব

* বস্তুতঃ এপিথেলিয়াল কোষের রূপান্তরের ফলেই জনন-কোষের সৃষ্টি হয়।

যে-কোন পুং-প্রাণীর দেহে অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় শুক্রাণু তৈয়ারী হয়, কিন্তু উচ্চস্তরের প্রাণীর ক্ষেত্রে ডিম্বাণু তৈয়ারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। মানুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু ডিম্বাণু অনুপাত হইল, ৮৫০,০০০,০০০ : ১।

অনুশীলনী

১। কোষ কাহাকে বলে? সর্বপ্রথম ইহা কি ভাবে এবং কাহার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

২। একটি আদর্শ প্রাণিকোষ বলিতে কি বুঝা যায়? চিত্রসহ ইহার বিভিন্ন অংশের কার্যাবলীর বিবরণ দাও। [হা. সে. ১৯৬০]

৩। কোষ হইতে কি ভাবে কলার গঠন হয়? প্রধানতঃ কয় প্রকারের কলা আছে? বিভিন্ন প্রকারের এপিথিলিয়াল কলার প্রকারভেদ ও কার্যকারিতা চিত্রসহ বর্ণনা কর।

৪। পেশীকলা কাহাকে বলে ও কয় প্রকার? চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

৫। দেহের মধ্যে কোন্ কলা নিরন্তর চলাফিরা করিয়া থাকে? ইহার বিভিন্ন কোষ ও তাহাদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে চিত্রসহ বিবরণ দাও।

৬। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে টীকা লিখ :—

(ক) নিউক্লিওলাস, (খ) নিউক্লিয়াস, (গ) রক্তরস, (ঘ) ডেনড্রাইট, (ঙ) মাইওফিব্রিল, (চ) শুক্রকীট।

Questions to be discussed

1. What is a cell? Give a short description of the history of its discovery and name the discoverer.

2. Draw and describe a typical animal cell and label its various parts and state their functions. [H. S. 1960]

3. Describe how the tissue is developed from the cells. Name the main types of tissues, with special reference to the different types of epithelial tissues and their respective functions.

4. What is muscular tissue? Name and describe their different types with diagrams.

5. Which tissue is constantly moving (floating) within the body? Describe its different cells, with their respective functions.

6. Write short notes on the following :—

(a) Nucleolus, (b) Nucleus, (c) Plasma, (d) Dendrite, (f) Myofibril, (g) Sperm.